সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ

প্রত্যয় প্রকাশনী
৬১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

জয়-পরাজয়

'তোমাদের এই ফোয়ারায় আর জল বেরোয় না কেন?' সুকু, অবাক হয়ে ফোয়ারার মাঝখানে এঁকেবেঁকে দাঁড়িয়ে থাকা পরীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

শেলি দুঃখু-দুঃখু মুখ করে বললে, 'সে অনেক দিন আগে বেরোত। মা মারা যাবার পর সব শুকিয়ে গেছে।'

শেলির সোনালি চুল ফুরফুর বাতাসে উড়ছে। ফুল-ফুল সুন্দর ফ্রকে যেন প্রজাপতি। মোমের মতো তেলা মুখ। ফর্সা, সুন্দর। বড়-বড় চোখ। উঁচু নাক সুকুর হঠাৎ মনে হল, ওই পাথরের পরীটার চেয়ে শেলি অনেক সুন্দর।

মোরামের একটা ছোট টুকরো তুলে নিয়ে খটখটে শুকনো ফোয়ারার দিকে ছুঁড়ে দিল সুকু। পাথরটা বারকতক লাফালাফি করে শান্ত হয়ে পড়ে রইল একপাশে।

সুকু বললে, 'কী করলে আবার জল উঠবে?'

'কে জানে! বাবা বলেছে, ও আর হবে না। আমরাও শুকিয়ে গেছি, ফোয়ারাও শুকিয়ে গেছে।'

শেলি আর সুকু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে থেকে দেখা যাচ্ছে, দূরে বাংলোর বারান্দায়, বেতের গোল চেয়ারে শেলির বাবা বসে আছেন। বৃদ্ধ। দুর্ঘটনায় একটা পা বাদ চলে গেছে। চেয়ারের পাশে দেয়ালে ঠেসানো ঝকঝকে একজোড়া অ্যালুমিনিয়ামের ক্রাচ।

শেলি বললে, 'দেখছ না, বাগানটার কী অবস্থা হয়েছে। একেবারে জঙ্গল।'

'আবার করলে হয় না?'

'কী হবে বলো? আমরা তো আর থাকব না!'

'কেন? তোমরা কোথায় যাবে?'

'কোথাও চলে যাব। আমাদের বাংলোটা তো নিয়ে নেবে।'

'কে নেবে?'

'ওই যে কাঠকলের কৈলাসবাবু। অনেক টাকা ধার আছে তো! বাবা তো আর শোধ করতে পারবে না।'

'কেন?'

'ও মা, বাবার একটা পা নেই। চাকরি নেই। পয়সা নেই। কিচ্ছু নেই। কী করে শোধ করবে বলো? কৈলাসবাবু কোর্টে কেস করেছেন। শুনেছি জিতেও যাবেন। আর তো ক'টা দিন। তারপর আমরা চলেই যাব। কোথায় যে যাব ছাই। জানো সুকু, আমাদের কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। বাবা বলে, ওই যে মাথার ওপর গড আর নিচে আমরা। এই নাকি আমাদের জীবনের গল্প। কী মজা!'

শেলি হাসতে লাগল। সুকু তাকিয়ে রইল তার সুন্দর মুখের দিকে। হাসলে কী হবে, চোখ দুটো ছলছল করছে।

সুকু বললে, 'এই এত বড় সুন্দর বাগান, অমন সুন্দর বাড়ি, সব ছেড়ে তোমরা চলে যাবে?' শেলি কোনও উত্তর দিল না। দু'জনে

হাঁটতে-হাঁটতে বাগানের পশ্চিম দিকে চলল। সূর্য প্রায় ডুবুডুবু। আকাশ আঙরার মতো লাল। কালো-কালো রেখার মতো কাক আর অন্য কী সব পাখি লেগে আছে লালের গায়ে।

বাঁ পাশে গোলাপের বেড। যত্ন নেই। তবু কী সুন্দর একটা গোলাপ ফুটে আছে হালকা হলুদ রঙের। শেলি নিচু হয়ে ফুলটা দেখতে দেখতে বললে, 'জানো, আমার মা গোলাপ খুব ভালবাসত। এক সময় আমাদের তিনজন মালি ছিল। তাদের দিয়েই মা সব করাত।'

শেলির মা'কে সুকু দেখেছে। এখনও মনে আছে তাঁর চেহারা। সে যেন রানীর মতো। সব সময় সুন্দর সেজেগুজে থাকতেন। গা থেকে হালকা, মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোত। কথা বলতেন কত আস্তে! যেন গানের মতো।

'তোমাদের অর্গ্যানটা এখনও আছে শেলি?'

'না গো, সে-সব কবে বিক্রি হয়ে গেছে!'

'কাকে বিক্রি করলে?'

'চার্চকে। ফাদার ডি'সুজা একদিন এসে নিয়ে গেলেন।'

ইশ্‌, অর্গ্যানটাকে তোমরা রাখলে পারতে! তুমি এত ভাল গান গাও!'

'ও মা!' তুমি জানো না! আমাদের সবই তো বিক্রি হয়ে গেছে। বিশাল বড় একটা ঘড়ি ছিল। তোমার চেয়েও বড়। সেই ঘড়িটাও চলে গেছে। যাক গে! কিছু কি আর থাকে!"

শেলি হঠাৎ ছুটতে-ছুটতে একেবারে পাঁচিলের কাছে চলে গেল। সেখান থেকে ডাকল, 'সুকু!' সন্ধের আকাশে সেই ডাক ভেসে গেল। দূর পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল।

'সুকু, শিগ্‌গির দেখবে এসো। শিগ্‌গির এসো।'

সুকু ছুটল। শুকনো পাতা আর মোরামের ওপর পায়ের শব্দে চমকে উঠে দ্যাখে, একটা গিরগিটি ন্যাজ খাড়া করে ঝোপের দিকে ছুটে গেল।

পাঁচিলের পাশে সার-সার পিচফলের গাছ। আলতো-আলতো ডাল ঝুলে-ঝুলে আছে। ছোট-ছোট পিচে গাছ ভরে গেছে। সবুজ ভেলভেটের মতো গা।

'দেখেছ সুকু, এবার কত পিচ হয়েছে! গাছ ভরে গেছে। মা মারা যাবার পর এই প্রথম এত ফল ধরল। কী সুন্দর। একটা ফলের গায়ে হাত দাও। ঠিক যেন ভেলভেট।'

সুকু সাবধানে আঙুল ঠেকাল। সারা দিনের রোদে গরম হয়ে আছে। কী ভাল! ঠিক যেন মায়ের গালের মতো।

'কবে পাকবে শেলি?'

'ও বাবা, এখনও ধরো তিন মাস। তারপর পেকে লাল টুকটুকে হবে। এই জায়গাটা, এই যে দ্যাখো, এই জায়গাটা ঠিক হয়ে যাবে মানুষের ঠোঁটের মতো। যাক, কৈলাসবাবুর ছেলেমেয়েরা পাড়বে আর খাবে।'

'তোমরা তার আগেই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ গো, আমরা তো হেরেই গেছি। আমরা না গেলে, কোর্টের লোক এসে আমাদের টেনে বের করে দেবে।'

বাংলোর বারান্দায় বসে বৃদ্ধ গোমেজ বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ছেলেটা আর মেয়েটা ছুটতে ছুটতে পশ্চিমের দিকে গেল। আঁধার নামছে। গরম কাল। এই সময় করেত সাপের খুব উপদ্রব হয়। ভীষণ বিষাক্ত। ছোট ছোট সাপ। একেবারে সাক্ষাৎ মৃত্যু। ডেডলি। গোমেজ ভারী গলায় ডাকলেন, 'সুকু! সুকু! মাই ফ্রেণ্ড! শেলি!'

সুকু চমকে উঠল, "এই, আংক্‌ল ডাকছেন।"

শেলি বললে, "রান।" বলেই ছুটতে শুরু করল।

শেলি ছুটছে। সুকু ছুটছে। পথের মোরামে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। গাছের পাতায়-পাতায় বাতাসের সিপসিপ শ্বাস। বাংলোর ছাদের কোটর থেকে দুটো প্যাঁচা একসঙ্গে ডেকে উঠল। চার্চে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং করে। রাত নামল।

|| দুই ||

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ। রুকু আধশোয়া। বই পড়ছে। সুকু চেষ্টা করছে পড়ার। মন বসছে না। কিছুতেই মন বসছে না। গোমেজ সাহেবের বাংলো। শেলি। শেলির সোনালি চুল। ডালে-ডালে সবুজ ভেলভেটের মতো পিচ। অনেকটা বাংলার পাঁচের মতো। শুকনো ফোয়ারা। বেঁকে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের পরী। সুকুর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। শেলির সুরেলা ডাক-সুকু, সুকু। বৃদ্ধ গোমেজের গং-এর মতো গলাঃ সুকু, মাই ফ্রেণ্ড!

'দাদা!'

'বল।'

'তোর কত টাকা জমেছে রে?'

'টাকা?'

'হ্যাঁ রে, টাকা।'

'দ্যাখ্ না। ওই তো ওই জুতোর বাক্সর মধ্যে আছে। জানিস তো তুই! গুনে দ্যাখ্ না।'

'কেন জিজ্ঞেস করছি বল তো?'

'বনভোজন। আমি জানি। বৈশাখী-পূর্ণিমা এসে গেল। গতবার যেমন করেছিলিস।'

'না রে দাদা। বনভোজন নয়। খুব সিরিয়াস। ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার।'

'বুঝেছি। অসুখ করেছে কারুর।'

'ধ্যা! অসুখ, নো প্রবলেম। বাবা আছে না! বললেই, হাসপাতাল। ফ্রি চিকিৎসা, ফ্রি ওষুধ।'

'তবে কী? আর আমার মাথায় আসছে না। তোর তো একশো আট রকম ব্যাপার আছে।'

সুকু জুতোর বাক্সটাকে বিছানায় এনে ফেলল। রুকু ভীষণ একটা বই পড়ছে। কথা বাড়াবার উপায় নেই। সুকু দাদার পায়ের কাছে বসে একে-একে নোট, খুচরো সব গুনে ফেলল। মোট পঁয়ত্রিশ টাকা।

'দাদা। এই দাদা।'

'বল না, আমি শুনছি তো।'

'তোর চেয়ে আমি বড়লোক রে দাদা। তোর মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা জমেছে। আর আমার কত হয়েছে জানিস, পঞ্চান্ন।'

'হতেই পারে। তুই যে হাড়-কিপ্‌টে। ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার। সাধে বাবা বলে, এবার সংসার সুকুর হাতে ছেড়ে দোব। আর মা বলে, তা হলেই হয়েছে, হোল ফ্যামিলিকে উপোস করো শুকিয়ে মরতে হবে।'

'দাদা, তুই অন্তত আমাকে কিপ্‌টে বলিসনি। আমার কত খরচ বল? চিড়িয়াখানার জন্যে মাসে কত খরচ হয় বল?'

'সে বাবা, তুমি মায়ের আঁচল থেকে ম্যানেজ করো।'

'ওই কথাটি বোলো না। সুকু চোর নয়। আমার বিজনেস আছে রে দাদা।'

'তোর বিজনেস?'

'ইয়েস। আমার বদরিপাখির ছটা বাচ্চা তিরিশ টাকায় বিক্রি করেছি। জানো কি তা?'

'তুই এবার বাঘ পোষ।'

'আমাকে আর একটু বড় হতে দাও, দাদুর মতো টানজানিয়া চলে যাব। সেখান থেকে সিংহ কিনে আনব।'

'তার আগে বাঘ দিয়ে হাত পাকা।'

'আচ্ছা দাদা, একটা বাংলোর কত দাম হতে পারে?'

'কী রকম বাংলো?'

'ধর, গোমেজ সাহেবের বাংলোটা।'

উঃ, ও তো এ-ক্লাস রে। ছবি, ছবি। অনেক দাম হবে। ষাট, সত্তর হাজার।'

'বাবা! ষাট সত্তর। একটা বদরি পাঁচ টাকা। ষাট হাজার টাকায় কটা বদরি হবে রে!'

'পৃথিবীতে অত বদরি নেই রে সুকু। তুই শুয়ে পড়। বইটা শেষ করে আমি আলো নিবিয়ে দোব।'

মশারি না ফেলেই সুকু চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার তলায় দু'হাত রেখে। হুঁ হুঁ...সুর ভাঁজল কিছুক্ষণ। এক সময় নীরব। অন্য দিন শুতে-না-শুতেই ঘুম এসে যায়। আজ আর আসছে না। শেলির কথা মনে পড়ছে। শুকনো ফোয়ারা। পিচগাছে ফল ঝুলছে। বৃদ্ধ গোমেজ দুটো ক্রাচ।

'দাদা!'

'আবার কী হল?'

'গোমেজ সাহেবের পা কাটল কী করে?'

'কলকাতায় গিয়েছিলেন। ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে।'

সুকু আবার চুপচাপ। ভীষণ ভাবনা। কোথায় যাবেন তিনি, মেয়ের হাত ধরে। বয়েস হয়েছে। এত বড় পৃথিবী! দিনের বেলা তবু একরকম। রাতে ভয়ঙ্কর।

'দাদা!'

'উঃ, তোর 'দাদা'র জ্বালায় পাগল হয়ে যাব।'

'কী পড়ছিস?'

'ট্রেজার আইল্যাণ্ড? কাল ফেরত দিতে হবে।'

'শোন না।'

'বল না।'

'আমরা বড়লোক না গরিব রে?'

'আমরা মধ্যবিত্ত।'

'যাঃ, বাবা তো ডাক্তার। ডাক্তারেরা বড়লোক হয়।'

'তা হলে আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন, তুই যখন জানিস!'

'কৈলাসবাবু বড়লোক?'

'কোন্ কৈলাস?'

'কাঠ-কৈলাস।'

'উঃ, সাংঘাতিক বড়লোক। কোটিপতি।'

সুকু আবার চুপচাপ। বাবা এত বড় ডাক্তার আর অশিক্ষিত কৈলাসবাবু কাঠের কারবার করে গাড়ির পর গাড়ি কিনছেন। বাড়ির পর বাড়ি বানাচ্ছেন। তাও লোভ। বৃদ্ধ মাস্টারমশাই গোমেজ সাহেবের বাড়িটা কেড়ে নিয়ে, বাবা আর মেয়েকে রাস্তায় নামিয়ে দেবেন।

সুকু বড় করে হাই তুলল। ঘুম আসছে। ঠিক আছে, আমিও একদিন বড়লোক হব। হবই হব। আর তখন আমি বিরাট একটা বাড়ি বানাব। যাদের কেউ নেই, তাদের এক-একটা ঘরে রাখব। ফ্রি থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা। একটা স্কুল করব। দাদা হবে হেডমাস্টার।

সুকু ঘুমিয়ে পড়ল।

|| তিন ||

আকাশের টঙে চাঁদ চড়েছে। চারপাশ ঝিমঝিম করছে চাঁদের আলোয়। গোমেজ সাহেব বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন। শেলি ঘুমিয়ে পড়ছে। বৃদ্ধের চোখে ঘুম নেই। ঘুম আর আসে না। মেয়ের হাত ধরে ওই গেট পেরিয়ে এই বাড়ি থেকে একদিন বেরিয়ে যেতে হবে। কোথাও যেতে হবে। কিন্তু কোথায়!

শরীরে এখনও শক্তি আছে। সকাল বিকেল ছেলেমেয়ে পড়িয়ে রোজগার হয়। দু'জনের সংসার চলে যায়। অ্যালবার্ট একটা

পোড়ো- বাড়ি ভাড়ায় ঠিক করে দেবে বলেছে। শহরের ও-মাথায়। কম ভাড়া। জায়গাটা ভারী নির্জন। তা হোক। এ-দিকে রোজই ডাকাতি হচ্ছে। তা হোক। যার কিছুই নেই, ডাকাত তার কী করবে!

কষ্টে আর কষ্ট নেই। শুধু দুঃখ, এমন সুন্দর একটা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে!

বাব ছিলেন ইংরেজ আমলের জেলাশাসক। দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। ওই আস্তাবলে থাকত দুটো ঘোড়া। সাদা আর কালো। একটার নাম ছিল টিউলিপ, আর একটার নাম ছিল ডিউক। কী সুন্দর একটা ফিটন-গাড়ি ছিল, রূপোর কাজ করা!

গোমেজ ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলেন, মোরাম বিছানো বাগানের পথে। চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। খই-সাদা ফুল ফুটে আছে গাছে-গাছে। গোমেজ হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন বাগানের উত্তরে। শেষ মাথায়। সেই আস্তাবল। হাহা করছে। বাতাসে উড়ে এসেছে গাছের শুকনো পাতা। বাইরের চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট সবই দেখা যাচ্ছে। ভাঙা ফিটনের কঙ্কাল। দেয়ালে ঠেসানো দুটো চাকা।

গোমেজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। অতীতের সব কিছু যেন দেখতে পাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছেন ঘোড়া দুটোর পা ঠোকার শব্দ। নিঃশ্বাসের ফোঁস-ফোঁস। দূরে বাংলোটার দিকে ফিরে তাকালেন। অন্ধকার হয়ে আছে। এক সময় ঘরে-ঘরে আলো জ্বলত। এ-বাড়িতে আগে কখনও রাত নামত না। ফুটফুটে হয়ে ফুটে থাকত। গরম বাতাস বেরিয়ে যাবার চিমনিতে পাশাপাশি বসে আছে একজোড়া প্যাঁচা।

এই সেই আউট হাউস। দরজা জানলা ভেঙে-ভেঙে, খুলে-খুলে পড়ে গেছে। এখানে থাকত দরোয়ান, বাবুচি, আরও অনেকে। বিরাট এক দলবল। গরমকালে এই বাইরেটায় খাটিয়া পেতে সব শুয়ে থাকত।

বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় একটা পাথর পড়ে আছে চৌকোমতো। গোমেজ তার ওপর বসে ক্রাচটাকে পাশে শুইয়ে রাখলেন। বেশী শীত- শীত একটা বাতাস আসছে পাহাড়ের দিক থেকে। জ্যাকেটের কলার দুটো উঁচু করে দিয়ে, গাছের তলায়, আলো-আঁধারে চুপ করে বসে রইলেন গোমেজ। কোথাও কেউ যেন ককিয়ে কেঁদে উঠল। অন্য কেউ হলে ভয় পেয়ে যেত। গোমেজ জানেন, এ হল এক ধরনের পাখির ছানা। থেকে থেকে কেঁদে ওঠে।

গোমেজ ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছেন, এই বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে, কোনও এক জায়গায় পূর্বপুরুষের আমলের অনেক ধনরত্ন পোঁতা আছে। কেউ বিশ্বাস করতেন, কেউ করতেন না। কোনও দিন কেউ অনসন্ধান করেননি। পূর্বপুরুষরা সব বড়লোক ছিলেন। প্রথম জীবনে গোমেজও কখনও গুপ্তধন নিয়ে মাথা ঘামাননি। এখন মাঝে-মাঝে ভাবেন। খুঁজে পেলে এই সময়ে খুব কাজে লেগে যেত। কোথায় থাকতে পারে? যে পাথরটার ওপর বসে আছেন, তার তলায়? পাথরটা বহুদিন একইভাবে একই জায়গায় পড়ে আছে। কত কী নড়েচড়ে গেল, পাথরটা কেন নড়ল না? বিশাল পাথর। গোমেজের একার ক্ষমতায় নড়ানো যাবে না। আর কোথায় থাকতে পারে সেই গুপ্তধন! আস্তাবলের মেঝের তলায়? আউট হাউসের পেছনে? কোথায়, কোথায়?

উত্তেজিত গোমেজ আবার উঠে পড়লেন। ক্রাচে ভর দিয়ে সারা বাগানে ঘুরতে লাগলেন ভূতের মতো। একে আর বাগান বলা যায় না। সবুঝ ঘাসে ঢাকা অত যত্নের লন নষ্ট হয়ে গেছে। ছোটোখাটো বাহারি ফুলগাছ আর নেই বললেই চলে।

ঘুরতে-ঘুরতে গোমেজ শুকনো ফোয়ারার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আকাশে নিটোল চাঁদ। আলোর ঝরনাধারয় পাথরের পরী যেন জীবন্ত হয়ে উঠতে চাইছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে গোমেজের গা ছমছম করে উঠল। মাথার ওপর উপুড় হয়ে আছে বিশাল আকাশ। এখানে-ওখানে নিশ্চল তারার ফোঁটা-ফোঁটা চোখ। দূরে ধোঁয়া-ধোঁয়া পাহাড়। গাছের পাতায়-পাতায় মাঝরাতের বাতাসের ভুতুড়ে নিঃশ্বাস।

গোমেজ বাংলোর বারান্দার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। কে যেন দাঁড়িয়ে। বাতাসে সোনালি চুল উড়ছে। গাউনের প্রান্ত ফুলে ফুলে উঠছে। কে? শেলি? না তো! দীর্ঘ লম্বা চেহারা। গোমেজ ভাল করে তাকালেন। না, কেউ নেই। চোখের ভুল।

তবু ভয় পেলেন। তারপর নিজের মনেই হাসলেন। ছেলেমানুষ নাকি যে ভূতের ভয় পাবেন। পরীর দিকে তাকালেন। নড়ছে

নাকি? নেমে আসবে এখুনি!

লোহার বেঞ্চে বসে পড়লেন। এক পায়ে দাঁড়ানো যায় না বেশিক্ষণ। রাতের বাতাসে লোহা শীতল। বেশ লাগছে। বসে থাকতে-থাকতে গোমেজের মনে হল, ফোয়ারার তলায় সেই গুপ্তধন নেই তো! কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়। এতকালের বিশ্বাস! কিন্তু কোথায়! পেলে বড় ভাল হত। টাকার ভীষণ প্রয়োজন। এই বাংলোতেই তিনি মরতে চান।

কর্কশ স্বরে প্যাঁচা ডেকে উঠল বারকতক।

গোমেজের চোখ জড়িয়ে আসছে ক্রমশ। শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে মাথা ঝুলে আসছে বুকের দিকে। গোমেজ ঘুমিয়ে পড়লেন। আর কোনও খেয়াল নেই, কী হচ্ছে চারপাশে। চাঁদ পশ্চিমে হেলছে। রাত ক্রমশই ভোরের দিকে এগোচ্ছে।

সাদা গাউন পরা সেই নারীমূর্তি গোমেজের সামনে। মুখ দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট। ধোঁয়াটে ওড়নায় মুখ ঢাকা। চিকচিক করছে অভ্র।

'কে তুমি? মুখ দেখাও।'

মূর্তি ইশারায় গোমেজকে পেছনে পেছনে আসতে বললে।

গোমেজ তড়াক করে লোহার বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিছু দূর আসার পর গোমেজ অবাক হয়ে গেলেন। ক্রাচ ছাড়াই হাঁটছেন। কী করে? আরে, দুটো পা'ই তো রয়েছে তাঁর। কী আশ্চর্য! পা তাহলে বাদ যায়নি! ভীষণ আনন্দ হল তাঁর।

মূর্তি যেন ভেসে-ভেসে এগিয়ে চলেছে আস্তাবলের দিকে। গোমেজ যত জোরেই হাঁটুন, দু'হাত দূরত্ব আর কিছুতেই কমছে না। আস্তাবলের অন্ধকারে ঢুকে গেল গাউন-পরা নারী। অন্ধকার ঘরের সামনে থেকে পড়েছেন গোমেজ। ভাবছেন, ঢুকবেন কি ঢুকবেন না। ওপাশের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে মূর্তি ইশারায় জানাল, 'চলে এসো।'

গোমেজ ভেতরে ঢুকলেন। এক সময় কাঠের যে বিশাল পাত্রে ঘোড়া দানা খেত, মূর্তি ইশারায় সেই পাত্রটা দেখাল।

গোমেজ প্রশ্ন করলে, 'কী আছে এখানে?'

মূর্তি এবার পাত্রের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

গোমেজ জোরে বললেন, 'কী আছে ভেতরে?'

মূতি নিঃশব্দে হাসল। মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওড়নার আড়ালে একসার দাঁত ঝিলিক মেরে উঠল।

গোমেজ আবার প্রশ্ন করলেন, 'কী আছে ওখানে?'

মূর্তি ক্রমশ ধোঁয়াটে হতে লাগল। সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে পাত্র কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। টলটল করছে জলের মতো। সুতোর মতো উড়ছে চারপাশে।

গোমেজ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। ঘুম ভেঙে গেল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল বুঝতে, তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু এ কী! শুয়ে আছেন আস্তাবলের ঠাণ্ডা কোদলানো মেঝেতে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। ক্রাচ দুটো পাশে নেই। তা হলে? ভয়ে ভয়ে তাকালেন পায়ের দিকে। সত্যিই কি তা হলে কাটা পা'টা ফিরে এল।

ভীষণ ধাক্কা খেলেন। মেঝের ওপর পড়ে আছে সেই একটা পা। আর একটা পা হাঁটুর কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে। বাকিটা নেই। একটা পা চলে যাবার বেদনা প্রায় ভুলেই এসেছিলেন। আজ সেই দুঃখ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বাইরে গোলাপী ভোর। অজস্র পাখি ডাকছে। গোমেজ কেঁদে ফেললেন। আজ যদি দুটো পা থাকত তা হলে একবার দেখে নিতেন। দুঃখের সঙ্গে লড়াই কাকে বলে। দূর থেকে শেলির ডাক ভেসে আসছে...

'বাবা, তুমি কোথায় গেলে। বাবা।'

গোমেজ একটা পায়ে ভর রেখে, দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালেন। এক পায়ে লাফাতে লাফাতে কোনও রকমে এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে। চিৎকার করে বললেন, 'আমি এইখানে। শেলি, আমার ক্রাচ দুটো নিয়ে আয়।'

শেলি ক্রাচ দুটো নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল। খুব জোরে ছুটেছে। হাঁপাচ্ছে। 'তুমি এখানে কী করে এলে বাবা?'

'কী করে?'

গোমেজ বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে। জানেন না। এলেন কী করে। স্পষ্ট স্বপ্ন। দু'পায়ে জোরে জোরে হেঁটে ছেন। নিশ্চয় হেঁটে ছেন, তা না হলে এলেন কী করে? কোথায় ফোয়ারার সামনে লোহার বেঞ্চ, আর কোথায় এই আস্তাবল! দূরত্ব তো কম নয়! বড় গোলমেলে ব্যাপার। পরে ভেবে দেখবেন। মেয়েকে বললেন, 'দেখে আয় তো মা, ওই ডাব্বাটার ভেতরে কী আছে।'

শেলি ভয়ে ভয়ে ডাব্বার দিকে এগিয়ে গেল। ডাব্বাটা প্রায় তার মতোই উঁচু। ঝুঁকে নিচু হয়ে ভাল করে দেখে বললে, 'বাবা, শোনো।'

'কেন রে?'

'এসো না তুমি।'

গোমেজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন।

'তলায় কী একটা পড়ে রয়েছে দ্যাখো।'

গোমেজ ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। তেমন আলো নেই তো। তবু মনে হচ্ছে তলায় একটা পেতলের চাবির মতো কী পড়ে আছে। বেশ বড় চাবি।

'মনে হচ্ছে একটা চাবি পড়ে আছে। তুই নেমে তুলে আনতে পারবি মা?'

'না বাবা। এটা অনেক উঁচু। সুকুকে ডেকে আনব বাবা? ও পারবে।'

'না, এখন থাক। পরে হবে।'

গোমেজ ক্রাচে ভর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। পেছনে শেলি গোমেজ ভাবতে-ভাবতে আপন মনে বাংলোর দিকে এগোচ্ছেন। খুব রহস্যজনক ব্যাপার। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ধরতে পারছেন না। যা ছিল না, তা এল কী করে? পা এল কোথা থেকে? আবার গেলই বা কোথায়? চাবি? চাবিটা কার?

কিসের চাবি! কবে থেকে পড়ে আছে ওই ডাব্বার ভেতর?

||চার ||

বেলা দুপুর। কৈলাসবাবুর কাঠচেরাই-কলের সামনে সুকু দাঁড়িয়ে আছে। বগলে বই। স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছে ছুটি করে। কৈলাসবাবুর বিশাল বাড়ি একপাশে। আর একপাশে বিশাল কল।

বৈদ্যুতিক চেরাইকলে, কাঠ ফাড়ার শব্দে সুকুর বুক কেঁপে উঠছে অদ্ভুত একটা তীক্ষ্ণ শব্দ। কাঠের মৃত্যু-আর্তনাদ। গা শিউরে ওঠে। গভীর রাতে এই নিষ্ঠুর শব্দ শুনলে সুকু আরও ভয় পেত। সুকুর মন বললে, 'যারা কাঠ চেরাই করে, তারা মোটেই ভাল লোক নয়। সুকু, খুব সাবধান।'

চারপাশে নরম-নরম কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে। বাতাসে ভেজা কাঠের গন্ধ। ঝিঁআঁক, সিঁআঁক করে ধারালো করাত চলছে।

কৈলাসবাবুর দুটো হাতি পাশের একটা খোলা মাঠে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রোদে বোকার মতো। মাঝে-মাঝে শুঁড় দোলাচ্ছে। খুব পয়সা হয়েছে কৈলাসবাবুর। নতুন একটা মোটরগাড়ি রোদে ঝকঝক করছে।

সুকু ধীরে-ধীরে কৈলাসবাবুর গদি-ঘরে ঢুকল। দেয়াল নীল রঙে ক্যাট-ক্যাট করছে। রাজ্যের দেবদেবীর ছবি ঝুলছে। মোটা-মোটা চেহারার তিনটে লোক ধবধবে সাদা গদিতে বসে মৌজ করে শিঙাড়া খাচ্ছে। মনে হয় খুব ঝাল। সকলেরই চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। একজন আবার হুসহাস শব্দ করছে।

সুকুকে দেখে একজন বললে, 'কী চাই খোকা?'

সুকুর মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে গেল। একগাল হেসে বললে, 'আমি কৈলাসকাকুর সঙ্গে দেখা করতে চাই!'

'কাকু যে এখন ঘুমোচ্ছে খোকাবাবু। কী চাই, চাঁদা?'

'না মেসোমশাই, আমার বাবা ডক্টর মুখার্জি, কাকুর কাছে একটা খবর নেবার জন্যে পাঠিয়েছেন।'

ও, তুমি ডাক্তারবাবুর ছেলে?' কোন্ ছেলে?'

'ছোট ছেলে।'

'আরে, বোসো বোসো। এই নাও সামোসা খাও।'

অনেক আগেই সুকুর একটু-একটু লোভ হচ্ছিল। ঠোঙা থেকে বড় সাইজের গরম একটা শিঙাড়া তুলে নিল। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা চমৎকার জিনিস।

হু হা করতে করতে লোকটি বললে, 'তোমার বাবা বহুত ভাল লোক। একেবারে দেওতা। সেবার আমার মেয়েকে যেভাবে ভাল করে দিলেন! বুঝলেন মিশিরজি, একেবারে এক নম্বর আদমি।'

'হাঁ হাঁ, সো বাত তো ঠিকই হ্যায়। হাম আজ সামোসা খাতা হ্যায়, দু বরষ পহেলে...'

'আরে তোমার তো তখন পানি খেলেও হজম হত না।'

'হাঁ, সো বাত তো ঠিকই হ্যায়।'

আর একটা শিঙাড়া নেবার জন্যে মিশিরজি হাত বাড়াচ্ছিল, যে কথা বলছিল, চট করে ঠোঙাটা সরিয়ে নিল, 'নেহি। তোমহারা খতম হো গিয়া জি।'

'হুয়া? ক্যায়সে হুয়া?'

'য্যায়সে হোতা হ্যায়, ওইসে হো গিয়া।'

সুকুর দিকে ফিরে লোকটি গম্ভীর মুখে বললে, 'তোমার বাবার কাছে একদিন যেতে হবে। মাঝে-মাঝে বুকটা ব্যথা করে ওঠে। তোমার জানা আছে, হার্টের অসুখে কোন্ দিকটা ব্যথা করে?'

সুকু বাবার চেয়েও গম্ভীর গলায় বললে, 'আপনার কোন্ দিকটা করে?'

'বাঁ দিক।'

সুকু অভিজ্ঞের মতো শুধু একটা হুঁ শব্দ করল। যার মানে, ধরেছে, বলার আর কিছু নেই।

'বাঁ দিকেই করে, তাই না?

সুকু বললে, 'হুঁ।'

'এই শিঙাড়াটা তুমিই তা হলে খেয়ে নাও। একটু সাবধান হওয়াই ভাল। ঝপ করে মরে গেল শিঙাড়া আর কে খাবে!'

সুকু এরকম শিঙাড়া গোটাচারেক সহজেই খেতে পারে।

চুলে ঘিয়ের হাত মুছে লোকটি লাল-রঙা টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে একটা বোতাম টিপল। 'কে, বড়াবাবু? ডক্টার মুখার্জির লেড়কা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে...উল্লু? হাম! নেহি সাব হাম উল্লু নেহি, বদরিপ্রসাদ হো হাঁ, ও বাত তো ঠিকই হ্যায়। উল্লুকা মাফিক কাম কিয়া হোগা। ...ভেজ দুঙ্গা? ঠিক হ্যায় সাব।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে হাসি-হাসি মুখে সুকুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'বহত গালি দিয়া। উল্লু বোলা। হাম ভাল্লু হো সেকতা। উল্লু কভি নেহি। যাও, চলে যাও ভেতরে। বাবু দোতলায় আরাম করছেন।'

সুকু যেতে-যেতে ভাবল, 'এর নাম চাকরি! উল্লুক, ভাল্লুক, যা খুশি বলবে, আর মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। জীবনে আমি চাকরি করব না। ব্যবসা করব। ব্যবসা।'

লোকটা পাগলের মতো বাড়ি বানিয়েছে। কী নেই! রঙের রামধনু। দেউড়িতে পোশাক পরা, গালপাট্টাঅলা দরোয়ান।

'এ লেড়কা, যায়েগা কাঁহা?'

দোতলায় বারান্দা থেকে মেয়েলি গলায় কে বললে, 'আনে দো।'

সুকু ঘাড় উঁচু করে দেখল, চেক-চেক লুঙ্গি পরা এক দৈত্য। দোতলার উঠে বুঝল, উনিই সেই বিখাত কাঠ-কৈলাস। থলথলে বিশাল শরীর। গোল-গোল চোখ জিবেগজার মতো নাক। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। গলায় বুঝছে হাতির দাঁতের লকেট।

মেয়েদের মতো গলায় বললে, 'তুমি ডাক্তারবাবুর ছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এসো, এসো।'

কৈলাসবাবুর পেছন পেছন যে-ঘরে এসে ঢুকল, সেটাকে ঘর না বলে দোকান বলাই ভাল। রাজ্যের জিনিস দিয়ে এমন ভাবে সাজানো।

বিশাল সোফায় সুকু যেন তলিয়ে গেল।

উল্টো দিকে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে অসভ্যের মতো বসেছে কাঠ-কৈলাস। ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, 'লস্যি খাবে, লস্যি?'

সুকু ঘাড় নাড়ল। সে সব খাবে। খেয়ে ফাঁক করে দেবে।

'গোদা। গোদা। আরে এ গোদা।'

নাম গোদা। চেহারায় টিকটিকি।

'দো গ্লাস গোলাপী লস্যি লে আও।'

লোকটা চলে গেল নেচে নেচে।

হেউ করে একটা ঢেঁকুর তুলে কৈলাস বললে, 'তোমার পিতাঠাকুর দেবতা। আমাদের এই শহরে তাঁর একটা মূর্তি স্থাপনা করব।'

সুকুর ভীষণ রাগ হল। লোকটা বাবার মৃত্যুর কথা ভাবছে। বাবার আগেই তো তুমি জল-ভরা ঠোঙার মতো ফেঁসে যাবে। চেহারার যা ছিরি হয়েছে।

কৈলাস বললো, 'তা বলো, তোমার পিতা কী জন্যে পাঠালেন তোমাকে? অনেক দিন আগে কাঠের কথা বলেছিলেন। ফার্নিচার করাবেন।'

সুকু অনেক চেষ্টা করে রাগ কমিয়ে ফেলল। এখন তাকে বেশ মোলায়েম করে কথা বলতে হবে।

'কাকাবাবু!'

কৈলাস অবাক হয়ে সুকুর মুখের দিকে তাকাল।

'কাকাবাবু, আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।'

'আমার কাছে? প্রার্থনা তো ঈশ্বরের কাছে করে। চাঁদা চাইতে এসেছ? ডোনেশান?'

'না, ডোনেশান নয়।'

'তবে?'

গোদা বড়-বড় দু' গেলাস লস্যি সামনের নিচু টেবিলে রেখে নেচে-নেচে চলে গেল।

'কাকাবাবু আপনি ওদের ছেড়ে দিন।'

'অ্যাঁ, কাকে ছাড়ব? আমি কি পুলিশ! ধরে রেখেছি কাউকে?'

'গোমেজ-স্যারের বাড়িটা নেবেন না। বৃদ্ধ মানুষ। একটা পা নেই। বাচ্চা একটা মেয়ে। বাড়িটা নিয়ে নিলে ওরা কোথায় যাবে?'

জাহান্নামে যাবে।'

সুকুর ইচ্ছে করল লস্যির গেলাসটা সঙ্গে সঙ্গে মুখে ছুঁড়ে মারে।

'জাহান্নামে যাবে?'

'হ্যাঁ, পঁচিশ হাজার টাকা সুদে বেড়ে হাজার পঞ্চাশ হয়েছে। টাকা ইজ টাকা। টাকার ব্যাপারে দয়ামায়া চলে না খোকাবাবু। তা ছাড়া ওই বাংলোটার ওপর আমার অনেক দিনের লোভ। দ্যাট ইজ দি বেস্ট। খাসা, খুবসুরত, ওয়াণ্ডারফুল। নাও লস্যি। লস্যি খাও।'

'কাকু, আপনার তো অনেক টাকা! বিশাল বড়লোক! মাস্টারমশাইয়ের বাঙ্গলোটা আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন না?'

'না।'

'কত টাকা পাওনা?'

'কেন, তুমি শোধ করে দেবে? পঞ্চাশ হাজার। ফিফটি থাউজ্যাণ্ড।'

কৈলাস খিলখিল করে হাসছে। পুরু ঠোঁটে লস্যির মাঠা জড়িয়ে গেছে। ক্লাউনের মতো দেখাচ্ছে।

'পঞ্চাশ হাজার! ধার নিয়েছিল, পঁচিশ, হয়ে গেল পঞ্চাশ?'

'আরে বাবা টাকার সুদ। সুদেই তো বড়লোক করে। ব্যবসা শেখো খোকাবাবু। ব্যবসা। তোমার পিতা অত পড়ে বিলেত গিয়ে মাসে যা কামাই করেন, আমি তা একদিনে করি। আমার বিদ্যা! ঘোড়ার ডিম। হর্ষ-এগ।'

হাসতে গিয়ে বিষম খেল কৈলাস।

সুকু উঠে পড়ল।

'কী হল, লস্যি খাবে না?'

'না।'

'গোঁস্‌সা হল কি? খোকাবাবু, মানুষ দয়া করতে পারে না। দয়া করবেন ঈশ্বর। দি অলমাইটি গড। তোমার পিতারও তো অনেক রোজগার, বলো না, ওদের হয়ে টাকাটা দিয়ে দিতে। বলে দ্যাখো না, তিনিও ঐ কথাই বলবেন। টাকা রোজগারের জিনিস। কামাইয়ের জিনিস। গাছে ফলে না। পাতার মতো ঝরে পড়ে না। মালুম? লোও, লস্যি লোও।'

সুকু অ্যাবাউট টার্ন করে, সোজা ঘরের বাইরে। কৈলাস খিলখিলিয়ে হাসছে। পেতনির মতো। সুকু হাঁটতে-হাঁটতে লোধাটুলি পেরিয়ে, টিলার পাশ দিয়ে, শালবনের ভেতর দিয়ে একেবারে শহরের বাইরে। বিকেল হয়ে গেছে। সুকু যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সে জায়গাটা উঁচু। অনেক উঁচু। সামনে জমি নিচু হতে হতে, ভেঙে ভেঙে চলে গেছে একেবারে পায়ের তলায়। সেখানে একটা জঙ্গল একেবারে এক দৌড়ে চলে গেছে পাহাড়ে।

ধোঁয়া ধোঁয়া, কেমন যেন একটা অস্পষ্ট পরিবেশ। বড় কঠিন জায়গা। সহজে কেউ যেতে পারবে না। গেলেও হারিয়ে যাবে। আর ফিরবে না কনোও দিন।

বিশাল একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় সুকু বসে পড়ল। কী করা যায়! পঞ্চাশ হাজার। সহজ ব্যাপার! আকাশের গায়ে পাহাড়ের রঙ আরও নীল হয়ে যাচ্ছে। একটা ছায়া নেমে আসছে সামনের মালভূমিতে। সারা দিন পৃথিবী তেতেছে। যেই এবার ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে, বাষ্প ঘিরে আসছে চারপাশ থেকে।

সুকু একা বসে আছে। চুপচাপ। নানা রকম পোকামাকড়, হয়তো সাপও, মাঝে-মাঝে চলে যাচ্ছে এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে। চিরকালই সুকুর ভয়ডর কম। সে গ্রাহ্যই করছে না। গোমেজের কথা ভাবছে। ভাবছে শেলির কথা।

"কাঠ-কৈলাস! তুই বেটা মানুষ?"

ধীরে-ধীরে সূর্য নেমে গেল পশ্চিমে। ঝাঁ ঝাঁ রাত ছুটে আসছে পাহাড়ের দিক থেকে। সুকুর খেয়াল নেই।

|| পাঁচ ||

সুকু আসছে না দেখে, গোমেজ অতি কষ্টে বাঁকা তার ছড়ির মাথায় লাগিয়ে, কাঠের ডাব্বা থেকে সেই চাবিটা তুলে আনলেন। বেশ বড় মাপের চাবি। গোমেজ আগে কখনও দেখেননি। চারপাশে লতাপাতার কাজ করা পেতলের চাবি। স্বপ্নলোকের দরজা খুলবে, না কি রূপকথার জগতে নিয়ে যাবে!

নরম ছাই আর নরম ন্যাকড়া দিয়ে বাগানের লোহার বেঞ্চে বসে গোমেজ ঘষে ঘষে চাবিটাকে সোনার মতো করে ফেললেন। ঘষেন আর ভাবেন, কোথাকার চাবি? কিসের চাবি? এতকাল ছিল কোথায়? এল কোথা থেকে! এ-বাড়িতে এত জিনিস, কোথায় কী আছে ভালভাবে জানেন না নিজেই। পায়ের জন্যে সে-ভাবে চলাফেরাও করতে পারেন না।

শেলিকে ডাকলেন। চাবিটা হাতে দিয়ে বললেন, 'দ্যাখ তো মা, এটা দিয়ে কী খোলে?'

আর ঠিক সেই সময় সুকু এসে হাজির। সন্ধে হয়ে এসেছে। জঙ্গলের ধারে ফেউ আর বুনো কুকুর ডাকছে।

'এই দ্যাখো সুকু, কী সুন্দর একটা চাবি!'

সুকু চাবিটা দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন চাবি সে জীবনে দেখেনি।

সে এক ভীষণ উত্তেজনা! সুকু আর শেলি দু'জনে খুঁজছে, এ চাবি কিসের চাবি! কী খুলবে এ-চাবিতে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ গোমেজ। কপালে ঝুলে আছে কাঁচাপাকা চুলের গোছা। দেওয়ালে খাড়া একজোড়া অ্যালুমিনিয়াম ক্রাচ। বসে বসে শুনছেন, সারা বাড়িতে একজোড়া কিশোর-কিশোরীর পায়ের শব্দ। গোমেজ স্বপ্ন দেখছেন, এরা যদি এই ভাবেই সারাজীবন, এই মন নিয়ে পাশাপাশি ঘুরতে পারত! তা হলে বড় শান্তি নিয়ে মরতে পারতেন! সুকু ছেলেটার কোনও তুলনা হয় না। তা কি আর হয়! এতকাল বেঁচে আছেন, একটা কিছু ভাল হয়নি! কিচ্ছু না। তবু। চাবিটা এল কীভাবে! স্বপ্ন! স্বপ্নে বাগানের বেঞ্চ ক্রাচ ছাড়া আস্তাবল অবধি গেলেন কি করে! গোমেজ ভাবছেন। কূলকিনারা নেই ভাবনার।

ঘরের পর ঘর। বিশাল-বিশাল ঘর। সুকু আর শেলি ঘেমে গেছে। সব ঘরই ধুলো আর ঝুলে ভরা। কে পরিষ্কার করবে! লোকজন নেই। ঘরে ঘরে আলমারি, ড্রয়ার, দেওয়াল-আলমারি, লোহার সিন্দুক। বিলেতে তৈরি।

দুজনে একটা করে জিনিসে চাবি ঢোকায়। পাক মারে। খোলে না। আবার অন্যটায়। শেলি একসময় সুকুর কাঁধে মাথা রেখে বলে, 'ওঃ গড, আর পারছি না।'

সুকুর ঘাড়ে, বুকে লুটিয়ে পড়েছে শেলির সোনালি চুল। নাকের কাছে উশখুশ করছে একটা চুল। সামনের দেওয়ালে বিবর্ণ এক তৈলচিত্র। শেলির মায়ের। লেস দেওয়া গাউন পরে সুন্দর এক চেয়ারে বসে আছেন সুন্দর মহিলা।

সুকু বললে, 'আমার যা খিদে পেয়েছে না! পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

'দাঁড়াও না, একটু পরে তোমাকে আমি স্যাণ্ডউইচ খাওয়াব।'

পেছনের বারান্দায় একপাশে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। উঠে গেছে ছোট্ট একটা কুঠুরিতে। শেলি বললে, 'দাঁড়াও, আমি বাতি ধরে আগে উঠি। তুমি সাবধানে এসো পেছনে-পেছনে। দু'একটা ইঁদুর-টিঁদুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে ভয় পেও না।'

'ভয়!' সুকু হাসল!

ভয় কাকে বলে সুকু জানে না।

ভীষণ অন্ধকার এক চোরকুঠুরি। মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় ভয়ঙ্কর ভাঙাচোরা চেয়ার। ছেঁড়া তারের গদি। লাম্প স্ট্যাণ্ড। তাল-তোবড়ানো শেড। সুকুর পায়ের ওপর দিয়ে খচমচ করে কী একটা চলে গেল। মনে হয় ধেড়ে ইঁদুর।

শেলি বললে, 'এই কুঠুরিতে আগে আমি কখনও আসিনি ভয়ে।'

'আজ প্রথম এলে?'

'হ্যাঁ।,

'কী মজা! তবে ভীষণ গরম।'

খুঁজতে খুঁজতে, এক কোণে দেখা গেল অদ্ভুত একটা সিন্দুক। লম্বা-লম্বা পেতলের পাটি বসানো। টেনে-টুনে মালপত্তর সরাতেই সিন্দুকটা বেরিয়ে পড়ল। রূপ দেখে শেলি আর সুকু দু'জনেই হাঁ। জলদস্যুর গল্পে এই রকম সিন্দুকের ছবি দেখা যায়।

সুকু হাঁটু গেড়ে বসে চাবি লাগাল। ঘোরাতেই খুলে গেল তালা। উত্তেজনায় সুকুর শরীর কাঁপছে। শেলি আনন্দে সুকুকে জড়িয়ে ধরেছে পেছন থেকে। দুজনে অনেকক্ষণ রইল ওই ভাবে। সুকু কেবল ভাবছে, এটা যদি রাজা সলোমনের সিন্দুক হয়ে যায়! ডালা খোলা মাত্রই শেলির জন্যে বেরিয়ে আসে মুঠোমুঠো মণি, মাণিক্য, রত্ন!

সুকুর বুকের দু'পাশে ঝুলছে শেলির গোলগোল হাত। পিঠের ওপর তার গোটা শরীরের ভার। শেলির হাত দুটো মুঠোয় ধরে সুকু বললে, 'এবার খুলি তা হলে! খুলে দেখি কী আছে!'

শেলি ফিসফিস করে বললে, 'আমার ভয় করছে। যদি অন্য কিছু থাকে?'

'অন্য কিছু মানে?'

'ধরো যদি আস্ত একটা কঙ্কাল থাকে!'

'কঙ্কাল? কঙ্কাল থাকবে কেন? তোমার কী মাথা!'

শেলি বিজ্ঞের মতো বললে, 'অনেক সময় থাকে গো। ইংরেজী গল্পের বইয়ে আমি পড়েছি।'

'খুব করেছ।'

সুকু উঠল। সিন্দুকের ডালা ধরে টানল। ভীষণ ভারী। তা হোক। সুকুর শরীরে কম জোর! ধীরে-ধীরে ডালা খুলল। অনেক দূর পর্যন্ত ভেতরে থই-থই অন্ধকার। শেলি বাতিটা কাছে নিয়ে এল। অনেক নিচে পড়ে আছে একতাড়া কাগজ। পার্সেলের মতো বাঁধা। আর কিছুই নেই। হিরে নেই, পান্না নেই। গয়না উপচে পড়ছে না। সুকু হতাশ হয়ে বললে, 'ধ্যুত। এই একতাড়া কাগজের জন্যে এত খাট্‌নি!'

'তুলে দ্যাখো না, কী কাগজ। এত যত্ন করে সিন্দুকে ভরা!'

কাগজের বাণ্ডিলটা সুকু তুলে নিল নিচু হয়ে। দলিল টলিল হবে মনে হয়।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওরা দুজনে ধীরে ধীরে নেমে এল নিচে। মাথায় ঝুল। সারা শরীরে ধুলো।

শেলি বললে, 'সুকু, আজ তুমি এখানে থাকো না গো!'

'মা বকবে। বলে তো আসিনি।'

'তোমার মা কোনও দিন কাউকে বকেন না। আমি জানি।'

'ভাববেন তো! কাল পূর্ণিমা। কাল থাকব।'

'ঠিক? তিন সত্যি করো।'

'থাকব, থাকব, থাকব।'

গোমেজ বেতের চেয়ারে বসে এলোমেলো ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শেলি আলতো হাত কাঁধে রেখে নরম গলায় ডাকলে, 'বাবা।'

গোমেজ চমকে উঠলেন।

'চাবি লেগেছে।'

'অ্যাঁ, লেগেছে?'

'চোরকুঠুরিতে একটা অদ্ভুত সুন্দর সিন্দুক আছে। তুমি জানতে?'

'সিন্দুক!' গোমেজ ভাবনায় পড়লেন।

'তা কী পেলি? পেলি কিছু?'

'এই যে একতাড়া কাগজ।'

'কাগজ? কী কাগজ?'

'দ্যাখোই না।'

'ঘরের টেবিলে রাখ। পরে দেখব।'

বনের পথ ধরে সুকু যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন বেশ রাত।

বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, চেয়ারে বসে ছিলেন মা। গম্ভীর গলায় বললেন, 'দাঁড়াও।'

সুকু থমকে দাঁড়াল।

'কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?'

রুকু ঘর থেকে বেরিয়ে এল, "আগে ওকে ভিতরে আসতে দাও মা, তারপর বকবে।"

'তুমি ঘরে যাও। সেই বেলা দুটোর সময় স্কুল থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিল, আমাকে জানতে হবে।'

সুকু শান্ত গলায় বললে, 'আমি কোনও অন্যায় করিনি মা। সব শুনলে তুমি বলবে, ঠিক করেছিস সুকু।'

সুকুর বলা আর গলা শুনে রাজ্যেশ্বরী থমকে গেলেন। বললেন, 'জানিস, তোর জন্যে আমি অনবরত ঘরবার করছি।'

'জানি মা, আমার কোনও উপায় ছিল না।'

'কারুর অসুখ?'

'না, তুমি বোসো, আমি সব বলছি।'

'এখন থাক। আগে খেয়ে নে। মুখ শুকিয়ে গেছে।'

'পাঁচ মিনিট মা। পাঁচটা মিনিট সময় দাও আমাকে। তোমাকে না বললে আমি যে খেতেও পারব না।'

সুকু ধীরে-ধীরে গোটা কাহিনীটাই মাকে শোনাল। কাঠ-কৈলাস কী বলেছে তাও বলল। কৈলাসের একটা কথা ভীষণ মনে লেগেছে, 'তোমার বাবার তো অনেক পয়সা, তাঁকেই বলো না টাকাটা শোধ করে দিতে।'

রুকু বললে, 'পাজি।'

রাজ্যেশ্বরী ছেলেকে ধমক দিলেন, 'ছিঃ, তোমরা যত বড় হচ্ছ, তত অসভ্য হয়ে যাচ্ছ। কৈলাসবাবু তোমাদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, তাঁকে গালাগাল দিচ্ছ!'

'আমার রাগ হয়ে গেছে মা।'

'রাগ দমন করতে শেখো। তোমরা আমাদের ছেলে। আমাদের আলাদা একটা সভ্যতা আছে।'

ডাক্তার মুখার্জি পুজো সেরে বাইরের বারান্দায় এলেন, 'কী গো, তোমাদের কিসের সভা?'

রাজ্যেশ্বরী বললেন, 'এখানে বোসো। কেস খুব সিরিয়াস।'

'সে তো জানি, কেস সিরিয়াস না হলে আমার কাছে আসবে কেন?'

'এ-কেস সে-কেস নয় গো।'

রাজ্যেশ্বরী স্বামীকে সব বলে প্রশ্ন করলেন, 'কী করা যায়?'

ডক্টর মুখার্জি লাফিয়ে উঠলেন, 'কী, এত বড় কথা বলেছে? আমি এখুনি যাব।'

'কোথায়?'

'কৈলাসের কাছে।'

'কী করবে? ঝগড়া?'

'এই তোমার ধারণা! জীবনে আমাকে ঝগড়া করতে দেখেছ? একটা নতুন গাড়ি কিনব বলে ষাট হাজার জমিয়েছি। সেই টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে দোব।'

'তোমার এই গাড়িটা ঝরঝরে হয়ে গেছে।'

'যাক। ইঞ্জিন ঠিক আছে। একেবারে বাঘের বাচ্চা।'

'এক কথায় পঞ্চাশ হাজার দিতে তোমার কষ্ট হবে না?'

'তোমার হবে?'

'না।'

'তা হলে আমারও হবে না। কটা বাজল?'

'সাড়ে ন'টা।'

'আমি আধঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসছি।'

'রুকুকে নিয়ে যাও।'

'নাঃ, বড়দের কথার মধ্যে ছোটদের না থাকাই ভাল।'

বসার ঘরে ফরাসে কাঠ-কৈলাস তাকিয়া ঠেসান দিয়ে আড় হয়ে পড়ে আছে। ষণ্ডামার্কা একটা লোক গায়ে পাউডার ছড়িয়ে ভীম-বিক্রমে ডলছে।

'আরে, আরে, ডাক্তারবাবু যে! কী ভাগ্য! যাঁকে কল দিয়েও পাওয়া যায় না, তিনি বিনা কলে এসে গেলেন। বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে। আর এ লখনুয়া, তু যা রে।'

লোকটা কুচকাওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। কৈলাস ঢেকেচুকে সোজা হয়ে বসল। কোলের ওপর তাকিয়া। ডক্টর মুখার্জির বিশ্রী লাগছিল। যত তাড়াতাড়ি লোকটার সামনে থেকে সরে পড়া যায়, ততই ভাল। কোনও রকম ভণিতা না করেই বললেন, 'টাকাটা আমিই দোব।'

'কোন টাকা জি?'

'গোমেজসায়েবের বাড়ি বন্ধকি।'

'অউর দেনেসে কেয়া হোগা! কেয়া ফয়দা! কোর্টের ডিক্রি তো হয়েই গেছে।'

'আপনার একটু মানবতা নেই?'

'মানবতা? হাম তো মানব ছে। ও বাঙলোটা আমার চাই। বহত বড়িয়া ছে। ওখানে আমি একটা বড় হোটেল বানাব জি। বড়িয়া স্পট ছে!'

'আর ওই বৃদ্ধ শিক্ষক তাঁর মেয়েটিকে নিয়ে ভেসে যাবেন?'

'তো হাম কেয়া করেগা। হামারা বিজনেস।'

'একটু ভেবে দেখবেন না? কভি কভি শোচনা তো পড়তাই।'

কৈলাস হাহা করে হেসে বললে, 'আপনি আপনার লাইনে শোচুন, আমি আমার লাইনে। সম্পত্তি বহত গন্ধি চিজ ডাক্তারসাব।'

'বেশ! তবে কী জানেন, কে কতদিন ভোগ করবে, এই হল কথা। আপনার হার্টের যা অবস্থা!'

'ডাক্তার হয়ে আপনি আমার মৃত্যু কামনা করছেন? আজিব বাত। আমি মরলে আমার ছেলে ভোগ করবে। মউত কা বাত কোন্ বোলেন সেফে। রাত যাদা বেড়ে গেল, ডাক্তারসাব। আমার খানার টাইম হয়েছে। আপ কুছ খায়েঙ্গা?'

'না।,

'তব তো ঠিক হ্যায়। রাগ করেছেন?'

'না, রাগ নয়। দুঃখ পেয়েছি।'

'জীবন তো দুঃখেরই ডাক্তারবাবু। দুখহরণকো ভজনা চাহি। দুখতারণ করুণাময়। আরে এ লখনুয়া, খানা লাগা রে।'

সড়ে দশটার সময় ডক্টর মুখার্জি ফিরে এলেন, গম্ভীর মুখে।

রাজ্যেশ্বরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল?'

'একটা পিশাচ, বুঝলে, মানুষ নয়, পিশাচ। টাকাই সব। টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আমি কাল সকালে গোমেজসায়েবের কাছে যাব। কেসের কাগজপত্র দেখে ঠিক করব, পাল্টা কেস করা যায় কি না! তেমন হলে, সাহেব আর তার মেয়েকে আমাদের এখানে রাখব। ঠাকুর আমাদের কোনও অভাব রাখেননি। বেশ চলে যাবে। রুকু-সুকুকে পড়াবেন। গৃহশিক্ষকের সম্মানে থাকবেন।'

'ওঁরা যে খ্রীস্টান গো।'

'তাতে কী হয়েছে? মুসলমানের আল্লা, খ্রীস্টানের গড, আমাদের ভগবান, আসলে তো সব এক।'

'এ-বোধ তোমার হয়েছে?'

'অনেক আগেই হয়েছে।'

রাত নেমে এল মুখার্জি-বাড়িতে। ঘরে-ঘরে নিবে গেল সব আলো। বাগানের গাছে-গাছে ফুলের কুঁড়ি পৃথিবীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে একটু-একটু করে মুখ খুলছে। ভোরবেলা ফুটতে হবে তো!

ওদিকে বৃদ্ধ গোমেজ সেজ জ্বেলে সিন্দুক থেকে উদ্ধার করা পুরনো দলিলের বাণ্ডিল নিয়ে বসেছেন। বাইরে বাতাস বইছে হুহু করে। শেলি ঘুমিয়ে পড়েছে। চেয়ারের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা ক্রাচ দুটোর ছায়া পড়েছে দেওয়ালে।

অসাধারণ একটা জিনিস পেয়েছেন গোমেজ। গুপ্তধনই বলা চলে। ও জেসাস্! গোমেজ ক্রস আঁকলেন বুকের কাছে। এই যে সেই কাগজ, তাঁর বাবা কৈলাসের বাবাকে বসতবাড়ি বাঁধা রেখে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। এ তো জানা ছিল না। তিনিও জানেন না, কৈলাসও জানে না। নিজেদের মধ্যে ব্যাপার, নিজেদের মধ্যেই চাপা ছিল। তারপর বাবার মৃত্যুর পর কৈলাসের ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। সাবেক আটচালার জায়গায় ইমারত তুলেছে। এদিকে বন্ধকি দলিল পড়ে আছে গোমেজের মায়ের পর্তুগিজ সিন্দুকে! ও জেসাস্!

চেয়ারের পাশ থেকে ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে গোমেজ মধ্যরাতের বাগানে নেমে এলেন। চাঁদের আলোয় মোরাম বিছানো সাদা পথ। দূরে ফোয়ারার মাথায় সাদা পরি। এইমাত্র যেন কোথা থেকে উড়ে এসে বাগানে বসেছে। কেউ কোথাও নেই, কিন্তু গোমেজের মনে হচ্ছে, কেউ যেন আছে। আরও একজন। সব সময় তাঁকে রক্ষা করাই যার চেষ্টা। ওই যে চাবিটা। চাবিটা এল কোথা থেকে? কে রেখে গেল কাঠের ডাব্বায়? কৈলাসের নিজের জমিই তো তাঁর বাবার কাছে বহুদিন বাঁধা পড়ে আছে। এ-কথাও লেখা আছে দলিলে, 'কোনও কারণে টাকা শোধ করতে না পারলে আমার ব্যবসায় আপনার বা আপনার বংশধরের ভাগ থাকবে।'

লোহার বেঞ্চে বসে গোমেজ ভাবতে লাগলেন, 'এই তো আমার গুপ্তধন। পঞ্চাশ হাজার এতদিন সুদে বেড়ে নিশ্চয় এক লাখ হয়েছে। তা ছাড়া ওই অতবড় কাঠের কারবারের আমিও তো অংশীদার।'

মধ্যরাতের খই-ফোটা বাগান। দামাল বাতাস। একা বসে বৃদ্ধ গোমেজ। বাতাসে চুল উড়ছে।

এক ঝাঁক তারা তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। চাঁদ হাসছে দূর পাহাড়ের মাথায়।

|| ছয় ||

পরের দিন সকালেই ডক্টর মুখার্জি আর সুকু এলেন গোমেজসায়েবের বাগানে। ঝনঝনে তাজা বাতাসে ইউক্যালিপটাসের গন্ধ মাখামাখি হয়ে আছে। আকাশের গায়ে নীল পাহাড় সবে যেন স্নান করে উঠল।

সুকুর বাবার হাত দুটো নিজের মুঠোয় ধরে বৃদ্ধ গোমেজ আবেগে কাঁপছেন। দু'চোখে জল চিকচিক করছে। ধরা-ধরা গলায় বললেন, 'আপনারা আমার জন্যে এত ভাবেন? এত ভালবাসেন আমাকে! কেন কৈলাসের কাছে গেলেন অপমানিত হতে?'

'আপনি একজন নামী শিক্ষক। শ্রদ্ধেয়। আপনার মেয়েটি আমারও মেয়ে। আপনার আপনজন কেউ না থাক, আমরা আছি। আমি আপনার সব ধার শোধ করতে চেয়েছিলুম; কিন্তু লোকটা অসম্ভব লোভী'

গোমেজ এতক্ষণ একপায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এইবার ক্রাচে শরীরের ভর রাখলেন। বারান্দায় এসে বসলেন সকলে।

শেলি বললে, 'কাকাবাবু বসুন, আমি এখুনি চা আনছি।'

ডক্টর মুখার্জি মিষ্টির প্যাকেট শেলির হাতে দিতে-দিতে স্নেহের গলায় বললেন, 'মা আমার। এ ফেয়ারি। অ্যান এঞ্জেল।'

বুকের কাছে মিষ্টির প্যাকেট দু'হাতে আঁকড়ে ধরে শেলি ভয়ে-ভয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল। নেবে কি নেবে না! গোমেজ হেসে অনুমতি দিলেন।

গোমেজ ডক্টর মুখার্জিকে বললেন, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল কাল রাতে।'

'কী রকম?'

'বহুকালের পুরনো এক সিন্দুক থেকে হঠাৎ এই কাগজগুলো পেয়ে গেলুম। ওই যে টেবিলের ওপর। ওর মধ্যে একটা হল বন্ধকি দলিল। কৈলাসের বাবা আমার বাবার কাছ থেকে বসতবাড়ি বাঁধা রেখে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। আমার বাবা কী রকম মানুষ ছিলেন, জানেন আপনারা? বিপদে সাহায্য করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। দলিল একটা করাতে হয়, তাই করিয়েছিলেন। আর ফেলে রেখেছিলেন এমন এক সিন্দুকে, যেটার কোনও ব্যবহার ছিল না। সাজিয়ে রাখার জন্যে তৈরি। ধার দেবার শর্তে এও বলা আছে, এই পরিবারের উত্তরপুরুষ কারবারে এক-চতুর্থাংশের মালিক হবে।'

'তার মানে কৈলাস জানেই না, আপনি তার জমি, বাড়ি এক পুরুষ আগেই দখল করে বসে আছেন। সে যা কিছু করেছে, সবই করেছে আপনার জমির ওপর। হায় মানুষের ভাগ্য! এবার তা হলে আমরা একটা পালটা কেস ঠুকে দি।'

'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলুম। তারপর ভাবলুম, লোভ ভাল নয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তা ছাড়া আমার বাবা ব্যাপারটাকে আমাদের চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। তা চোখের আড়ালেই থাক। কী হবে! কী আর হবে! ভেসেই না হয় যাই। দেখি না কী হয়!'

'এ কী বলছেন? পাওনার টাকা বুঝে নিতে হবে না। একটা অসভ্য, লোভী মানুষের সঙ্গে ও-সব চলে না। টিট ফর ট্যাট। উঠুন। চলুন আপনার উকিলের কাছে।'

গোমেজসায়েবকে জোর করে তোলা হল। সুকু আর শেলি রইল বাড়িতে। মিনিট পনেরোর মধ্যে উকিল-বাড়ি। গ্রোভার খুব জাঁদরেল উকিল। এক সময় গোমেজসায়েবের ছাত্র ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে দলিলটা পরীক্ষা করে মুখ তুলে তাকালেন।

ডঃ মুখার্জি আশার চোখে, উজ্জ্বল মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মিস্টার গ্রোভার, এইবার কৈলাসকে নিশ্চয় কাত করা যাবে?'

গ্রোভার করুণ হেসে বললেন, 'আমি একটা মূর্খ। মহামূর্খ। আপনাদের চোখে পড়েনি। না পড়ুক। আমার প্রথমেই চোখে পড়া উচিত। এতক্ষণ ধরে দেখার প্র্যোজন ছিল না।'

'কেন, কী হল?'

'এ-দলিলে দু'পক্ষের কারুরই সই নেই। এটা একটা কপি। আসলটা কোথায়! নিশ্চয়ই আছে কোথাও! ভাল করে খুঁজে দেখুন স্যার! আসলটা পেলে ভীষণ ব্যাপার হয়ে যাবে। আপনি স্যার পড়লোক হয়ে যাবেন। সারা জীবন আপনার আর কোনও দুঃখ থাকবে না।'

গোমেজসায়েব চেয়ারের পাশ থেকে ক্রাচ দুটো টেনে নিলেন। বগলে লাগিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ালেন। ডানপাশে ঘুরে গিয়ে চেয়ার আর টেবিলের মাঝখান থেকে নিজেকে বের করে আনলেন। তারপর হেসে উঠলেন হাহা করে। বহুকাল হাসেননি এমন প্রাণখোলা হাসি।

হাসি থামিয়ে বললেন, 'লোভ। লোভে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আবার আমি আমার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছি। লর্ড জেসাস আমাকে পথ দেখাবেন।'

ঘুরে দাঁড়ালেন গোমেজসায়েব। সামনে খোলা-দরজা। তারপরেই পথ। সোজা চলে গেছে দূর পাহাড়ের দিকে। গোমেজসায়েব খটখট করে এগিয়ে চললেন দরজার দিকে।

গ্রোভার বললেন, 'স্যার, আপনার কাগজ। অল ইওর পেপারস।'

'বার্ন দেম। ইউসলেস গারবেজ।'

ডক্টর মুখার্জি তাড়াতাড়ি পিছু নিলেন, 'যাবেন কোথাও? দাঁড়ান দাঁড়ান। আমি তো আপনাকে পৌঁছে দেব।'

গোমেজসায়েব গাড়ি পেরিয়ে ততক্ষণে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছেন। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ব্রাদার, এরপর আমাকে তো একাই হাঁটতে হবে। আমাকে অভ্যাস করতে দাও। আমার মনোবল ভেঙে দিও না। আমি এখন চার্চে যাব। তুমি ভেবো না।'

গোমেজ ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছেন। বেশ দ্রুতই। পেছনে অনুসরণ করছে তাঁর ছায়া।

গ্রোভার মুচকি হেসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে কৈলাসের নম্বর নিতে-নিতে, অনুচ্চ গলায় বললেন, 'বোকা মাস্টার।' ওপাশ থেকে ভেসে এল কৈলাসের গলা, 'কওন?'

'গ্রোভার। শুনিয়ে। আমার হাতে একটা জিনিস আছে, যা দিয়ে তোমাকে বধ করা যায়। হ্যাঁ, একেবারে শেষ করে দেওয়া যায়। কী জিনিস? গেলেই দেখতে পাবে। যাচ্ছি। যাচ্ছি। টাকা রেডি রেখো। আমার টাকা চাই। এক লাখ।'

ফোন ছেড়ে গ্রোভার হাসছেন। মানি, মানি, মানি।

ডক্টর মুখার্জি স্টার্ট দিয়েছিলেন। স্টার্ট বন্ধ করলেন। কী হলব্যাপারটা? ডাক্তারের চোখ। এ তো ভুল হবার কথা নয়। সই আছে। কালোকালির সই। বাদামি হয়ে এসেছে। দরজা খুলে নেমে এলেন। দৌড়ে গিয়ে ঢুকলেন গ্রোভারের বৈঠকখানায়।

ঘরে গ্রোভার নেই। টেবিলে পড়ে আছে ভাঁজ করা সেই দলিল। গ্রোভার ভাবতেও পারেননি, মুখার্জি বা স্যার আবার ফিরে আসতে পারেন। মুখার্জি ছোঁ মেরে দলিলটা তুলে নিয়ে, পায়ের কোনও রকম শব্দ না করে সোজা গাড়িতে। জীবনের প্রথম চুরি। বুক কাঁপছিল। নিঃশ্বাস পড়ছিল দ্রুত। নতুন ব্যাটারি। গাড়ি চাবুকের মতো স্টার্ট নিল। একেবারে ষাটে স্পিড তুলে দিলেন।

দূরে, ওই যে চলেছেন বৃদ্ধ গোমেজ। ক্রাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। মুখার্জি মনে মনে বললেন, 'আমি আপনার ভাগ্য। ভাগ্যের পরোয়া যে করে না, ভাগ্য এসে তারই হাত ধরে'। একেবারে পাশে গাড়ি থামিয়ে মুখার্জি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'গেট ইন স্যার।'

'আই শ্যাল ওয়াক। আমি হাঁটব। আই ক্যান ওয়াক।'

'পরে, পরে হাঁটবেন। এখন হাঁটলে বিপদ হতে পারে। কুইক।'

গাড়ির গতি আশি। হোমেজের কোলে রাবার ব্যাণ্ড জড়ানো দলিলটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'গ্রোভার ইজ এ স্কাউণ্ড্রেল।'

গোমেজসায়েব চুপচাপ। কথা নেই মুখে। তাকিয়ে আছেন সামনে। গাড়ি চলেছে ঝড়ের বেগে। সত্তর, আশি। আশি, সত্তর।

হঠাৎ বললেন, 'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'পিটার মিত্রের কাছে। আমার উকিল। যাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'আপনি গাড়িটা ঘুরিয়ে আর-একবার গ্রোভারের কাছে নিয়ে যাবেন?'

'কেন?'

'একটা কথা। জাস্ট ওয়ান ওয়ার্ড উইথ হিম।'

'ও তো অপরাধী। এ ক্রিমিন্যাল।'

'লর্ড জেসাস বলে গেছেন, হেট দি সিন, নট দি সিনার।'

গাড়ি ঘুরে এল গ্রোভারের বাড়ির সামনে। ক্রাচে ভর দিয়ে নেমে এলেন গোমেজ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। পেছনে ডাক্তার। সামনে ঘরে টেবিলে বসে গ্রোভার। বিধ্বস্ত চেহারা। সারা ঘর ওলটপালট। যেন ঝড় বয়ে গেছে। গোমেজসায়েবকে দেখে ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠলেন।

'স্যার, আপনি?'

'হ্যাঁ, আমি। তোমার কাছে ফিরে এলুম, সামান্য একটা প্রায়শ্চিত্ত বাকি আছে, মাই সান। তুমি আমার ছাত্র ছিলে। আমি তোমার শিক্ষক। ব্যর্থ শিক্ষক। তোমাকে আমি মানুষ হবার শিক্ষা দিতে পারিনি তার কারণ আমি নিজেই হয়তো মানুষ হতে পারিনি। আমি লোভী তুমি নির্লোভ হবে কী করে?এই দ্যাখো, এই সেই দলিল।'

ক্র্যাচে ভর রেখে একপাশে হেলে গোমেজ পকেট থেকে কী একটা বের করলেন।

গ্রোভার কাঁপছেন, ভয়ে লজ্জায়।

কেউ কিছু বোঝার আগে লাইটারের লকলকে আগুনে দলিলের কোণটা ধরলেন, ''তোমার আর আমার লোভ পুড়ে শেষ হয়ে যাক।'

'ও নো!'

গ্রোভার ওপাশ থেকে, ডক্টর মুখার্জি এপাশ থেকে, লাফিয়ে এলেন। দলিল, লাইটার, বগলের ক্রাচ ছিটকে চলে গেল। গোমেজসায়েব পড়ে যেতে-যেতে চেয়ার ধরে সামলে নিলেন নিজেকে।

আর ঠিক তখনই একটা নীল রঙের গাড়ি এসে থামল বাইরে। নেমে এল কৈলাস। কাঠ-কৈলাস। গায়ে ধবধবে সাদা, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, ঢোলা পাজামা। গাড়ির গরমে ঘেমে গেছে।

দলিলের একটা কোণ সামান্য একটু পুড়েছে মাত্র। মেঝে থেকে তুলে নিয়ে গ্রোভার বললেন, 'কৈলাসবাবু, আপনি যে বাড়িটায় আছেন সেটা আপনার নয়।'

'কেয়া। দিমাক গড়বড় হো গিযা।'

'সেই বাড়িটা আমার স্যারের। আর এই তার প্রমাণ। দলিল।' কৈলাস একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল।

ওদিকে পিচ ফলের গাছের নিচে বসে আছে সুকু আর শেলি। শেলির কোলে একটা পাকা পিচ। গাছের প্রথম ফল।

'খাবে?' শেলি ফলটা তুলে দিল সুকুর হাতে।

ফলটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সুকু বললে, 'কী সুন্দর! খেতে মায়া হচ্ছে, তোমার কোলেই থাক।'

'কখন গেছেন ওঁরা। কবে আসবেন?'

গাড়ির শব্দ। মোরামের পথ ধরে গাড়ি আসছে। সুকু আর শেলি ছুটল 'বাবা' 'বাবা' বলে। গোমেজ নেমে এসে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ডক্টর মুখার্জি দুটো আঙুল 'ভি'-এর মতো করে দেখালেন।

'ভিকট্রি, ভিকট্রি।' সুকু লাফাচ্ছে। গোমেজ আর মুখার্জি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখছেন, সুকু আর শেলি নয়, ভবিষ্যৎ যেন আনন্দে নাচছে।

নিজের ঢাক নিজে পেটালে

বড়মামা বললেন, 'এবার আমি নিজের ঢাক নিজেই পেটাব।'

মেজমামা চায়ের কাপে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'সে আবার কী?'

মাসিমা কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'তার মানে লণ্ডভণ্ড আবার একটা কিছু করে ছাড়বে। ইলেকশানে দাঁড়াতে চাইছ নাকি বড়দা?'

'ইলেকশান? ও ভদ্রলোকের ব্যাপার নয়।'

মেজমামা বললেন, 'তাহলে কি ধর্মগুরু হবে?'

'সে শক্তি নেই। ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।'

মাসিমা বললেন, 'তাহলে ঢাকটা পেটাবে কী করে? কী ভাবে?'

'আমি নিজেই আমার জন্মদিন করব। তোরা তো কেউ কিছু করলি না!'

মেজমামা বললেন, 'জন্মদিন! বুড়ো বয়েসে জন্মদিন? লোকে তোমাকে পাগল বলবে।'

'সারা গ্রামের মানুষকে আমি পেট পুরে খাওয়াব। সারাদিন সানাই বাজবে। ফুল, ফুলের মালা। এলাহি ব্যাপার করে ছেড়ে দোব। দেখি লোকে কেমন পাগল বলে! সেদিন সারাদিন আমি ফ্রিতে চিকিৎসা করব। একটাও পয়সা নোব না। ফ্রি ওষুধ।'

মেজমামা বললেন, 'মরবে, একেবারে হাড়-মাস আলাদা করে রেখে যাবে। তোমার জয়ঢাকের মতো পেট ফাঁসিয়ে দেবে।'

'দেখা যাক।'

'মাসিমা বললেন, 'কে রাঁধবে? কে পরিবেশন করবে?'

'তোকে কিছু করতে হবে না। কলকাতা থেকে সাতজন হালুইকর আসবে। আমার বিশজন চ্যালা পরিবেশন রপবে।'

'এ করে কী লাভ হবে। এর মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। লোকে বলবে ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে রুগিমারা পয়সা ওড়াচ্ছে। লোকের চোখ টাটাবে। নামের বদলে বদনামই হবে। তার চেয়ে তুমি বরং জন্মদিনে পশুভোজন করাও। একেবারে নতুন আইডিয়া। একদিকে গ্রামের যত গোরু। আর একদিকে ছাগল। আর একদিকে বেড়াল। আর একদিকে কুকুর। আর ভোরবেলা পাখি। পৃথিবীর কেউ কোনও দিন যা ভাবতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতক মানুষ, অকৃতজ্ঞ মানুষকে খাওয়ানো মানে ভূতভোজন। এ যদি তুমি করতে পার, আমি তোমার দলে আছি।'

বড়মামা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মেজমামাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তুই আমার ভায়ের মতো ভাই। আমি রাম, তুমি লক্ষ্মণ।'

মাসিমা বললেন, 'আহা, কী স্বর্গীয় দৃশ্য!'

বড়মামা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'কিন্তু মেজো, কী ভাবে ওদের নেমন্তন্ন করা হবে? মানুষকে তো চিঠি দিয়ে করে! একটা

গোরু, একটা ছাগলে তো জমবে না। একপাল চাই। বাগান যেন একেবারে ভরে যায়। সেটা কী ভাবে হবে?'

'মাথা খাটাতে হবে।'

মাসিমা বললেন, 'কবে হবে? তার আগের দিন আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব।'

বড়মামা বললেন, 'সে আমি জানি। কোনও ভাল কাজে তোমাকে পাওয়া যাবে না।'

মাসিমা উঠে চলে গেলেন। মেজমামা বললেন, 'তোমার জন্মদিন কবে?'

'সেটা আমাকে দেখতে হবে।'

'সেটা তুমি আগে খুঁজে বের করো আমি ইতিমধ্যে প্ল্যানটা ছকে ফেলি। জিনিসটা যদি করা যায় বড়দা, ফাটাফাটি হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা মেজো, নেমন্তন্ন মানেই তো ভাল-মন্দ খাওয়া। মানুষের খাওয়ার মেনু আমরা জানি। পশুর ভাল খাওয়া কী হবে? মেনুটা কী হবে?'

মেজমামা কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, 'পাখির ভালমন্দ খাবার হল, ফল, মেওয়া। গোরুর হল, ভাল বিচিলি, আখের গুড়, ছোলা, সবুজ ঘাস, গাছের পাতা। ছাগলের বটপাতা, কাঁঠালপাতা। কুকুরের হল মাংস।'

বড়মামা বললেন, 'দুধ, বিস্কুট।'

'মেনুটা আমরা পরে ঠিক করে ফেলব বড়দা।'

মেজমামা উঠে চলে গেলেন। কলেজে আজ আবার সকালেই ক্লাস। বড়মামা হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। ড্রয়ার খুলে খুঁজে খুঁজে একটা কোষ্ঠী বের করলেন।

'বুঝলি, জন্ম-তারিখটা খুঁজে বের করতে হবে। তুই কোষ্ঠী দেখতে জানিস?'

'আমি? আমি তো ওসব জানি না বড়মামা!'

'কী জানিস তুই? নে, এটাকে খোল। ধর।'

কোষ্ঠী খুলছে। খুলতে খুলতে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে গেলুম। কত বড় কোষ্ঠী রে বাবা!

'বড়মামা, ঘর যে শেষ হয়ে গেল। দেয়ালে ঠেকে গেছি। আর যে যাওয়ার জায়গা নেই! একে কী কোষ্ঠী বলে বড়মামা?'

'একে বলে গাছ-কোষ্ঠী। গাছের ডালে বসে ন্যাজের মতো ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে দেখতে হয়। ভাটপাড়ার তর্কপঞ্চাননের তৈরি রে ব্যাটা! এতে সব আছে। নে, মাথার দিকটা মেঝেতে পেতে বইচাপা দিয়ে এদিকে চলে আয়।'

চাপা দিয়ে চলে এলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি। বড়মামা সাবধান করলেন, ' লাকি, কোষ্ঠী নিয়ে ইয়ারকি কোরো না। চুপ করে একপাশে বোসো।'

লাকি ফোঁস ফোঁস করে কোষ্ঠী শুঁকে চেয়ারে গিয়ে বসল জিভ বের করে।

বড়মামা বললেন, 'নে, হামাগুড়ি দিয়ে মাথার দিক থেকে দেখতে দেখতে নিচের দিকে নেমে আয়। দেখবি এক জায়গায় লেখা আছে, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য প্রথম পুত্র জাতবান। ওই জায়গায় লেখা থাকবে মাস, দিন, সাল, তারিখ, সময়।'

'এ খুব কঠিন কাজ যে বড়মামা! আপনার মনে নেই কবে, কোন্ দিন, কোন্ সালে জন্মেছেন?'

'ধুস, নিজের জন্মদিন মনে থাকে? নে নে, হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে দেখতে নেমে আয়। কষ্ট কী রে! হামা দিতেও কষ্ট। ছেলেবালায় কত হামা দিয়েছিস!'

পড়তে পড়তে নিচের দিকে নামছি। সব কি আর পড়ছি, না পড়া যাচ্ছে? কত রকমের নকশা আঁকা। ছবি আঁকা। ছক কাটা। মানুষের ভাগ্য যে কী ভীষণ জটিল? নামতে নামতে পেটে নেমে এলুম। কোথায় সেই জাতবান! সব আছে, ওইটাই নেই।

'বড়মামা, তর্কপঞ্চাননমশাই ওটা লিখতে ভুলে গেছেন।'

'সে কী রে! আমি কি রামচন্দ্র! না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে গেল!'

'লিখতে মনে হয় ভুলে গেছেন।'

'তাহলে একটা কার কোষ্ঠী! ভাল করে দ্যাখ রে গবেট। জন্ম-তারিখ, দিন, সময় ছাড়া কোষ্ঠী হয় না।'

'আপনি একবার দেখুন, আমার চোখে পড়ছে না।'

'এদিকে আয়, ন্যাজটা চেপে ধর। চেপে না ধরলে গুটিয়ে যাবে।'

বড়মামা হামা দিয়ে কোষ্ঠী পড়ছেন, ঘরে এলেন কবি করুণাকিরণ। বড়মামার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। বড় বড় কবিতা লেখেন। মাথায় বড় বড় কাঁচাপাকা চুল। ইদানীং বড়মামার কাছে প্রায়ই আসেন। শরীরে হাজারটা ব্যামো। কখনও পেট ভুটভাট কখনও মাথাধরা। কখনও বুক ধড়ফড়, হাত-পা কাঁপা। কবি বলে বয়স্ক বলে বড়মামা খুব খাতির করেন। বিনা পয়সায় চিকিৎসা চলে। ফ্রি ওষুধ। আজ আবার কী রোগ নিয়ে এলেন কে জানে! এখুনি জানা যাবে।

কবি করুণাকিরণ বললেন, 'কী হে ডাক্তার, আবার নতুন করে হামা দেওয়া শিখছ না কি? দ্বিতীয় শৈশব এরই মধ্যে ফিরে এল?'

'আজ্ঞে না, নিজের জন্ম-তারিখ খুঁজছি।'

'ওটা কোষ্ঠী বুঝি? বাঃ, বেশ পেল্লায় ব্যাপার তো! খুঁজে পেলে?'

'আজ্ঞে না।'

'সরো, আমি খুঁজে দিচ্ছি।'

আমরা তিনজনেই মেঝেতে হামাগুড়ি দেওয়ার অবস্থায়। কবি করুণাকিরণ খুঁজে খুঁজে বের করলেন, বড়মামার জন্মদিন পয়লা আষাঢ়। মেঝে থেকে বীরের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বড় শুভদিনে জন্মেছ হে ডাক্তার। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, প্রথম পুত্র জাতবান। তোমাকে আটকায় কে? ধর্মে, অর্থে, মোক্ষে তরতর, তরতর করে উপর দিকে উঠে যাবে।'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল কেন? ডাক্তার, একবার প্রেসারটা চেক করো তো!'

।। দুই ।।

মেজমামা আজকাল রাতে খই-দুধ ছাড়া অন্য কিছু খান না। ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রাতে গুরুভোজন করলে তাড়াতাড়ি ঘুম পেয়ে যায়। বেশি রাত অবধি লেখাপড়া করা যায় না। দুধে খই ভেজাতে ভেজাতে বললেন, 'তোমার জন্মদিন তাহলে পয়লা আষাঢ়?'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ। এসে গেল। প্ল্যানটা ভেবেছিস কী ভাবে কী হবে?'

'ক'দিন ধরেই খুব ভাবছি, বুঝলে? পাখি আর কুকুরের জন্যে চিন্তা নেই। জানো তো, বাংলার একটা প্রবাদ আছে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।'

'তুই কাককে পাখির মধ্যে ফেলছিস?'

'ও মা, সে কী! কাকা পাখি নয়! দুটো ডানা, উড়তে পারে। পাখি ছাড়া আবার কী?'

'ডাক আর স্বভাব দুটোই ভারী বিশ্রী।'

'তুমি রূপ দেখো না দাদা, গুণটাও দ্যাখো। ইংরিজিতে বলে নেচারস স্ক্যাভেঞ্জার। তাছাড়া পায়রা আছে, চড়াই আছে। আমাদের ঠাকুরদালানেই শ-খানেকের বেশি পায়রা আছে। একমুঠো দানা ছড়ালেই সব ফরফর করে নেমে আসবে।'

'আরে দূর, সে তো সব গোলা পায়রা!'

'গোলা পায়রা নয়! তুমি যে কী বলো দাদা! তোমার জন্যে জাপান থেকে ন্যাজঝোলা পায়রা কে আনবে দাদা! পাখি বলতে তুমি কী বোঝো?'

'ধর, টিয়া, ময়না, দোয়েল, বুলবুলি, ফিঙে, বউ-কথা-কও, নীলকণ্ঠ, কোকিল, বাবুই, চাতক, শালিক। মানে সব জাতের পাখি, যারা গান গাইতে পারে।'

'দ্যাখো দাদা, অমন দুই দুই কোরো না। সব পাখিই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ওই দিন এক ঝাঁক ছাতারে যদি ধরতে পারি, সভা একেবারে জমে যাবে।'

'প্লিজ মেজো, ছাতারে আমদানি করিসনি। ভীষণ ঝগড়াটে পাখি। চিল্লে বাজার মাত করে দেবে।'

'আরে, ভোজসভা একটু সরগরম না হলে মানায়! বিয়েবাড়িতে দ্যাখোনি যত না খাওয়া হয় তার চেয়ে বেশি হয় চিৎকার।'

মাসিমা তাড়া লাগালেন, 'তোমরা দয়া করে টেবিল ছেড়ে উঠবে? রাত কটা হল খেয়াল আছে?'

বড়মামা করুণ মুখে বললেন, 'তুই সব সময় অমন অসহযোগিতা করিস কেন কুসি? তোর সামান্য একটু সহানুভূতি পেলে,

আমরা দু'ভাই পৃথিবী জয় করতে পারি।'

'থাক, তোমাদের আর পৃথিবী জয় করে কাজ নেই। সব মাথায় তুলে এখন জন্মদিন হচ্ছে। তাও কী রকম জন্মদিন, না পশু ভোজন। লোকে শুনলে তোমাদের দুজনকেই পাগলা গারদে দিয়ে আসবে।'

মেজমামা বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উঠে পড়ো বড়দা। এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। কুসিটার মাথায় কোনও আইডিয়া নেই। একেবারেই স্টিরিও।'

দুই মামা ছাদে এসে ঢাউস দুটো বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। মাথার উপর এক-আকাশ তারা। কোণের দিকে একফালি চাঁদ ঝুলছে। মনে হচ্ছে, কে যেন ছবি এঁকে রেখেছে। মাঝে মাঝে বাতাস বইছে। দূরে, বহুদূরে একপাল কুকুর চিৎকার করছে।

মেজমামা বললেন, 'বড়দা, শুনছ। এই গ্রামে ওই রকম কয়েক পাল কুকুর আছে।'

'তুই ওদের নেমন্তন্ন করবি নাকি?'

'নিশ্চয়। তাছাড়া তুমি কুকুর পাবে কোথায়?'

'ওরা তো লেড়ি রে?'

'তোমার বড়দা বড় জাতিভেদ। বর্ণ বৈষম্য দূর করো। ভগবানের রাজত্বে সবাই সমান।'

'ওদের স্বভাব তুই জানিস না মেজো, ম্যানেজ করতে পারবি না। শেষে পুলিস ডাকতে হবে'

'হ্যাঃ, পুলিস ডাকতে হবে! কী যে তুমি বলো বড়দা। স্রেফ ইট মেরে ভাগিয়ে দোব।'

'গোরু আর ছাগলের জন্যে তা হলে কী করবি?'

'নিমন্ত্রণপত্র ছাড়ব। বয়ানটা আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি।

'ভাগনে!'

'বলুন মেজমামা?'

'লেখ তো।'

কাগজ আর কলম নিয়ে বসতেই মেজমামা বলতে শুরু করলেনঃ

সবিনয় নিবেদন,

আগামী পয়লা আষাঢ় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালিত হবে মদীয় ভবনে সাড়ম্বরে, যথোচিত উৎসব সহযোগে। উক্ত পুণ্যদিবসে এই উপনলক্ষে আয়োজিত পশু ভোজসভায়, স-শাবক আপনারা গৃহপালিত গোরু/ছাগলকে উপস্থিত থাকার জন্যে ও প্রীতিভোজে অংশগ্রহণের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। উপহারের বদলে আশীর্বাদই প্রার্থনীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি-নিয়ন্ত্রণবিধি অনুসারেই ভোজের আয়োজন করা হবে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘজীবন কমনা করে তাঁকে জনসেবার সুযোগ দান করুন।

ভবদীয় শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট ঃ প্রাতে সানাই সহযোগে উৎসবের সূচনা। স্নান, পূজাপাঠ, হোম। অনুষ্ঠান-মণ্ডপের উদ্বোধন, মাঙ্গলিক সংগীত। পক্ষী-উৎসব। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় স্বহস্তে পক্ষিভোজন করাবেন। ক্ষণ বিরতি। দ্বিপ্রহরে, গো ও ছাগ উৎসব। সাড়ম্বরে, গোরু ও ছাগলদের সুখাদ্য বিতরণ করা হবে। রাতে কুকুরসেবা। স্বস্তিবাচন। উৎসবের পরিসমাপ্তি।

নিমন্ত্রণপত্র লেখা শেষ হল। বড়মামা গদগদ স্বরে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার! তোর মাথাটা মেজো বেশ ভালই খেলে। সাধে তুই নামকরা অধ্যাপক!'

'নাও, এখন শুয়ে পড়ো। বড় বড় হাই উঠছে। কাল সকালে ভোলাবাবুকে প্রেসে দিয়ে আসতে বোলো, আর বেশি সময় নেই।

শ-দুয়েক কপি ছাপালেই হবে।'

মেজমামা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

|| তিন ||

শ্যামল হাজরার খড়ের গোলা। সন্ধে হয়ে এসেছে। হাজরামশাই ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে, গদির ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। সামনে লাল ক্যাশ বাক্স। মেজমামা আর আমি দোকানে ঢুকতেই, হাজরামশাই ভদ্র হয়ে বসতে বসতে বললেন, 'আসুন, আসুন, মেজবাবু, কী সৌভাগ্য আমার।'

হাজরামশাই কাসতে লাগলেন। এক ঢোক ধুনোর ধোঁয়া গিলে ফেলেছেন।

মেজমামা গদির উপর ঝুলে বসলেন। চোখ জ্বালা করছে। মেজমামা বললেন, 'আপনার কাছে একটা খবরের জন্যে এলুম।'

হাজরামশাই কাসি সামলে বললেন, 'কী খবর মেজবাবু?'

'আচ্ছা, আপনার গোলা থেকে যাঁরা খড় নেন, তাঁদের নাম-ঠিকানা সব আমায় দিতে পারে?'

হাজরামশাই সন্দেহের চোখে তাকালেন, 'কেন বলুন তো? আমায় ভাতে মারতে চান?'

'ভাতে মারতে চাইব কেন?' মেজমামা আশ্চর্য হলেন।

'বলা যায় না, হয়তো পাশাপাশি আর একটা গোলা খুলে বসলেন!'

'পাগল হয়েছেন? প্রফেসারি ছেড়ে গোলা খুলতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'বলা যায় না মেজবাবু। ছেলে-চরানো, আর গরু-চরানো প্রায় এক জিনিস। শেষে হয়তো ভাবলেন বিদ্যের বদলে খড় দেওয়াই ভাল। অনেক সহজ কাজ!'

মেজমামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তা যা বলেছেন! ব্যবসা করতে জানলে তাই করতুম। না, সে কারণে নয়। আমি জানতে চাইছে অন্য কারণে।

মেজমামা সব ভেঙে বললেন। বড়মামার অভিনব জন্মদিন পালনের কথা। গরুদের সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করতে হলে গোরুর মালিকের নাম-ঠিকানা জানা দরকার। সব শুনে হাজরামশাই হাঁ হয়ে গেলেন।

'মেজবাবু, আপনি রসিকতা করছেন না তো! এ-রকম কথা কেউ কখনও শোনেনি।'

'আমার দাদা পশু ভক্ত। সারা জীবন গোরু, ভেড়া, ছাগলেরই সেবা করে গেল। সাত-সাতটা কুকুর। সেই ভালবাসা পরিবারের বাইরে ছাড়িয়ে দেওয়া আর কি! বুঝলেন না হাজরামশাই!'

'সবই বুঝলুম, তবে এই দুর্মূল্যের বাজার। মানুষই খেতে পাচ্ছে না।'

তাহলে বুঝুন, পশুরা কী অবস্থায় আছে? কটা গোরু ভালভাবে খেতে পায়? কটা ছাগল খাওয়ার পর পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে! কটা ছাড়া কুকুরের খাবার স্থিরতা থাকে? পশু বলে কি তারা মানুষ নয়!'

হাজরামশাই হাসলেন। হাসতে হাসতে মোটা একটা খাতা খুললেন, 'নিন, আমি বলে যাই, আপনি লিখে নিন। চা খাবেন মেজবাবু!'

'তা একটু হলে মন্দ হয় না।'

হাজরামশাই কর্মচারীকে ডেকে চায়ের হুকুম দিলেন। নাম-ঠিকানা লেখা চলতে লাগল। অনেকেরই গোরু আছে। মেজমামার খুব আনন্দ। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'গোরুতেই মাত করে দেব। কুকুরের আর দরকার হবে না। বাড়িটা বৃন্দাবন হয়ে যাবে। দাদা আমার রাখালরাজা হয়ে গো-সেবা করবে।'

||চার ||

মাসিমা জিঞ্জেস করলেন, 'তোমাদের পাগলামির দিনটা তাহলে কবে ঠিক হল?'

বড়মামা আর মেজমামা দুজনেই বসেছিলেন। একসঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'পাগলামি মানে? জীবসেবা মানে শিবসেবা। পড়িসনি?'

'পড়েছি দাদা। তবে এখন পড়েছি পাগলের হাতে। দিনটা কবে সেইটা শুধু বলে দাও। তার দু'দিন আগে আমি পালাব।'

'পালাবি মানে! বাড়িতে এত বড় একটা কাজ। শুধু কাজ নয়, সমথিং নিউ। তুই পালালে আমরা যাব কোথায়? তুই আমাদের অনুপ্রেরণা!'

আমার ভূমিকা?'

'দর্শক। তুই হবি দর্শক। খবরের কাগজের লোক আসতে পারে। এমন তো হয়নি কখনও। তাদের একটু আদর-আপ্যায়ন করবি। 'পশুপ্রেমী বড়দা' বলে আমরা একটা পুস্তিকা ছাপাচ্ছি। সেইটা জনে জনে বিতরন করবি। মনে রাখবি-এটা সাধারণ বাড়ি নয়। তপোবন। আশ্রম।'

মাসিমা মুচকি হেসে চলে গেলেন। বড়মামা বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'আমাদের পাগল বলে গেল!'

'আরে এ-পাগল সে-পাগল নয়। এ হল আদরের পাগল। প্রেমিক পাগল। যে-কোনও ভাল কাজ, অভিনব কাজের সূত্রপাতে লোকে পাগলই বলে। তোমার সেই ব্যাঙ নাচানো সায়েবের গল্প মনে পড়ে! পাগলামি থেকে এল বিদ্যুৎ। পাগলামি থেকে এল বসন্তের টিকে। নাও, এসো, চিঠিগুলো খামে ভরে ফেলা যাক। আজই নিমন্ত্রণে বেরোতে হবে। বেশি সময় নেই।'

'তুই কি সত্যিই 'পশুপ্রেমী বড়দা' ছাপাবি?'

'ছাপাবি কী? ছাপতে চলে গেছে।'

'কী লিখলি, আমাকে একবার দেখালি না ভাই!'

'ছেপে আসুক। পড়লে তুমি অবাক হয়ে যাবে। শুরুটা আমার লাইন-দুয়েক মনে আছে-পশু না হলে পশুকে ভালবাসা যায় না। আমাদের পশুপ্রেমী বড়দা আশৈশব পশুপক্ষীর সঙ্গে বিচরণ করতে করতে এখন পশু-ভ্রাতা কি পশু-পিতার স্তরে চলে গেছেন।'

'এই সব লিখলি? লোকে আমাকে ভুল বুঝবে না তো!'

'কেন, ভুল বুঝবে কেন?'

'ওই সব্ লিখে আমাকেই তো পশু বানিয়ে দিলি।'

'মানুষের আর কোনও গৌরব নেই দাদা। এখন পশু হওয়াই গৌরবের। গোরু তবু দুধ দেয়! পাখি তবু গান গায়! কুকুর তবু পাহারা দেয়! তোমার মানুষ কী করে দাদা? শুধু বদমাইশি।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' বড়মামা খামে চিঠি ভরতে লাগলেন আপনমনে।

সন্ধেবেলা আমি আর মেজমামা বেরিয়ে পড়লুম, ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে। বেশ মজা লাগছে। প্রথম বাড়ি। মেজমামা ডাকলেন, 'হরিদা আছেন, হরিদা?'

হৃষ্টপুষ্ট, কালো চেহারার হরিদা বেরিয়ে এলেন। দেখলেই মনে হয় ডেলি সের দুয়েক 'দুধ খান'। খাবেন না কেন? বাড়িতে তিন-তিনটে গোরু। হম্বা হম্বা ডাক ছাড়ছে। ভদ্রলোকের দু'হাতের কনুই পর্যন্ত 'কুচো-কুচো' খড় লেগে আছে। মেজমামাকে দেখেই বললেন, 'আরে ব্বাবা, কী সৌভাগ্য! মেজবাবু যে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ করতে এলুম। আগামী পয়লা আষাঢ় দাদার শুভ জন্মদিন।'

'বাঃ বাঃ, ডাক্তারবাবুর জন্মদিন! নিশ্চয় যাব। সপরিবারে, সবান্ধবে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রন আপনাকে নয়, আপনার তিনটি গোরুকে।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দুপুরবেলা আপনার গোরু তিনটিকে বেশ সাজিয়ে-গুজিয়ে অনুগ্রহ করে নিয়ে আসবেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। বলেন তো গোয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথামত ওদেরও বলে যাই।'

'মানুষের ভাষা যে ওরা বুঝবে না মেজবাবু!'

'আপনি তাহলে ওদের বলে দেবেন। চিঠির তলায় অবশ্য লেখাই আছে, পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনায়। আপনি তাহলে ঠিক সময়ে ওদের নিয়ে যাবেন, কেমন?'

'আমার গোরু তিনটে মেজবাবু ভিন-জাতের। একটু ভাল খায়।'

'কী খায় হরিদা?'

'পাঁচ কেজি ছোলা এক-একজন...।'

পেট ছেড়ে দেবে।'

'আজ্ঞে না, ওইটাই ওদের খোরাক, সম-পরিমাণ খোল-ভুসি আর খড়ের কুচো, এবেলা-ওবেলা মিলিয়ে এক ডজন ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'অ্যাঁ, বলেন কী? মরে যাবে যে।'

'আপনি আপনার পেটের মাপে দেখছেন মেজবাবু। গোরুর পেট তো পেট নয়, জালা। বিদেশী গোরু মেজবাবু, খোরাকটি ঠিক রাখলে তবেই না দুধ ছাড়বে! এবেলা-ওবেলা ষোল-সতের কেজি।'

'এই সাংঘাতিক খোরাক ম্যানেজ করেন কী করে!'

'দুধ বেচে মেজবাবু।'

'আচ্ছা চলি তাহলে-' বলে মেজমামা আমার হাতে টান মারলেন। উৎসাহ যেন মরে এসেছে। শ্যামল সাঁপুই বাড়ির রকে বসে কড়রমড়র করে লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চুমুকে চুমুকে চা খাচ্ছিল। মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্যামল তোমার কটা গোরু!'

'সে তো একবার আমি বলে দিয়েছি, আবার কেন?'

'কাকে বলেছ?'

'কেন, ওই যে সরকারের লোক এসেছিল, কী বললে-সেনসাস না কী হচ্ছে। পশু গণনা।'

'আমি গণনা করতে আসিনি। নেমন্তন্ন করতে এসেছি। দাদার জন্মদিনে তোমার গোরুদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।'

শ্যামল সাঁপুই হেসেই অস্থির। ভাবলে আমরা পাগল হয়ে গেছি। এক-আধটা গোরু। আমার সাত সাতটা গোরু। সব কটাকে নিয়ে যাব? দুটো বাছুরও আছে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সপরিবারে, সবান্ধবে যাবে।'

রাত দশটার সময় ক্লান্ত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা ডিসপেনসারি বন্ধ করে ছোট ছাদে বসে বাতাস সেবন করছিলেন। আর গুনগুন করে গান গাইছিলেন-'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা-'

মেজমামা ধপাস করে বেতের চেয়ারে বসে বুকপকেট থেকে নোটখাতা বের করে,বিড়বিড় করে যোগ করতে শুরু করলেন, 'একশো তিন। বুঝলে বড়দা।'

'আমি যে তোর সঙ্গে যাব...অ্যাঁ, কী বললি?'

'হাণ্ডেড থ্রি, দিশি বিলিতি মিলিয়ে। ধরে নাও শ-খানেক গোরু আসবে। ইয়া-ইয়া সব চেহারা। খোরাক শুনলে তুমি লাফিয়ে উঠবে।'

'ভালই তো, ভালই তো। পেট পুরে সব খাওয়াব।'

'খোরাক শুনবে? পারহেড পাঁচ কেজি ছোলা, সম-পরিমাণ খোল-ভুসি, ছোলার চুনি, কুচো বিচিলি, ভেলি গুড়-আখের গুড় হলেই ভাল হয়। বারোশো ভিটামিন ট্যাবলেট।

'হ্যাঃ, কোথা থেকে শুনে এলি, এসব চালিয়াতির কথা। মানুষই দু'বেলা খেতে পায় না, গোরু খাবে ছোলা, ভিটামিন ট্যাবলেট! এর পর বলবি ছাগলে রাবরি খাচ্ছে।'

'যাদের গোরু তারা বলছে। আমি গোরুর কী জানি বল? একজন বললে, আমার গোরু আধ মাঠ কচি কচি দুব্বো খায়, তা না হলে কনস্টিপেশান হয়।'

'ওসব চালের কথা, রাজনীতি করছে রে মেজ। আমাদের জব্দ করতে চায়। যে যাই বলুক, আমরা আমাদের মেনু অনুসারে খাওয়াব।'

'তা হয় না বড়দা। মানুষ হলে হত। লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, পাঁপরভাজা। পশুদের এক-এক শ্রেনীর এক-এক প্রকার খাদ্য। যার যা খাবার তাকে তো তা দিতে হবে। কুকুরকে আলোচাল দিলে খাবে? ছাগলকে তার নিজের মাংস দিলে ছোঁবে। অশান্তি হয়ে যাবে বড়দা।'

'তা হলে তাই হবে। ছোলা কত লাগবে'

'ধরো, ছশো কেজি। ছশো কেজি খোল, ভুসি, ছোলার চুনি একশো কেজি ভেলি। বাইশটা বড় ছাগল আর বিয়াল্লিশটা ছানা আসবে। কুকুর আসবে ষাট-সত্তর, বিলিতি আরও দশ-বারোটা। ছটা তার মধ্যে অ্যালসেশিয়ান। বাকি ছটা স্পিৎস। দু'দল, না তিনদল। তিনদলের তিন রকম ব্যবস্থা। স্পিৎস খাবে কিমা। অ্যালসেশিয়ান খাবে খাবা-খাবা মাংস, লেড়ি খাবে হাড়গোড়, ছাঁটছুট। ছাগলের জন্যে চাই পুরো একটা কাঁঠালগাছ আর বটগাছ।'

বড়মামা বেশ যেন নার্ভাস হয়ে গেছেন, 'মেজ, খরচের কথা বাদ দে। সে যা হওয়ার হবে। কিন্তু জায়গা লাগবে বিশাল।'

'ম্যানেজ করার জন্যে অনেক লোকও লাগবে। শ-খানেক কাঠের ডাবর চাই, গোরুর জন্যে।'

'আচ্ছা মেজ, আজকাল তো সব খাওয়াবার ভার ক্যাটারারকে দিয়ে দেয়।'

'সে মানুষ হলে হত! পশুদের জন্যে ক্যাটারার নেই, সাপ্লায়ার আছে।'

'কাল ভেটেরিনারি হসপিট্যালের ডাঃ সাহানাকে একবার ফোন করব। দেখি উনি কী ভাবে সাহায্য করতে পারেন।'

সাড়ে এগারোটার সময় সভা ভেঙে গেল।

|| পাঁচ ||

বড়মামা সকালের চায়ে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'ডিফিট, গ্রেট ডিফিট।'

মেজমামা এক চুমুক চা খেয়ে বললেন, 'আমি সারারাত ভেবে দেখলুম, ব্যাপারটা অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো হয়ে যাবে। সামলানো যাবে না। লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। বিশাল জায়গা চাই, বহু লোকজন চাই। আইডিয়াটা ভাল ছিল। কাজের লাগালো গেল না, এই যা দুঃখ।'

মাসিমা বললেন, 'যাক বাবা, বাঁচা গেছে। কদিন ধরে ভগবানকে আমি কম ডেকেছি! যাই, পুজোটা দিয়ে আসি, মানত করেছিলুম।'

মেজমামা বললেন, 'ঝট করে আর একটা নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে ফেলি। আপনার গৃহপালিত পশু নয়, সপরিবারে আপনারই নিমন্ত্রণ। ভাগনে?'

'আজ্ঞে।'

'ঝট করে দু'লাইন লিখে নাও। সবিনয় নিবেদন, অনিবার্য কারণে আগামী পয়লা আষাঢ়, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। পশুসেবার পরিবর্তে সন্ধ্যায় এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রীতিভোজে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। ভবদীয়।'

বড়মামা খুঁতখুঁত করে বললেন, 'অ্যাঃ, ব্যাপারটা গেঁজে গেল রে মেজো।'

|| ছয় ||

আজ পয়লা আষাঢ়

ভোর পাঁচটা থেকে সানাই শুরু হয়েছে। ভোরে সুরে বাজছে।বাইরের বিশাল মণ্ডপ ফুলে-ফুলময়। কাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। আজ একেবারে ঝলমলে রোদ। পুরোহিতমশাই এসে গেছেন। পুজোপাঠ, হোম-অর্চনা শুরু হল বলে। বড়মামার স্নান হয়ে গেছে। পরনে পট্টবস্ত্র, গায়ে উত্তরীয়। রূপ একেবারে খুলে গেছে। কাল থেকে চিঠি আর টেলিগ্রাম আসতে শুরু করেছে, দূর-দূরান্ত থেকে। সকলেই দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

মাসিমা পুজোর আয়োজন করছেন। ভোরবেলাতেই বাজার এসে গেছে। বড় বড় মাছ শুয়ে আছে রকের একপাশে। পুঁচকে একটা বেড়াল মাছের আকার দেখে ভয়ে থমকে পড়েছে, দেয়ালের এক পাশে।

হালুইকর ব্রাহ্মণ হাতা, খুন্তি, ঝাঁঝরি, লটবহর নিয়ে এসে গেছেন। অ্যাসিসটেন্টেরা উনুনে আগুন দিয়েছেন। বাগানের দিকের আকাশে ধোঁয় উঠছে পাকিয়ে।

ইলেকট্রিকের লোক এসে টুনি ঝোলাতে শুরু করেছে। তিনজন ঝাড়ুদার খচরমচর করে ঝাড়ু দিতে শুরু করেছে চারপাশে। আজ সব ছবির মতো হয়ে যাবে

বেলা দিকে ফুলের তোড়া আসতে শুরু করল। হাসপাতাল থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। বড়মামার হাসি-হাসি মুখ। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কপালে চন্দনের টিপ। দুপুরে মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খাবেন। ছোট্ট এক বাটি ঘি খাবেন চুক করে চুমুক দিয়ে। সানাই মাঝে-মাঝে থামছে, মাঝে মাঝে বেজে উঠছে। রান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বাতাসে সুবাস ছড়াচ্ছে।

সন্ধে হতে-না-হতেই পুটুস-পুটুস করে আলোর মালা জ্বলে উঠল চারপাশে। তেমন গুমোট গরম নেই। ভিজে-ভিজে বাতাস বইছে। জুঁই, বেল, রজনীগন্ধার সুবাস। একে একে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করলেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে প্যাণ্ডেল কানায় কানায় ভরে গেল। বড়মামা, মেজমামা, অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। 'আসুন, আসুন, নমস্কার, নমস্কার' এই চলছে সন্ধে থেকে। কারুর হাতে চা, কারুর হাতে ঠাণ্ডা জলের বোতল। আমি বিতরণ করে চলেছি, 'পশুপ্রেমী বড়দা'। জাফরানি রঙের মলাট। গোটা গোটা অক্ষর। কেউ পড়ছেন। কেউ মুড়ে রাখছেন।

টেবিলে টেবিলে পাতা পড়ে গেল। পাশ দিয়ে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে খাবার ছুটছে। রাধাবল্লভী, ফিসফ্রাই। বিরিয়ানি গন্ধে পাগল করে দিচ্ছে। বড়মামা আর মেজমামা হাতজোড় করে সকলকে বলতে লাগলেন, 'এবার আপনারা অনুগ্রহ করে আহারে বসুন।'

সভা একেবারে পরিপূর্ণ। কবি করুণাকিরণ মাঝে একটি আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুরুর আগে আমি একটি কবিতা পড়তে চাই, 'আজি তব জন্মদিনে, হে রাখাল/ বীণা তব বাজে/ জীবনের জয়গানে/ থেমে থেমে/ সেবার মূর্তি তুমি/তোমার চুমি/ শতবর্ষে পার করে/ হেসে হেসে/ তুমি যবে যাবে অমর্তলোকে/ অশ্রুজলে সিক্ত হবে/ রিক্ত ধরণী।'

ফটাফট, ফটাফট হাততালি।

হঠাৎ কোণের দিকে এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বাজখাঁই গলায় বললেন, 'ওয়াক আউট। আপনারা সকলে প্রতিবাদে এখুনি এই সভা পরিত্যাগ করুন।'

'কেন? কেন?'সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন।

'কেন? আপনারা এই পুস্তিকাটা একবার পাতা উলটে দেখেছেন?'

'কী আছে, কী আছে?'

'এই যত কিছু আয়োজন, সবই আমাদের অপমানের কৌশল। এক জায়গায় জড়ো করে পাইকারি দরে জুতো মারার বড়লোকি চাল।'

'কেন? কেন?'

'একটা অংশ পড়ে শোনালেই বুঝতে পারবেন আপনারা। পড়ছি, শুনুন।

'শিবজ্ঞানে, জীব-সেবা যার জীবনের ব্রত, শৈশব থেকেই পশুপ্রেমে সে উতলা। গোরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, কুকুর, পাখি, এদের নিয়ে জীবন কাটাতে পারলে আমার পশুপ্রেমী বড়দা আর কিছুই চায় না। মানবদরদি আমরা দেখেছি, এমন পশুপ্রেমী আমাদের দেশে কদাচিৎ চোখে পড়ে।

'সেই পশুপ্রেমী বড়দার অভিনব জন্মদিনের, অভিনব আয়োজন এই পশুভোজসভা। একদিকে গোরু, আর একদিকে ছাগল, অন্যদিকে পাল পাল কুকুর সেবা করছে, আর তারই জয়গান গাইছে সমস্বরে।'

'অপমান, অপমান!' সভা চিৎকার করে উঠল।

মেজমামা চেঁচাচ্ছেন, 'ছি ছি, ভুল বুঝবেন না, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে।'

বড়মামা বলছেন, 'এ কী বলছেন, এ কী বলছেন, আমি কখনও অপমান করতে পারি! লেখাটা ভুল হাতে পড়েছে।'

কে কার কথা শোনে! সব লণ্ডভণ্ড করে নিমন্ত্রিতরা বেরিয়ে গেলেন। সানাই তখনও বাজছে করুণ সুরে। রাধাবল্লভীর মহাশ্মশানে দুই মামা হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

জ্ঞানী

ওই যে মোড়ের মাথায় তিরিশ নম্বর বাড়িটা, ওই বাড়ির সবাই রাগী, বাড়ির বাইরে একটা মার্বেল পাথরের ফলক আছে। সেই ফলকে কে কবে লিখিয়েছিল 'শান্তিধাম'। পাড়ার লোকেরা এখন বলাবলি করে এই যদি শান্তিধাম হয় তাহলে অশান্তিধাম কাকে বলে? পাড়ার কিছু কিছু বদমাইশ ছেলে মাঝে-মধ্যে শান্তিধামের আগে ছোট্ট করে একটা অ লিখে দিয়ে আসে খড়ি দিয়ে। মার্বেল পাথরটা ময়লা ময়লা হয়ে এসেছে, তাই খড়ির লেখা অ বেশ ভালই বোঝা যায়। এই নিয়েও নিত্য অশান্তি। গেট খুলে প্রকাশবাবু মাঝে-মধ্যেই প্রকাশিত হন। প্রথমেই দেখে নেন মার্বেল পাথরের ফলকটা। যেই দেখেন একটা অ লেখা আছে অমনি সামনের বাড়ির দোতলার খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'আমি সব ব্যাটাকে দেখে নোব। বাইরের দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে নিজের হাতে যা মনে আসবে তাই লিখে দেব। এটা ভদ্রলোকের পাড়া না ছোটলোকের পাড়া? অনেক সহ্য করেছি আর সহ্য করব না, এইবার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।'

প্রকাশবাবু যখন খুব হম্বিতম্বি করছেন সেই সময় বেরিয়ে আসবেন তাঁর স্ত্রী, সামনের বাড়ির সঙ্গে তাঁর একটু বেশি খাতির। ওই বাড়িতে রঙিন টি. ভি. দেখতে যান, তালের বড়া খেতে যান, বেনারস থেকে পাকা পেয়ারা এলে দু-চারটে ভাগ পান, সবচেয়ে বড় কথা খুচখাচ টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে ওই বাড়ির বউ মিলনমালা চুপি চুপি ধার দেন, দেওয়ার সময় ফিসফিস করে বলেন, দেখবেন ও যেন না জানতে পারে। এই ও-টি হলেন বিনয়বাবু, ওই বাড়ির মালিক শান্তশিষ্ট ভারি ভদ্র কখনো জোরে করে বলেন না, কিন্তু সুযোগ পেলেই মানুষকে চটিয়ে আনন্দ পান, যে যাতে রেগে যায় সেই কাজটি করে চুপ করে বসে বসে মজা দেখেনে।

প্রকাশবাবুর স্ত্রী গেটের কাছে এসে স্বামীর চেয়েও জোরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'তুমি কি ওই বাড়ির কাউকে লিখতে দেখেছো যে সাতসকালেই ভদ্রলোকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ষাঁড়ের মত চেল্লাতে শুরু করেছো। আগে দেখবে তারপরে বলবে।'

প্রকাশবাবু বললেন, 'না আমি আগে বলব তারপর দেখব। এর আর দেখাদেখির কি আছে? ওই বাড়ির খোকাটিকে আমি চিনি, বুড়ো খোকা। ওই এসে রোজ একবার করে 'অ' লিখবে আর আমি রোজ একবার করে সেই 'অ' মুছে দেব। আমার এই ফলকটা কি শ্লেট, আর উনি কি এখনও পাঠশালার ছাত্র? আমি এইবার ভোটের লোক ধরে এনে পয়সা করে ওদের বাড়ির গোটা দেওয়ালে বর্ণ পরচয় লিখিয়ে দেব আলকাতরা দিয়ে। দেখি কেমন মুছতে পারে!'

গেটের সামনে ছোটখাট ভিড় জমে গেল। কেউ হয়ত প্রশ্ন করলে, 'কি হয়েছে প্রকাশবাবু?' সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুনে ঘি পড়ল, প্রকাশবাবু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'তাতে তোমার কি? আমার যা হয়েছে আমারই হয়েছে, তোমাকে তা বলতে যাব কেন? হু আর ইউ?' প্রশ্নকারী প্রকাশবাবুকে চেনেন তাই রাগাবার জন্য ভাল মানুষের মত বললে, 'না, ভীষণ উত্তেজিত হয়েছেন তো, আজকাল আবার উত্তেজিত হলে হার্ট হেঁচকি তুলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তা তাই জিগ্গেস করছিলুম আমরা কোন সাহায্য করতে পারি কিনা!'

প্রকাশবাবু আরও রেগে গিয়ে বললেন, 'ক্লিয়ার আউট, অয়েল ইউর ওন মেশিন।'

প্রশ্নকারী বললে, 'অয়েলটা দিন।'

দোতলার জানালায় বিনয়বাবুর মুখ দেখা গেল। তিনি শুধু প্রশ্ন করলেন, 'কি হল প্রকাশবাবু? আবার অ লিখে গেছে?'

প্রকাশবাবু জানালার দিকে তাকালেন, দাঁত কিড়মিড় করলেন, বুকের ছাতি ফোলালেন কমালেন কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বেরল না। ভীষণ রেগে গেলে প্রকাশবাবুর আর মুখ চলে না তখন হাত আর পা চলতে থাকে। পকেট থেকে রুমাল বের করে অ-টা মুছে ফেলে রাগের চোটে রুমালটা দূর করে রাস্তার নর্দমায় ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশবাবুর স্ত্রী বললেন, 'এটা কি হল? সাড়ে সাত টাকা দামের রুমালটা। যাও তোল।' তখন প্রকাশবাবু করুণমুখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। রুমালটা পদ্মফুলের মত নোংরা জলে ভাসছে। যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা সমস্বরে বললেন, 'তুলুন, তুলুন'। বিনয়বাবু দোতলার জানালা থেকে বললেন, 'স্ত্রীর বাক্য অমান্য করবেন

না, তুলে ফেলুন। ওই জামা কাপড়ে আর তুলবেন না, ভেতরে গেয়ে একটা গামছা পরে আসুন।' প্রকাশবাবুর স্ত্রী অমনি বললেন, 'আপনারা বলার কে? রুমাল তুলবে কি তুলবে না সে হল গেয়ে আমাদের ব্যাপার।' স্বামীকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনে বলতে লাগলেন,

'ফেললে কেন?'

'বেশ করেছি।'

'কেন করেছ?'

'আমার রুমাল।'

'আমি কিনেছি।'

'পয়সা আমার।'

'ফেলবে কেন?'

'বেশ করব।'

এই যখন চলেছে তখন বাড়ির কাজের মেয়েটি এসে বলবে, 'সাড়ে আটটা বেজে গেল, আজ কি অফিস-টফিস নেই? তখন দুজনের চটকা ভাঙ্গবে। প্রকাশবাবুর অফিসের বড়বাবু আবার প্রকাশবাবুর চেয়েও রাগী, প্রকাশবাবুকে এর আগে তিন তিনবার পেপার ওয়েট ছুঁড়ে মেরেছেন কোনবারই ঠিকমত লাগাতে পারেন নি। প্রত্যেকবারই টার্গেট মিস করার পর বলেন, 'নেক্সট্ টাইম আপনার মৃত্যু আমার হাতে।'

অফিস শব্দটা যেন মন্ত্রের মতো কাজ করল। জোঁকের মুখে নুনের ছিটের মতো। প্রকাশবাবু বাড়ির উঠোনে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলেন। তিনটে তিন ধরনের কাজের টানে। বাজার, দাড়ি কামানো, স্নান। কাজ তিনটে পর পর যে অর্ডারে করতে হবে, সেই ভাবেই মনে এসেছে।

সামনে যে থলেটা পেলেন, সেইটা হাতে নিয়ে পায়ের কাছে যে চটি জুটলো, সেই জোড়াটা গলিয়ে বাজারের দিকে ছুটতে গিয়েও থেমে পড়লেন। খেয়াল হল, কই আজ তো কেউ চা দিলে না, সকালের চা! চা ছাড়া মানুষের দেহ-ইঞ্জিন চলে!

আবার ভীষণ রেগে গেলেন। রাস্তা থেকে ফিরে এলেন।

'চায়ের পাট উঠে গেছে? সকালের চা?'

স্ত্রী বললেন, 'কেন তোমাকে চা দেয়নি? আমরা তো সবাই চা খেয়েছি।'

'তা তো খাবেই। তোমরা খেলেই আমার খাওয়া হয়ে গেল। যেমন, আমি আজ ফিশফ্রাই খাবো বিকেলে, তোমাদের খাওয়া হয়ে যাবে! আমি জানতে চাই এ সংসারের চাকায় কে তেল দিচ্ছে?'

স্ত্রী জানতে চাইলেন, 'আমি জানতে চাই কে শ্রম দিচ্ছে?'

তেল না শ্রম। তেল না চাকা। কিসের জোরে গাড়ি চলে, এই নিয়ে প্রায় পনের মিনিটের একটা ফাইট হয়ে গেল। মেয়ে এসে বললে,

'বাবা, তুমি তো চা খেয়েছ!'

'সেটা আজ নয় কাল। তোদের দিন কি আজকাল আটচল্লিশ ঘণ্টায় হচ্ছে?'

'ওই দেখ, তোমার খালি কাপ টেবিলের ওপর।'

'ওটা কালকের।'

স্ত্রী বললেন, 'আজকের।'

'ওটা কালকের।'

'আজকের।'

'আই সে কালকের।' রাগে প্রকাশবাবুর দাঁত কিড়মিড় করছে।

স্ত্রী বললেন, 'আমরা মিথ্যেবাদী? আর তুমি একাই সত্যবাদী?'

একটা কিছু শুরু হলেই হল। চলছে তো চলছেই। তারপর যদি কেউ পাশ থেকে খোঁচা মেরে দিলে তো হয়েই গেল। বিনয়বাবু তখনও জানালার ধারে বসেছিলেন, খবরের কাগজ কোলে নিয়ে। তাঁর তো খুব শান্তির সংসার, সেই জন্যে তাঁর হাতে অনেক সময়। ভোর ভোর উঠে বেড়ান আর বাজার একই সঙ্গে সেরে ফেলেন। তারপর ছাদে সাজানো এক সার ফুলগাছের টবে ঝারি করে ফিসফিসে জল দেন। আধঘণ্টা যোগাসন করেন। দশ মিনিট বিশ্রাম। তারপর সুন্দর একটা কাপে চা আর বিস্কুট। তারপর কাগজ। বিনয়বাবু উপর থেকে বললেন, 'তর্কাতর্কির কি দরকার, পোস্টমর্টেম করলেই তো হয়। পেটে চা আছে কিনা ধরা পড়ে যাবে।'

পোস্টমর্টেম শব্দটা খুব পরিচিত। প্রকাশবাবু রাস্তায় নেমে উপর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এখনও জলজ্যান্ত বেঁচে আছি মশাই। অপঘাতে মরিনি। পোস্টমর্টেমের প্রশ্নই আসে না। বোকার মতো কথা বলবেন না।

বিনয়বাবু বললেন, 'আসুন, ওপরে চলে আসুন। ফার্স্টক্লাস এক কাপ চা খেয়ে বাজারে যাবেন।'

'কোনও প্রয়োজন নেই। চা এমন কিছু ভালো জিনিস নয়। আমার চা খাওয়া না-খাওয়ার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

প্রকাশবাবু হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। রেগে গেলে তাঁর এনার্জি বেড়ে যায়। পায়ের কাছে একটা পথের কুকুর চলে এসেছিল। মারলেন এক সুট। ভাগ্য ভালো নিরীহ কুকুর। ঘ্যাঁক করে কামড়ালো না। খেঁউ করে একটা শব্দ করে দূরে সরে গেল। প্রবীণ এক মানুষ পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'কামড়ে দিলে কি হত?'

প্রকাশবাবু বললেন, 'দ্যাটস নট ইওর লুক আউট।'

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। প্রকাশবাবু এতক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন। মুখ খুলে ভদ্রলোককে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ। কাল এই ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে প্রায় হাতেপায়ে ধরেছিলেন, ছেলের ভর্তির ব্যাপারে। তিন নম্বর কম আছে। ভদ্রলোক কথা দিয়েছিলেন, আপনার পিতা এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, আমি নিশ্চয় দেখবো। মনে করুন হয়েই গেছে। প্রকাশবাবু ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবছেন ক্ষমা চাইবেন কি না। ভদ্রলোক তেমন গ্রাহ্যই করলেন না। শুধু বললেন, 'আপনি খুব অসভ্য আর তেঁটিয়া লোক তো!' বলে চলে গেলেন। অন্য কেউ হলে প্রকাশবাবু ঝাড়া আধঘণ্টা ঝগড়া করতেন। ভদ্রলোকের মন্তব্য দাঁতে দাঁত চেপে হজম করলেন। এই তাঁর প্রথম পরাজয়। আর এই পরাজয় তাঁর ছেলের জন্যে। গেবেটটা তিনটে নম্বর বেশি পেলে, ওই ভদ্রলোককে তিনি সহজে ছেড়ে দিতেন? রাস্তা সরকারী। কুকুর বেওয়ারিশ। আর পা তার নিজের। হু আর ইউ?

কোনও রকমে বাজার সেরে বাড়ি ফিরে এলেন। ঢুকেই শুনলেন, মায়ে ছেলেতে ধুম ঝগড়া। প্রকাশবাবু কোনও কথা না বলে ধমাধ্বম ছেলেকে পেটাতে শুরু করলেন। আর বলতে লাগলেন, 'কেবল ঝগড়া, কেবল ঝগড়া। দিনরাত শুধু ঝগড়া। বাড়িতে কাকপক্ষী বসার উপায় নেই। বাড়িটাকে একেবারে ছোটলোকের বাড়ি করে তুললে গো।'

প্রকাশবাবুর ছেলে মার খেতে খেতে বলতে লাগল, 'আমি তো তোমার ফরেই ঝগড়া করছি। মা তোমাকে মিথ্যেবাদী বলেছিল। আমি তাই সেই থেকে প্রটেস্ট করে যাচ্ছি।'

'মিথ্যেবাদীকে মিথ্যেবাদী বলবে না তো কি সত্যবাদী বলবে?'

সবাই অবাক! এ যেন ভূতের মুখে রামনাম। মেয়ে এসে বাবাকে পেছন থেকে জাপটে ধরল। হাই প্রেসারের রোগী। মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। প্রকাশবাবুর স্ত্রী মাথায় জল থাবড়াতে লাগলেন। পাখার স্পীড বাড়িয়ে দেওয়া হল। মেয়ে ভাবতে লাগল, বাবাকে এখন কি দেওয়া উচিত, চা না শরবত! ছেলেকে প্রথম চড়টা মারার সময় ডানহাতের প্রথম আঙুলটা মট করে মটকে গেছে। সেই আঙুলটা দেখতে দেখতে ফুলে উঠল। প্রকাশবাবুর স্ত্রী ছুটলেন বিনয়বাবুর বাড়িতে বরফ আনতে। বরফের সঙ্গে ছুটে এলেন বিনয়বাবু! নিজেই তাঁর আঙুলে বরফ দিতে বসলেন। বিনয়বাবুর স্ত্রী এলেন আনিকা মলম নিয়ে। ছেলের চোখে আঙুলের খোঁচা লেগে গেছে। ছেলের মা তার চোখে শাড়ির আঁচলে মুখের গরম ধরে ভাপ দিচ্ছেন।

বিনয়বাবু বললেন, 'কেন এত অশান্তি করেন অকারণে?'

প্রকাশবাবু বললেন, 'আমরা একেবারে ছোট লোক, ইতর হয়ে গেছি। পালের গোদা হলুম আমি। আমি শুরু করি এরা শেষ করে। আমি কত বড় বংশের ছেলে একবার ভাবুন। আমার বাবা ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক।' কথা বলতে বলতে প্রকাশবাবু ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে ফেললেন। কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগলেন, 'সেই বংশের ছেলে হয়ে আমি কি ভাবে নষ্ট করছি নিজেকে! আপনারাই দেখুন।'

বিনয়বাবু বড় নরম মানুষ। কান্নাকাটি দেখলে তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়। বিনয়বাবুর বাড়িতে কেউ কখনও মুখ ভার করে না। কাঁদে না। সব সময় একটা না একটা হাসির ঘটনা ঘটছেই ঘটছে। তাঁর স্ত্রীর নাম হাসি। মেয়ের নাম শুভ্রা। ছেলের নাম হর্ষ।

বিনয়বাবু বললেন, 'আপনার সব ভালো, কেবল একটাই খারাপ, কথায় কথায় ভীষণ রেগে যান। কারণটা কি? সেই কারণটা দূর করতে পারলেই, আপনি সর্বাঙ্গসুন্দর। কারণটা ভাবুন তো।'

প্রকাশবাবু সংযত হলেন। ভেবে বললেন, 'প্রথম কারণ এ বাড়ির কেউই আমার মনের মতো নয়। আমি যা চাই ঠিক তার উল্টো। আমার ছেলে আর একটু চেপে পড়লে, আর একটু ভাল রেজাল্ট হত। ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারত। আমার স্ত্রী কথার চেয়ে কাজের দিকে মন দিলে এই বাড়ির ছিরি ফিরে যেত। আমার মেয়ে দেখতে সুন্দরী, মনটা সুন্দর হলে, সর্বাঙ্গসুন্দরী হত। এইবার আমি? আমার অনেক আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, কোনটাই পূর্ণ হয়নি। আমার প্রোমোশান হয় না। আমার আয় বাড়ে না, আমার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। আমার টাক পড়ছে, আমার চোখের জ্যোতি কমছে। আমার দাঁতের জোর কমছে। কেউ আমাকে কিছু দেয় না। শুধু চায়, সরকার ট্যাক্স চায়। আমি যে আর পারছি না বিনয়বাবু!'

বিনয়বাবু বললেন, 'আরে আশ্চর্য! আমারও তো সেই একই ইতিহাস। একেবারে অবিকল আপনার মতো।'

প্রকাশবাবু বললেন, 'কই আপনি তো আমার মতো রেগে যান না।'

'তার একটাই কারণ। একবার আমাকে এক সাধু বলেছিলেন, 'দেখ বিনয়, আমরা যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছোট ছোট স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্ন হল স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন। জীবন হল দীর্ঘ এক স্বপ্ন। ধরো যাট কি সত্তর বছর ধরে টানা একটা স্বপ্ন দেখে চলেছে। এর কোনওটাই সত্য নয়। সত্যে যেদিন জেগে উঠবে সেইদিন তুমি জানতে পারবে, জীবনও নেই, মৃত্যুও নেই। দেহও নেই, নামও নেই?'

'আপনি এই আজগুবি, ছেলেমানুষি কথা বিশ্বাস করে সারা জীবন হ্যা হ্যা করে হেসে যাবেন?'

'আরে মশাই, ওই বিশ্বাসে আমি যদি ভাল থাকি, সুখে থাকি, শান্তিতে থাকি, পরমানন্দে থাকি, তাহলে ক্ষতিটা কি? ডাক্তারবাবু যখন বলেন, মশাই রাসটাকস সিক্স তিন পুরিয়া খেয়ে দেখুন, কোমরের ব্যথা নিমেষে সেরে যাবে। তখন আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করে খাই। দেহ-রোগের যেমন ওষুধ আছে, ভব-রোগের সেই রকম ওষুধ আছে। সেই ওষুধ হল, জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া।

জীবনটাকে খেলা ভাবা স্বপ্ন ভাবা। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট।' বিনয়বাবু হেঁকে বললেন, 'চা বোলাও। খেলার শেষে চা।'

একটা পথের কুকুর প্রকাশবাবুদের শান্তি-নিবাসে শান্তি এনে দিল। এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আর কোনও দিন ঝগড়া হয়নি। কারোকে আর খড়ি দিয়ে শান্তির আগে 'অ' লিখতে হয়নি। প্রকাশবাবু সেই কুকুরটিকে আদর করে বাড়িতে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাকে স্নান করিয়ে, সাবান মাখিয়ে, খাইয়ে দাইয়ে একেবারে চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন। কুকুরের নাম রেখেছেন জ্ঞানী। শান্তিনিবাসের গেটের সামনে জ্ঞানী এখন গম্ভীর মুখে বসে থাকে। সাদা আর বাদামী রঙ মেশানো তেল চুকচুকে একটি কুকুর। বাতাসে তার লোম ফুরফুরে হয়ে উড়ছে। শান্ত গম্ভীর এক কুকুর। শান্তিনিবাসের শান্তির প্রহরী।

প্রকাশবাবু মনে মনে বলেন, এই কুকুরই আমার গুরু।

ঘুস

মেজ মামার বই বাড়ছে, বড় মামার বাড়ছে জীবজন্তু আর মাসিমার চড়ছে মেজাজ। আজ মাসিমার স্কুল বন্ধ। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আমাকে বললেন, 'চলো লেগে পড়ি। আমাদের লাইফে তো বসার কোনও সময় নেই!'

লেগেপড়া মানে দু'জনে মিলে খুঁজে খুঁজে বের করা বড় মামার জীবজন্তুরা কি কি অপকর্ম করেছে। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কতটা। বড় মামার কুকুরের সংখ্যা আপাতত সাত। শোনা যাচ্ছে আরও দুটো আসছে। একটা গোল্ডেন রিট্রিভার, আর একটা হাউণ্ড। গোল্ডেন রিট্রিভারের রূপের বর্ণনা শুনে শুনে আমাদের এখন মনে হতে শুরু করেছে-ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ নয়, গোল্ডেন রিট্রিভার। বড় মামাকে প্রশ্ন করেছিলুম-'বড় মামা, সব কিছুর একটা সীমা আছে তো! এত কুকুর কি হবে? সাতটা আছে, দেখতে দেখতে নটা হবে। এর পর তো কুকুর রাখার আর জায়গা থাকবে না।'

'সে তুমি বুঝবে না। আমি গবেষণা করছি। আমার গবেষণার জন্যে কুকুরের প্রয়োজন।'

'গবেষণার তো কিছু দেখছি না। ওরা খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘেউ ঘেউ করছে আর দুষ্টুমি করছে। আর আপনি একে বিস্কুট ছুঁড়ে দিচ্ছেন, ওর মাথায় চাঁটা মারছেন। এর নাম গবেষণা!'

'শোনো-শোনো, এ তোমার মেজবাবুর গবেষণা নয়। আমার এই গবেষণা সমস্ত কুকুর জাতির স্বভাব পাল্টে দেবে। এই যে কুকুরে কুকুরে দেখা হলেই খেয়োখেয়ি সেই খেয়োখেয়ি আর হবে না। সব কুকুর ভাই ভাই হয়ে যাবে। মানুষ যেটা ভুলে গেছে। আমার এইটা হল কুকুরদের ট্রেনিং ক্যাম্প। ধরো এখানে সাতশো কি আটশো কুকুরকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিলুম। সেই ট্রেইনড কুকুর তখন এক এক এলাকার কুকুরকুলকে মানুষ করে দেবে। একেবারে মানুষ।'

মেজ মামা পরিকল্পনা শুনে বলেছিলেন, 'একেবারে মানুষ হলে তো সেই একই হয়ে গেল। আবার খেয়োখেয়ি। তুমি কি করতে চাইছ? কুকুরকে মানুষ, না মানুষকে কুকুর, না কুকুরকে কুকুর। আগে ঠিক করে নাও?

'থাক তোমাকে আর গুলিয়ে দিতে হবে না। তুমি হলে সেই কথামালার শৃগাল, বাঘকে যে খাঁচার বন্দী করে ছেড়েছিল। আমি আমার মত চলি তুমি তোমার মত। তোমার ছাইপাঁশ গবেষণায় আমি নাক গলাই।'

মাসিমা বললেন, 'এই দ্যাখ বড়দার খরগোশ মেজদার অক্সফোর্ড ডিক্সানারির এ থেকে ডি পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছে। মেজদা একবার দেখলেই ক্ষেপে যাবে। আর ক্ষেপে যাওয়ারই তো কথা।'

'এই দ্যাখো মাসি, বড় মামার সেই ধেড়ে বেড়ালটা এমন সুন্দর সোফার ফোমটাকে আঁচড়ে কি রকম দাগ দাগ করে দিয়েছে।'

'সে কি রে, এই তো পরশু দিন নতুন করে দিয়ে গেল। আর পারি না। এ বাড়িতে ওই কুকুর বেড়াল ছাগলই থাক, চল আমরা পালাই।'

তিনটে চাদর বড় মামার কুকুরে ফালাফালা করেছে। আমি জানি বড় মামা বলবেন, 'ও কিছুই না। সাতটা কুকুরের উচিত ছিল সাতটা চাদর ফালা করার।' তারপর গলাটাকে গম্ভীর করে বলবেন-'কি হয়েছে কি, চাদরের ঝোলা অংশে তো বেশ ভালই ঝালর মতো করে দিয়েছে। ডেকোরেশান।'

মাসিমা বললেন, 'তাহলে, এই সপ্তাহে বড়বাবুর পেয়ারের জন্তুরা কি কি উপকার করল-তিনটে চাদর খতম। সোফার ফোমলেদারে বেড়ালের নখের নকশা। মেজবাবুর ইংরেজি ডিক্সনারির এ থেকে ডি হজম। শিকার ধরতে গিয়ে বড়বাবুর পেয়ারের হুলো আমার বাঁয়া তবলাটা চুরমার করেছে। সবচেয়ে শয়তান ছোট কুকুরটা তোর হাওয়াই চপ্পলটাকে সজনে ডাঁটার মতো চিবিয়েছে। একটা সপ্তাহের পক্ষে যথেষ্ট, কি বলিস বুড়ো।'

'এখনও তো তুমি আর ছাগলের দিকে যাওনি মাসি। ও পাড়ায় কি হয়ে আছে কে জানে?'

'ও ছেড়ে দে, বাগানে তো একদিকে চলেছে বৃক্ষ রোপণ উৎসব, আর একদিকে বৃক্ষ হনন। বড়কর্তার পেয়ারের লক্ষ্মী তো বিশ্বপেটুক। সব কটা কলাগাছ মুড়িয়ে খেয়েছে। আর প্রাণের ছাগল রামু তো দেখি আজ দুপুরে বাগানের বেড়াটাকে টোস্ট করার চেষ্টা করছে। আর তিন দিন। তিনটে দিন পরে বেড়া ফাঁক। বড় কর্তাকে বললেই বলবে, রিসার্চ হচ্ছে গবেষণা। ছাগলের হজম শক্তি দেখেছিস কুশি। ওদের হজম-রস থেকে একটা ওষুধ যদি কোন রকমে বের করতে পারি তো, মার দিয়া কেল্লা। মানুষ তখন ছাতার বাঁট খেয়ে হজম করবে। দুটো পাগলে আমার জীবনটা শেষ করে দিল!'

'মেজমামা অতটা নয়।'

'ওই একই। টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। বাড়িতে বই রাখার আর জায়গা আছে? সেদিন বলছে, আলমারি থেকে সব কাপড়-জামা বের করে দিয়ে বড় মাপের বইগুলো রাখবে। যুক্তিটা শুনবি, কাপড়-জামা পুঁটলি করে যেখানে হোক রাখা যায়, দামী দামী বই তো আর পুঁটলি পাকোনো যায় না। বই হল জ্ঞানের ভাণ্ডার। গুচ্ছের জামা-কাপড় কি হবে।'

'মেজমামা বলছিলেন, জানিস বুড়ো, বই দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না, অথচ জানিস শেষ মাসে না আমার দশপয়সার মুড়িও জোটে না।'

'রাখ তো ওসব বাহারের কথা। দিন দিন ভুঁড়ি হওয়ার অন্য কারণ আছে। সে কথাও আমাকে বলেছেন। কি কষ্ট রে বুড়ো। একেবারে ডবল টানা। ডবল টানাটা কি জানো! সকালে খেতে বসে দু'জনের খাবার খেয়ে নেন। দুপুরে টিফিন আর খেতে হয় না।'

'সে না হয় সকালে। আর রাতে? সেদিন রাতে গল্প করতে করতে পঞ্চাশখানা লুচি খেয়েছে। ভাবতে পারিস বুড়ো! পঞ্চাশখানা লুচি!'

'সে কথাও আমাকে বলেছেন। বললেন, লুচি মানে কি? লুচি মানে এয়ার, বাতাস। ফক্কিকারি জিনিস। একশোটা ফুলকো লুচিতে কতটা ময়দা থাকে? তুই লুচির সংখ্যা দেখবি, না ময়দার ওজন দেখবি! তোর বিজ্ঞান কি বলে?'

'ওসব ছেলেভোলানো কথা তুই শুনিস; আমাকে বোঝাতে আসিস নি। মেজদা চিরকালই ভোজনবিলাসী। আমি সেদিন লণ্ড্রীতে জামা পাঠাতে গিয়ে বুকপকেট থেকে রেস্তোরাঁর একটা বিল পেয়েছি। বাষট্টি টাকার চিকেন তন্দুরি খেয়েছে।'

'যাক গে কারুর খাওয়া নিয়ে কথা বলতে নেই।'

'না, আমি তা বলছি না; তবে কি জানিস বেশি খাওয়া ঠিক নয়। শরীর তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়, এই আর কি?'

'এইবার আমি একটা নোটিশ দেবো। এ বাড়িতে বই আর বাড়বে না, জীবজন্তুও বাড়ানো চলবে না। সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

'মাসি, জ্ঞান যে অসীম!'

'তুই থাম। কটা বই পড়ে রে!'

'মেজমামা বলেন বইয়ের মলাটে হাত দিলেই অর্ধেক পড়া হয়ে যায়।

'আর বাকি অর্ধেক? সেই হিসেবে তো হাজার কয়েক বই পড়তে হবে।'

আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে কে খুব চিৎকার করে ডাকছে, 'বাবু, বাবু।'

আমরা ছুটে গেলুম। একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর কাঁধে ঝুলছে বিশাল এক তারের খাঁচা। খাঁচার অনেক পাখি কিচির মিচির করছে।

মাসিমা বললেন, 'কি ব্যাপার!'

'ডাগদার সাব।'

'ডাগদার সাব বাড়ি নেই।'

মাসি বেশ রেগে রেগে উত্তর দিচ্ছে।

লোকটি বললে, 'ডাগদার সাব ভেজিয়েছেন। এই যে চিঠি।'

মাসিমা চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললে, প'ড়।

আমি জোরে জোরে পড়লুম, 'কুশি বোনটি আমার, রাগ করিস নি। জীবে দয়া করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। এর পর আর মনে হয় কিছু বলার থাকে না। খাঁচাটার ডেলিভারি নিয়ে নিস। তোর হিসেব থেকে লোকটাকে এখন তিনশো টাকা দিয়ে দিস।

আমি তোকে সুদ সমেত চারশো টাকা দেবো। মনে রাখিস জীবে দয়া। জিভে দয়া নয়। যা মেজ-র ধর্ম।'

মাসিমা সাধারণত ইংরেজি বলেন না, আজ এত রেগে আছেন, যে চিঠিটা শেষ হওয়া মাত্রই লোকটিকে বললেন, 'গেট আউট'।

সে 'গেট আউট'-এর কি বুঝবে। সে হাসি হাসি মুখে বললে, 'হ্যাঁ মা।'

মাসিমা তখন বললেন, 'বেরোও, দূর হও।'

লোকটি বেশ মজার মানুষ। সে একটু নাচের ভাব করে বলল, 'দূর হটো ভাই দুনিয়াওয়ালে হিন্দোস্তাঁ হামারা হায়।'

মাসিমা বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, 'এটাকে হাটা না বুড়ো।'

'ও হটবে না মাসি, বড় মামা যা বলেছেন তুমি তাই করে দাও।'

পাখিগুলো দারুণ দেখতে। আমিই বুদ্ধিটা বড় মামাকে দিয়েছিলুম। উত্তরের বারান্দাটা বেশ করে জাল দিয়ে ঘিরে মুনিয়া আর বদরি পাখি পুষুন। মনে হবে স্বর্গে আছি। আর ওদের বাচ্চা হবে। ছোট ছোট বাচ্চা ফুরফুর উড়বে। মাসি খুব গজগজ করতে করতে তিনশোটা টাকা লোকটির হাতে দিলেন।

'খাঁচাটা কোথায় রাখবো মা?'

'আমার মাথায়।'

'মা আমার রাগ হয়েছে।'

আহা কি বাংলা! লোকটি আপনমনে বাগানে ঢুকে গেল। গান চলছে কিন্তু। গান থামে নি। খাঁচাটাকে ভেতরের বারান্দায় রেখে সবে কি একটা বলতে যাচ্ছে, আর বড় মামার সাত সাতটা বড় ছোট কুকুর একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করে তেড়ে এল। লোকটি কি ভাল ছুটতে পারে! আবার কি সুন্দর লাফাতে পারে! এক লাফে বাগানের বেড়া টপকে সোজা পুকুরে। জল থেকে উঠে এসে বললে, 'নাইতে বেশ ভালো লাগেতো বাবু।'

'তুমি আগে কখনো চান করোনি?'

'সে দশ বছর আগে। যেবার গঙ্গাসাগর গিয়েছিলুম। চান করবার সময় কোথায়?'

'তোমার কি এমন কাজ?'

'বা বা আমার কাজ নেই? আমাকে তো সব সময় পাখি পাহারা দিতে হয়।'

'কেন?'

'বাঃ বেড়াল খেয়ে নেবে না?'

লোকটি বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বড় মামার কুকুরগুলো কিছু দূর তেড়ে এসে আর আসেনি। ওরা মানুষকে ভয় দেখিয়ে মজা পায়।

লোকটি বললে, 'আবার ঠাণ্ডা না লেগে যায়! হঠাৎ চান করলুম তো!'

'এই গরমে ঠাণ্ডা!'

'ছেলেবেলায় আমার একবার বঙ্কা হয়েছিল।'

'বঙ্কা আবার কি?

'সে তুমি বুঝবে না, ডাক্তারবাবু জানেন। সে খাঁশি, খালি খাঁশি। আরেব্বাপ। তা জানো, আমি চান করলুম, আর আমার মায়ের দেওয়া তিনটে নোট ও চান করল।'

নোটটাকে ঝাড়তে ঝাড়াতে বললে, 'যাঃ ব্যাটা বরাত ভালো।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'চারটে তো বাজল?'

'তা বাজুক না! চারটে বাজলে কি হয়?'

সুর করে বললে, 'বাবুদের বাড়িতে চা হয়। হ্যাঁ গো তোমাদের চা হয়ে গেছে? দেখো না, একটু ম্যানেজ করো না। তোমাদের কুকুরের জন্যেই তো আমি জলে পড়ে গেলুম। আমি চেনা তাই। অচেনা হলে চিৎকার করতুম। চিৎকার করলে লোক জড়ো হলে জুলুম হত। দিনকাল তো ভালো নয়। দেখো না, আদা দিয়ে এক কাপ চা যদি হয়।'

বাবা, লোকটা তো খুব চালু। বড় মামার সব পার্টিই সমান।

'তাহলে খুচরো একটা টাকা দাও। দোকানে চা খাই। আমার তো আবার সব একশো টাকার নোট।'

আমার পকেটে একটা টাকা ছিল, লোকটাকে দিলুম। যেতে যেতে বললে, 'দোকানের চা ঠিক বাড়ির মতো হয় না।'

ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, ধরধর, ধরধর করে একটা টেম্পো এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বললে, 'মুখার্জি বাড়ি?'

'হ্যাঁ মুখার্জি বাড়ি।'

ড্রাইভার তার চেলাকে বললে, 'মোড়ের মাথায় লোকটা ঠিকই বলেছিল। দেখবেন যে বাড়ির ছাদের আলসে থেকে মুখ ঝুলিয়ে সাত আটটা কুকুর জিভ বের করে হ্যা হ্যা করছে, সেই বাড়িটাই মুকুজ্যে বাড়ি। প্যালা ছাদের দিকে একবার তাকা! দৃশ্য। দৃশ্য। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, দশ বারোটা কুকুর। বড়লোকদের কি দশা প্যালা!'

মাসিমা বেরিয়ে এসেছেন, 'এবার আবার কি?'

'বোঝা যাচ্ছে না মাসি!'

ড্রাইভার ভাঁজ করা একটা কাগজ এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'লেটার আছে, লেটার, পড়লেই বুঝতে পারবেন দিদি!' আবার একটা চিঠি। এবার মেজমামা।'কুশি, বোনটি আমার, রাগ করিস নে বোন। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, হঠাৎ, সেই পরমকরুণাময়ের দয়ায়, আমার হাতের মুঠোয়, হঠাৎ একেবারে হঠাৎ, এসে গেল, আর আমি জয় মা বলে খপাত করে ধরে ফেললুম।আজ একটা প্রাচীন লাইব্রেরি বিক্রি হয়ে গেল। আমি বেছে বেছে কিছু প্রাচীন পুঁথি আর গ্রন্থ এই টেম্পো করে তোর কাছে পাঠালুম। তুই করুণাময়ী। তুই জগদম্বা, তোকে পুজোর সময় আমি বোম্বাই নিয়ে যাবো। আমি বড়কত্তা নই। আমার কথার দাম আছে। তুই মালটা ডেলিভারী নিয়ে, টেম্পো ভাড়া তিরিশ টাকা দিয়ে দিস। ত্রিসংসারে আমার কে আছে বল তুই ছাড়া। আপাতত আমার ট্যাঁক গড়ের মাঠ। খুব সাবধানে নামাস। অধিকাংশই জরাজীর্ণ। জোরে নিঃশ্বাস লাগলেও ড্যামেজ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। মনে কর এক গাড়ি পাঁপর ভাজা। এর মধ্যে একটা পুঁথিতে নানা টোটকার কথা লেখা আছে। মনে হয় চুল পড়া বন্ধেরও পাই। সোনা মেয়ে। আমার সন্টুটা আমার মন্টুটা। আমি এখনও বেছে চলেছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, মনে হয় আরও এক টেম্পো পাঠাতে পারবো। বই, শুধু বই। কি ঐশ্বর্য! ইতি, তোর মেজদা।'

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে, 'এই জঞ্জাল কোথায় ফেলবো দিদি?'

'ডাস্টবিনে।'

মাসিমা ভেতরে চলে গেলেন। আমি মাথা খাটিয়ে কয়লার ঘরটা দেখিয়ে দিলুম।

প্রথমে এলেন বড়মামা। দু হাত সামনে বাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে অন্ধমানুষের মতো হাঁটছেন। একটা পা অনেকটা উঁচুতে তুলে সাবধানে ফেলছেন। মাঝে মাঝে টলে যাচ্ছেন। যাব্বাবা। এ আবার কি হল। জলাতঙ্কের মতো ভূমি আতঙ্ক নাকি? বড়মামার কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। সেটা ওইভাবে লেফট রাইট করে চলার জন্যে ধপাক ধপাক করে দুলছে। বড়মামা তো মেজমামার মতো সাইডব্যাগ নেন না, বরং ঠাট্টা করেন। প্রফেসারদের জার্সি হল, কড়া মাড় দেওয়া পাঞ্জাবি আর সাইডব্যাগ আর তার চোখ খারাপ হোক আর না হোক, মোটা ফ্রেমের চশমা। সেই বড়মামার কাঁধে ব্যাগ!

আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে মাসিমাকে ডাকলুম। বড়মামার বোধ হয় স্ট্রোক হচ্ছে। মাসিমাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। বড়মামা ওইভাবে এগিয়ে চলেছেন উঠান দিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে। ওঃ মাসিমার লক্ষ্য বটে! আমি অতটা নজর করে দেখিনি। বড়মামার চোখে চশমা। প্রথম চশমা। মাসিমা এগিয়ে গিয়ে একটান মেরে চশমাটা খুলে নিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় বাইফোকাল'।

বড়মামা বললেন, 'বাঁচালি কুশি। বাইফোকাল। কি অবস্থা রে! সব যেন ঢেউ খেলছে। এই তো দেখছিস সব সমান, চশমাটা পর, দেখবি সব উঁচু-নিচু। শীতলাতলার কাছে তো দুম করে পড়েই গেলুম। ওই যে দেখছিস তলার দিকে গোল চাকা মতো দাগ কাঁচের ওপর ওইটাই মারাত্মক। তুই বল, ওইটুকু জায়গা দিয়ে চোখ চালানো যায়।'

'পরে না গিয়ে চশমাটা তো চোখ থেকে খুলে নিলেই পারতে।'

'যাঃ তা কখনো হয়? চশমা তো পরার জন্যে, পড়ার জন্যে।'

'তুমি তো পড়ার বদলে পড়ে গেলে। তোমার কাঁধে কি?'

'ও কাঁধে!' বড়মামা লাজুক লাজুক হাসলেন, 'মেজোকে উপহারদেবো; কিছু বই রে কুশি।'

'আবার বই!' মাসিমা প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি।

আর তখনই ঢুকলেন মেজমামা। তাঁর কোলে ভারি ভারি সুন্দর একটা বাচ্চা কুকুর।

মাসিমা বললেন, 'এ কি, কুকুর! কুকুর তো তোমার সাবজেক্ট নয়।'

'আমার এক ছাত্র দিলে। বড়দাকে প্রেজেন্ট করবো।'

'কি ব্যাপার বল তো। দু'জনে এত ভাব! বড়দা তোমার জন্যে বই এনেছে। ঝেড়ে কাশো তো। এ যেন দু'জনেই দু'জনকে ঘুস দিচ্ছ।'

বড়মামা বইয়ের ঝোলাটা মেজমামার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, ফ্যান্টাস্টিক কিছু বই। ফর ইউ!'

মেজমামা কুকুরছানাটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ফ্যান্টাস্টিক কুকুর, চিওয়া ওয়া।'

বড়মামা বললেন, 'বেশ, এবার তুমি তাহলে কাজের কথাটা বলো!'

'তুমি আগে বলো।'

'আমি উত্তরের বারান্দাটা জাল দিয়ে ঘিরে পাখি রাখবো। ওই দেখ খাঁচা।'

'আমি তোমার ঘরের দুটো দেয়াল চাই। র্যাক ফিট করে বই রাখব। ওই দেখ এক টেম্পো বই।' এদিক ওদিক তাকালেন 'আমার বই!'

আমি বললুম, 'কয়লার ঘরে রাখা হয়েছে।'

'কয়লার ঘরে! কয়লার ঘরে মা সরস্বতী!'

মেজমামা পড়ি কি মরি করে ছুটলেন। সেখানে বড়মামার পেয়ারের গরু লক্ষ্মী এক খাবলা মা সরস্বতী মুখে পুরে চোখ বুজিয়ে চিবোচ্ছে আরামসে, আর চামরের মতো ন্যাজটা দুলিয়ে দুলিয়ে মশা তাড়াচ্ছে।

দাদুর বেড়াল

ভোরবেলা হরি-নারায়ণঅ, হরি-নারায়ণঅ, বলতে বলতে দাদু আমাদের ঘরের সামনে এসে রাজ যেমন দাঁড়ান তেমনি দাঁড়ালেন রোজকার মতই আকাশে তখন আলো ফুটছে। একটা কি দুটো পাখি ঘুমচোখে আমার পড়া মুখস্থ করার মত কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে ডাকছে। দাদুর 'ওজোন' ভরা বাতাস বইছে। বাতাস অবশ্য নেই আজ।শেষ রাতে তেড়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা। শুয়ে শুয়ে চোখ পিট পিট করে আমি আকাশ দেখে নিয়েছি। চারপাশ নিস্তব্ধ গুমোট। দাদু রোজ যেমন ডাকেন সেই রকম ভারি, ভাবগম্ভীর গলায় ডাকলেন, খোকা উঠে পড়। আমি এগোচ্ছি। দাদুর গলা শুনে বাবা রোজ যেমন ঘুমচোখে পাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আমার ডান কানটা ধরে বার কতক নেড়ে দেন সেই রকম নেড়ে দিলেন। আমি রোজ যেমন ধড়মড় করে উঠে দু'হাঁটুতে মাথা গুঁজে বলি, 'যান, আসছি', ঠিক সেই রকমই বলে, সামনে পেছনে দুলুনে চেয়ারের মত দুলতে লাগলুম। এইভাবে দুললে ঘুম মাথা ছেড়ে পায়ের দিকে নেমে যায়। এই সময়টায় রোজ আমার যেমন হিংসে হয় তেমনি হল। বাবা কেমন আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবেন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অঙ্ক করেন, তাই দাদু তাঁকে ঘুমোবার অনুমতি দিয়েছেন। আমি রাতে জাগতেও পারি না, জাগার অনুমতিও নেই। দাদু বলেন, বৃদ্ধ আর শিশু হল পাখির মত। ভোরে উঠে কলরব করবে। দাদু যেমন হরি নারায়ণ, হরি নারায়ণ করছেন। আমি বলেছিলুম, তা হলে ত পাখির মত সন্ধে বেলাই শুয়ে পড়া উচিত। না, তা হবে না। এ পাখি হল প্যাঁচা আর কাকের মিশ্রণ। রাত দশটা পর্যন্ত হুতোম প্যাঁচা। ডানা মুড়ে, লাল চোখে টেবিলের সামনে। খোলা বই। মাস্টার মশাই। কিন্তু ভোরে কাক। এ পাখি, নতুন জাতের পাখি-'প্যাঁকাক'।

দাদুর পরনে ন-হাতি পট্টবস্ত্র। ধবধবে বিশাল বুকে ইয়া মোটা সাদা পৈতে। পায়ে খটাস খটাস খড়ম। হাতে বেতের সাজি। আর এক হাতে অর্ডার দিয়ে তৈরি করান অ্যালুমিনিয়ামের আঁকশি। বাঁশের আঁকশি রোজ রোজ খুলে যায় বলে, বাবার প্ল্যানে এটা তৈরি করে দিয়েছেন দাদুর এক মক্কেল। ইচ্ছে মত বড় ছোট করা যায়। স্বর্ণচাঁপা গাছ থেকে যখন ফুল পাড়া হবে আঁকশি তখন বড় হবে। রক্ত করবীর কাছে এসে একটু ছোট হবে, টগরে এসে আরও ছোট। বাড়ি ঢোকার সময় ছাতার মাপ। আমি দাদুর ফুল তোলার সঙ্গী। ফুল তোলার পর এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দাদু আমাকে ছোটাবেন কিছুক্ষণ। তারপর কান ধরে কুড়িবার ওঠ বোস। আমার বয়সে দাদুর নাকি ওজন ছিল চল্লিশ সের।

আমি যখন বাগানে গেলুম দাদুর সাজিতে ততক্ষণে জবা কিছু টগর আর গুলঞ্চ মুখ বের করে বসে আছে। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছেলেরা যেন ফোলা ফোলা মুখে টাব-গাড়ি চেপে চলেছে। আমি যেতেই দাদু বললেন, 'মিলিটারিতে কি নিয়ম জান? ফল-ইন বললেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। একটু দেরি হলেই সাজা। পিঠে ওজন নিয়ে সাত মাইল দৌড়। কি করছিলে এতক্ষণ?'

রোজ যা হয় তাই হয়েছিল। আমি খাটের দেয়ালের দিকে, বাবা ধারের দিকে। পা না সরালে নামি কি করে? গুরুজনদের ডিঙিয়ে নামতে নেই। শাস্ত্রে আছে। বললুম, 'পায়ে আটকে গিয়েছিলুম।'

দাদু কি শুনলেন জানি না। বললেন, 'ভেরি গুড। ব্যায়ামের ফল ফলবেই। পা বড় হচ্ছে। মানুষের বাড় ত পায়ের দিক থেকেই হয়। গাছের মত আর কি! নিচের দিক থেকে ওপর দিকে বেড়ে ওঠে। সজনে ডাঁটা, বটের ঝুরি, মাথার চুল, দাড়ি এ সব বাড়ে নিচের দিকে! মানুষ বাড়ে ওপর দিকে।'

কথা বলতে বলতে দাদু আঁকশিটা বড় করে ফেললেন। তার মানে এইবার স্বর্ণচাঁপার ওপর আক্রমণ চলবে। বাগানে পাশাপাশি দুটো চাঁপা গাছ। গেটের দু'পাশে লম্বা প্রহরীর মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষাকাল। তলায় বড় বড় ঘাস হয়েছে। পাতাটাতা পড়েছে অনেক।

দাদু একটা কথা প্রায়ই বলেন, সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। আজও তাই বললেন। বলে, আঁকশি দিয়ে ঘাসের ঝোপ দুলিয়ে দিলেন। ঘাসে সাপ থাকতে পারে। খোঁচা মেরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তিনবার হরিনারায়ণ বলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ। তিনি জেগে থাকলে প্রথম খোঁচাতেই ফোঁস করে বেরোবেন। ঘুমিয়ে থাকলে শেষ হরিনারায়ণেই ফণা তুলে উঠবেন।

ঘাস-ঝোপ দুলে উঠল আর ফোঁস শব্দ নয় অস্পষ্ট একটা মিউ ডাক শোনা গেল। দাদুর কাঁধে পালোয়ানের লাঠির মত আঁকশি, হাতে সাজি, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কিছু শুনতে পেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিউ।'

দাদু আরও ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'এদিকে এসো।'

এগিয়ে গেলুম। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি?'

ঘাস আর পাতার আড়ালে ছোট্ট এক তাল তুলোর মত একটি বেড়ালছানা। এত ছোট যেন চীনাবাদামের খোলার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। শেষ রাতের বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।

'তুলব দাদু!'

'নিশ্চয় তুলবে। জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

'মা কিন্তু বিড়ালের নাম শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে যায়। দেখলে কি হবে বুঝতে পারছেন?'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি আগে ওটাকে তোল।'

তৃণশয্যা থেকে ভিজে বেড়ালছানাটাকে বুকে তুলে নিলুম। ধবধবে সাদা। প্রায় মরেই এসেছি। ঠাণ্ডায় চোখদুটো বুজে আছে। খুলতে পারছে না। ডাকার শক্তি নেই। গায়ে ছিট ছিট কাদা লেগে আছে। দাদু দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন, 'শয়তান!'

'কে শয়তান দাদু?'

'যে এ বেড়াল শিশুটিকে এইভাবে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। সারারাত নিজে শুয়ে রইল নরম বিছানায় পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে। আর এই জীবনটাকে ফেলে রেখে গেল মৃত্যুর মুখে। ভগবানের আদালতে তোমার বিচার হবে। তুমিও বেড়াল হবে। তোমার মত আর এক শয়তান এইভাবে ফেলে রেখে যাবে। আর তখন আমি তোমাক তুলব না।'

'কি করে বুঝবেন দাদু, যে সেই বেড়ালটা বেড়ালরূপী শয়তান?'

'দেখলেই বুঝতে পারব। ঘুটঘুটে কালো রঙ, বুরুশের মত লোম কর্কশ গলা। সে আমি দেকলেই চিনব।'

'বাবা ঘোড়ার ডিম জানে। অঙ্ক ছাড়া কিছুই জানে না। ভূত আছে কিনা তাই জানে না। বলে ভূত আবার কি? আমি ম্যাথেমেটিসিয়ান। প্রমাণ ছাড়া কিছু মানতেই রাজি নই। তাহলে তোমার অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যটা কি? শূন্যর কোনো প্রমাণ আছে? তুমি তর্ক কর! ঠিক বাপের ধাতটি পাচ্ছ! নাও ওর বুকের কাছে কানটা ঠেকিয়ে দেখ তো ধুকপুক করছে কি না?'

বেড়ালটাকে এতক্ষণ বুকের কাছে চেপে ধরেছিলুম। জামাটা ভিজে উঠেছে। সামান্য নড়াচড়া করছে যখন বোঝাই যায় বেঁচে আছে। আবার কান লাগিয়ে নোংরা করি কেন?'বেঁচে আছে দাদু। নড়াচড়া করছে।' বেড়ালটা ঠিক সময় আমার বুকের কাছে আর একবার মিউ করে উঠল। ঠাণ্ডায় চোখ জুড়ে গেছে। পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছে না। আমাকে ত নয়ই। তবু মুখটা আমার মুখের দিকে তুলে এমন করুণ সুরে মিউ করে উঠল। ভীষণ মায়া লাগল। মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে এনে বৃষ্টির রাতে আমাদের বাগানে চুপি চুপি ফেলে দিয়ে যে চলে গেছে সে ভয়ংঙ্কর নিষ্ঠুর। দাদুর আদালতে তার নামে মামলা করা উচিত। মিউ ডাকে বেড়ালটা যেন বলতে চাইছে, তোমাদের হাতেই আমার জীবন-মৃত্যু। বাঁচালে বাঁচব, মারলে মরব। ইস্ রাতে কুকুরেও ত মেরে ফেলতে পারত!

দাদু বললেন, 'নাও ওকে ভেতরে নিয়ে চল। হট ব্যাগ দিতে হবে। ফুটবাথ করাতে হবে।ৎ

'ভেতরে নিয়ে যাব কি করে দাদু? কুকুর আছে না?'

'হ্যাঁ তাই ত! আমি তখনই তোমার বাবাকে বলেছিলুম, কুকুরটুকুর না পোষাই ভাল। এক বাড়িতে কুকুর আর বেড়াল রাখা যায় না। জন্মশত্রু।'

'না, দাদু তখন ও কথা আপনি বলেন নি। বলেছিলেন কুকুর মানুষের বেস্ট ফ্রেণ্ড। প্রত্যেক সভ্য মানুষের কুকুর পোষা উচিত। আর তখন আমাদের বাড়িতে কোনও বেড়াল আসে নি।'

দাদু রেগে গিয়ে বলেন, 'তোমার সঙ্গে আমি এই জীবন-মরণ সমস্যার সময় তর্ক করতে চাই না। আমাকে একটা রাস্তা বের করতে হবে।'

'কি রাস্তা বের করবেন দাদু? একে নিয়ে বাড়ি ঢুকলেই আমাদের টম সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে ফেলবে।'

'হ্যাঁ করলেই হল? করে দেখুক না! মেরে শেষ করে দেব।'

'মা ত বলেন, আমরা দু'জনেই নাকি আপনার আদের বাঁদর হয়ে গেছি।'

'আদের বাঁদর হয় না, মানুষ হয়। তোমার মা তোমার বাবার মতই। সবজান্তা।'

রাস্তা দিয়ে ব্রঙ্কাইটিস কাশি কাশতে কাশতে নেত্যকালীবাবু প্রাতর্ভ্রমণে চলেছেন। প্রতিবার কাশির দমক কমলে তিনি একবার 'ওরে বাবা' বলে গোটা কতক বলেই আবার কাশিতে চলে যান। তার মানে ব্যাপরটা এই রকম দাঁড়ায়-কাশি, ওরে বাবা, কথা, কাশি, ওরে বাবা, কথা।

রোজ আমাদের বাড়ির সামনে এসেই নেত্যকালীবাবুর একটা কাশির দমক আসবে। আজও তাই এসেছে। সামনে ঝুঁকে পড়ে কাশছেন। দাদু যেন আশার আলো দেখলেন। অন্যদিকে নেত্যবাবু কথা বলতে চাইলেও দাদু, হুঁ হাঁ, আচ্ছা আচ্ছা করে এড়িয়ে যান। আজ নিজেই এগিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'ও নেত্য নেত্য।' নেত্যবাবুর কাশি তখনও চলেছে। একটা হাত তুলে বোঝাতে চাইলেন, শুনেছি, শুনেছি, উত্তর দিচ্ছি। দাদুর ত সবেতেই অধৈর্য। মুখ দেখলেই বোঝা যায় গলা টিপে কাশি থামাবার ইচ্ছে ইচ্ছে। অবশেষে থামল। সোজা হয়ে নেত্যবাবু বললেন, 'ওরে বাবা, কি বল?'

'একটা বেড়াল বাচ্চা নেবে?'

'অ্যাঁ, কি বললে?'

'তুমি কানেও কি আজকাল কম শুনছ? কি শরীরই করেছ। একটা বেড়াল বাচ্চা নেবে?'

নেত্যবাবু এই সাত সকালে এমন একটা দানের প্রস্তাব স্বপ্নেও মনে হয় ভাবেন নি। নাক মুখ সিঁটকে বললেন, 'রামোঃ, বেড়াল? বেড়াল আবার মানুষে নেয়। গরু হলে নিতে পারি।'

দাদু রেগে বললেন, 'ভাগো, ভেগে পড়। স্বার্থপর। কেন, তোমার অত বড় বাড় একটা বেড়ালকে মাসখানেক আশ্রয় দিতে পার না! তারপর ত বড় হয়ে নিজের রাস্তা নিজেই দেখে নেবে।'

'সে ত তুমিও দিতে পার। তোমারও ত বেশ বড় বাড়ি, বাগান।'

'আরে মূর্খ, আমার বাড়িতে যে বাঘের মত একটা কুকুর। সাধে তোমাকে বলছি!'

'দেখ মুকুজ্যে, বয়েস তোমারও কিছু কম হল না। কুকুর, বেড়াল, পাখি! আর জড়িয়ে পোড়ো না, মায়া কাটাও, মায়া কাটাও। মনে কর, শেষের-অ সেদিন-অ, কিই ভয়ঙ্কর-অ।'

আবার কাশি। দাদু মুখ ঘুরিয়ে, খড়মের খটাস খটাস শব্দ তুলে আমার দিকে সরে এসে বললেন, 'এ দেশের কোনদিন উন্নতি হবে না। সব স্বার্থ, সব স্বার্থ।'

বাগানে এতক্ষণ আমরা কি করছি দেখার জন্য মা এসে হাজির। আমার কোলে বেড়াল ছানাটাকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন, 'ফেল, ফেল, ফেলে দে।'

দাদু বললেন, 'তুই আমার মেয়ে হয়ে এমন নিষ্ঠুরের মত কথা বলতে পারলি তুলসী!'

মা বললেন, 'তুমি ওটাকে পুষবে না কি?'

'পোষা ত পরের কথা, আগে ওটাকে বাঁচাতে হবে।'

'তোমার টম ওটাকে খেয়ে ফেলবে বাবা। তুমি ও শয়তানকে জান না। ওই দেখ।'

ঘরের জানালায় সামনের পা দুটো তুলে দিয়ে, জিভ বের করে দিয়ে টম ফোঁস ফোঁস করছে, আর বিস্কুট দেখে যেমন জিভ চোকায়, সেই রকম জিভ চোকাচ্ছে। দাদু টমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে টম। আমার টমবাবু, এটা বিস্কুট নয়, তোমার বন্ধু ফ্রেণ্ড।' আমাকে বললেন, 'একটু কাছে নিয়ে যাও, ওকে একটু দেখাও। আমি এই সেদিন একটা ইংরিজি বইয়ে ছবি দেখেছি, কুকুরের ঘাড়ে উঠে তিনটে বেড়াল নাচছে। ট্রেনিং-এ কি না হয়।'

টমের দিকে এক পা এগোতেই, ঘাঁউ করে অ্যায়সা এক ডাক ছাড়ল, আমার কোলে মর মর বেড়ালটাও চমকে উঠল। মা দাদুকে বললেন, 'কি বুঝল? ওর হিংসে তুমি জান না বাবা। ঠিক মানুষের মত। সেদিন তপনের ছেলেটাকে কোলে নিতেই সে কি লাফালাফি! কোল থেকে ফেলে দেবে। রাগ করে তিনদিন কথা বলেনি। যেদিন দুধ খেতে চায় না, সেদিন যেই বলি জলি, টমের দুধটা খেয়ে যাত, অমনি এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ল্যাজ ঝুলিয়ে, সুড় সুড় করে খেয়ে নেয়।'

আমাদের পাশের বাড়িতে একটা লোম-অলা কুকুর আছে। তার নাম জলি। টম তখনও জানলায় ফোঁস ফোঁস করছে। এত জোরে ফোঁস করছে, জানলার গ্রিল থেকে ধুলো উড়ে যাচ্ছে। দাদু বললেন, 'ম্যাথেমেটিসিয়ানকে ডাক। বল আমি ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছি।'

মাকে আর ডাকতে যেতে হল না। দাদুর পরেই বাবা বাগানে আসেন। বাবাই বাগান-করিয়ে। আমরা কেবল ফুল তুলি। মাঝে মধ্যে ডাল ভেঙে ফেলি, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি।

বাবা সব শুনেছেন। শুনবেন না কেন? এতক্ষণ ধরে হই, চই হচ্ছে! চশমা পরে এসেছেন। চশমা পরে এলেই বুঝতে হবে,

কাজের কথা হবে, আমাকে বললেন, 'দেখি, ও কনডিশানটা কি?'

বাচ্চাটাকে হাতে নিলেন। 'ইস্ ভিজে চুপসে গেছে। একটা তেয়ালে চাই। চোখে ড্রপস দিতে হবে, আর চায়ের কাপের গরম সেঁক। ড্রপারে করে বিশ ফোঁটা টেপিড ওয়ার্ম দুধ খাওয়াতে হবে। এক ডোজ অ্যাকোনাইট সিকস একস।' মাকে বললেন, যাও তোয়ালে নিয়ে এস।'

মা বললেন, 'মানুষের তোয়ালে?'

'হ্যাঁ, মানুষের, সেইটাই হয়ে যাবে বেড়ালের।'

মা চলে যেতেই দাদু খুশি খুশি মুখে বললেন, 'সাধে তোমাকে বলি ম্যান অফ অ্যাকসান! আচ্ছা, এটা এখন থাকবে কোথায়?'

কামিনী গাছতলার বাঁধন বেদিতে বসে বাবা বললেন, 'এ বাড়িতে না রাখতে পারলেই ভাল হয়। টমকে বিশ্বাস নেই। ধরলে, ছিঁড়ে দু টুকরো করে দেবে।' বাবা খুব চিন্তিত। মা তোয়ালে এনে বাবার হাতে দিলেন। বাচ্চাটাকে তোয়ালে জড়িয়ে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'আসুন, আমরা একটু মাথা ঘামাই।' মাকে আবার ফরমাস, 'একটা খাতা আর ডট পেন নিয়ে এস!'

বাড়িতে কিছু হলেই মাকে যা খাটতে হয়! সাজি রেখে দাদুও বসে পড়েছেন। খাতা আর ডট এসে গেল। মাকে বললেন, 'তুমিও বল।'

কাগজে কলমে কি হবে কে জানে? বাবা বলেন, গণিতে নাকি সব সমস্যার সমাধান আছে। আমার মনে হয় সরল করা, কি সুদ কষায় এ সমস্যার সমাধান নেই। টাইম অ্যাণ্ড মোশানে থাকতে পারে। যেমন টম যদি এক লাফে ছ হাত যায় আর বেড়ালটাকে কতদূরে রাখলে টম জীবনেও ধরতে পারবে না। সেই শামুকটা, যে জীবনেও বাঁশের ডগায় উঠতে পারল না।

বেদিতে বাবা বসেছেন পা মুড়ে, আচার্যের মত! হাতে ডট পেন। সামনে খোলা খাতা। বাবা বললেন 'আশেপাশে এই পাড়ায় কে বেড়ালটাকে রাখতে পারে? নিন ভাবুন।'

দাদু বললেন, 'বুঝলে একজনকে আমার বড় মনে ধরেছে।'

'বলুন, বলুন!'

'তোমার জ্যাঠাইমা। আমাদের মেজ বউ। খাঁটি হরিভক্ত। গলায় তুলসীর মালা। একটিমাত্র ছেলে। সেও পরম বৈষ্ণব। সখি গো বলে যখন কীর্তনে টান ধরে, হৃদয়ে গামছা মোচড়ানর অনুভূতি হয়।' বাবা লাফিয়ে উঠলেন, 'আঃ এতক্ষণে আপনি ঠিক জায়গায় এসে ঘা মেরেছেন।

'তা হলে 'তুমি তোমার জাততুতো ভাইকে একটা চিঠি লেখ। খোকা আগে অনুমতি নিয়ে আসুক। আমি ততক্ষণ ফার্স্ট এড দি।'

বাবা চিঠি লিখতে লাগলেন, 'প্রীতিভাজনেষু কানু, পৃথিবীতে পরের জন্যে বাঁচাটাই সবচেয়ে বড় বাঁচা।' আর দাদু কোলের ওপর বেড়াল ফেলে হাতে আই ড্রপসের শিশি নিয়ে বলছেন, 'দেখি মা দেখি, চোখ দুটো একটু মেরামত করে দি!' বাবা চিঠি লিখতে লিখতে বলেছেন, 'ওষুধের গায়ে নির্দেশটা একবার পড়ে নিন। বেড়ালের চোখে দেওয়া যায় কিনা! মা একটু দুধ আর তুলো এনেছেন। এলাহি ব্যাপার। ও দিকে টম ভুক ভুক্ করেছে। বেশি জোরে ডাকতে পারছে না, পাছে আমরা ভাবি হিংসে হয়েছে। আবার চেপে রাখতেও পারছে না। কাশির মত।

বাবার জ্যাঠাইমা, মানে আমার দিদা, বৈষ্ণব হলে কি হবে ভীষণ রাগী। সব সময় রাগ রাগ চোখে তাকান। অ্যাই জুতো খোল। জুতো খোল। রাস্তায় কিছু মাড়াস নি তো? গঙ্গাজল ছিটো। আহাহা, বিছানার চাদরটা কুঁচকে দিলি কেন? 'আবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে কি খট খট করছিস? এই রকম একটানা একটা কিছু নিয়ে বকাবকি করবেনই। আমি অবশ্য গ্রাহ্য করি না। আমার কাজ আমি ঠিক করে যাই।

চিঠি নিয়ে যখন গেলুম, দিদা তখন রান্নাঘরের সামনে বসে নারকোল কুরছেন। একথালা সাদা ফুলের মত নারকোল হয়েছে। বেশ লোভ লাগছে। এক চামচে চিনি দিয়ে এক থাবা মুখে ফেলতে পারলে মন্দ হত না। সে হবার উপায় নেই। আমি ডাক পিওনের মত হেঁকে উঠলুম,

'চিঠি।'

'কার চিঠি?'

'বাবার। এই নিন।'

দিদা দু হাত গুটিয়ে নিয়ে মুখ চোখ কেমন করে বললেন, 'ছুঁয়ো না, বাসী জামা কাপড় ছেড়েচো?'

'কখন, কোন্ সকালে?

'দাও, চিঠিটা আমার হাতে আলগোছে ফেলে দাও। দশ পা দূরে বাড়ি, চিঠি লেখার কি হল? তোমার বাবা যে কত কায়দাই জানে! যাও ঘর থেকে চশমাটা এনে দাও। দেখো, এক করতে আর এক করে বোসো না যেন। তোমার হাত পাকে আমার বিশ্বাস নেই।'

চশমা এনে দিদার হাতে দিতে না দিতেই কাকু বাজারের থলে হাতে বাড়ি ঢুকলেন। বেশ হাসি মুখ। মনে হয়, ভাল মোচাই পেয়েছেন। নারকোল কোরা হচ্ছে যখন।

'কি রে, সকালবেলাই?' বাজারের থলেটা দেয়ালে কাত হল। দিদা খ্যাঁক করে উঠলেন,

'ওখানে কাল রাতে চটি ছেড়েছিলি, মনে আছে?

'ওখানে কোথায় গো? সে ত ওইখানটায়।'

'তুই আমার চেয়ে ভাল জানিস?

'আমার জুতো, আমি জানব না, তুমি জানবে?'

'হ্যাঁ আমাকেই জানতে হয়।'

'আচ্ছা বাবা এই নাও।' কাকু ব্যাগটা তুলে দিদার সামনে নামিয়ে দিলেন।'

'এই নে চিঠিটা পড়। তোর দাদা লিখেছে।

কাকু চিঠিটা নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। স্নেহভাজনেষু গোপাল, ভক্ত, আর দয়ালু ব্যক্তি হিসেবে, তোমার একটা পরিচয় আছে। ত্রিসন্ধ্যা না করে জলস্পর্শ কর না। শ্রীচৈতন্যের নামে তোমার চোখে জলের ধারা নামে। তোমার উদারতার পরিচয় আগেও কয়েকবার পেয়েছি আশা করি আর একবার পাব। আমাদের বাগানে আজ কে বা কারা একটি বেড়াল ছানা ফেলে দিয়ে গেছে।'

দিদা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'হবে না, বেড়াল টেড়াল হবে না।'

কাকু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কি হবে না হবে না করছ? এখনও চিঠিটার এক প্যারা বাকি।'

'ওই প্যারাতে আছে, আমাদের বাড়িতে কুকুর-বেড়ালটাকে তোমরা রাখো। বেড়াল বৈষ্ণব নয়। কথায় বলে বেড়াল তপস্বী। ও আপদ আমি ঢুকতে দোব না।'

'আহা, চিঠিটা তুমি শোনোই না।'

দিদা জোরে জোরে নারকোল কুরতে লাগলেন। খুব রাগ হয়েছে। কাকু বাকি অংশ পড়লেন, 'এতটুকু একটি প্রাণী। অতি অসহায়। করুণ মিউ মিউ ডাকে জগতের কৃপা ভিক্ষা করছে। ওদিকে লোলুপ কুকুর অপেক্ষায় আছে, পেলেই ছিঁড়ে খাবে। আমার জ্যাঠাইমার দয়ার শরীর।'

সঙ্গে সঙ্গে দিদার প্রতিবাদ, 'না' আমার দয়ার শরীর নয়।

'হ্যাঁ তোমার দয়ার শরীর।'

'মুখে মুখে তক্ক করবি না গোপাল।'

'তোমার দয়ার শরীর না হলে, আমার দয়ার শরীর হয় কি করে?'

'তুমি দৈত্যকুলে প্রহলাদ।'

'না আমি দেবকুলে'

দিদা ভীষণ ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর।'

কাকু সঙ্গে সঙ্গে পড়া শুরু করলেন, 'বেড়াল বড় হলে আর বাড়িতে থাকে না। স্বাবলম্বী সন্তানের মতই গৃহত্যাগ করে। অতএব মাত্র এক মাসের জন্যে বেড়ালটাকে তোমার নিরাপদ আশ্রয়ে রাখলে বড়ই বাধিত হব। আমি রোজ সকালে এক পোষা পরিমাণ দুধও পাঠাব। কিংবা দুধের টিন। যেটা তোমার সুবিধে! প্রীত্যন্তে।'

কাকু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেড়ালটা কেমন দেখতে রে?'

'দুধের মত সাদা।'

'ন্যাজ?'

'ন্যাজটা জলে ভিজে গেছে ত। সে ভাবে লক্ষ্য করি নি।'

'যাক, ঠিক আছে। তুই তা হলে নিয়ে আয়। আমার অনেক দিনের বেড়ালের শখ। হ্যাঁরে বড় হলে ন্যাজটা বেশ মোটা হবে ত? ন্যাংলা ন্যাজের বেড়াল আমার দু চক্ষের বিষ।'

'হ্যাঁ কাকু মোটা হবে। যেটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয় মোটা ধাতের ন্যাজ।'

দিদা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'গোপাল।'

কাকু হুঙ্কার ছাড়লেন, 'মা।'

'তুই বেড়াল এনে দেখ।'

'হ্যাঁ দেখবই ত।'

আমি পালিয়ে এলুম। এসে দেখলুম সুন্দর দৃশ্য। দাদু তোয়ালে জড়ান বেড়াল কোলে আর বাবা পেনসিল উঁচিয়ে বাগানের পথে এপাশ ওপাশ পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই দু'জনে একই সঙ্গে প্রশ্ন করলেন,

'রিপোর্ট কি? রিপোর্ট কি?'

আমি একটু চেপে চুপেই বললুম। সবটা না বলাই ভাল।

'কাকু বললেন, নিয়ে আয়, আমি ত একটা বেড়ালের অপেক্ষাতেই ছিলুম।'

দাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'দেখলে ত আমি তোমাকে কি বলেছিলুম? ভক্তরা স্বপ্ন পায়। ভগবান বেড়ালের রূপ ধরে আসছেন। নিশ্চয়ই ভোরের স্বপ্ন। তা হলে আর দেরি কেন? যাত্রা শুরু করিয়ে দি, দুর্গা বলে। পুজোটুজো সব মাথায় উঠে গেছে হে। ফুল শুকিয়ে গেল।'

'হ্যাঁ তা হলে যাত্রা শুরু হোক।'

আমার পিসতুতো বোন রেখা এসে গেছে। পাশেই থাকে। ঠিক হল আমরা লটবহর নিয়ে যাব। মাদ্রাজ থেকে বাবা আঙুর এনেছিলেন, সেই আঙুরের বাস্কটটা এল। বেড়াল নাকি বাস্কেটে শুতে ভালবাসে। বাবা বিলিতি বইয়ে ছবি দেখেছেন। নরম টার্কিশ তোয়ালে ত এসেই আছে। স্টেনলেস স্টিলের গেলাসে আধ গেলাস দুধ এল। একটা স্টিলেরে প্লেট এল। সব রেডি। এইবার স্টার্ট। বাবা বেড়ালটার কপালে হাত রেখে বললেন, 'মানুষ হয়ে এসো মানু।'

দাদু আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি অনেক বড় হবে।'

বাবা সব দেখে টেখে বললেন, 'আর একটু সাবধান হওয়া ভাল, কি বলেন?'

'অবশ্যই, অবশ্যই, সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। কি করতে চাও বলো?'

'একটা ছাতা চাই।'

'কেন বল তো? রোদ লাগবে?'

'রোদ নয়, যে কোন সময় কাক আর চিল ছোঁ মারতে পারে।'

'ঠিক বলেছ হে। একেই বলে অঙ্কের মাথা।'

সঙ্গে সঙ্গে ছাতা এসে গেল। রথের দিন পূর্ণ ঠাকুর যে ভাবে ছাতার তলায় নারায়ণের সিংহাসন নিয়ে হন হন করে হাঁটেন আমিও সেইভাবে হাঁটছি। বাবা আবার হিসেব করে বলে দিয়েছেন, মাথা থেকে ছাতা যেন দশ ইঞ্চির বেশি ফাঁক না হয়। তা হলে ছোঁ মারতে পারে। বেড়ালটা খুব কাবু হয়ে আছে। তা না হলে খচর মচর করে কোল থেকে নেমে যাবার চেষ্টা করত। পেছন পেছন রেখা আসছে। হাতে লটবহর।

রকে দিদা আর বসে নেই। কাকু এপাশে, ওপাশে বাঘের মত পায়চারি করছেন। খুব রাগারাগি হয়ে গেছে দু'জনে, দিদার চশমার খাপটা এক পাশে পড়ে আছে। ও পাশ থেকে এ পাশ ঘোরার মুখে কাকু আমাদের দেখতে পেলেন, 'বাঃ বাঃ এসে গেছিস?'

'কাকু, দিদা এত রেগে যান কেন?'

'ও বয়েস হলেই মানুষের রেগে যাওয়া স্বাভাব হয়। হ্যাঁ বললে না, না বললে হ্যাঁ। আমিও কি এখন কম রেগে আছি ভাবছিস? বেরোতে দিচ্ছি না চেপে আছি।'

'তা হলে?'

'তা হলে আবার কি? আমি বলেছি বেড়াল থাকবে ত থাকবে। আমি বাঘ পুষব, দেখি মা কি করে! আগে মাসীকে দিয়ে শুরু

করি।'

রেখা মেঝেতে থেবড়ে বসে সঙ্গের জিনিসপত্রের হিসেব বোঝাতে লাগল, 'এই হল তোমার বেড়ালের বাড়ি। এই ছাতাটা হল ছাদ, এই হল দুধের গেলাস, এই হল তোমার গিয়ে দুধের থালা, আর তোয়ালে।'

'ছাতাটা নয় রে রেখা। ছাতাটা নিয়ে যেতে হবে।'

'আমরা তা হলে যাই কাকু।'

কাকু অসহায়ের মত মুখ করে বললেন, 'আমাকে একটু ট্রেনিং দিয়ে যা তরু।'

'এর আবার ট্রেনিং-এর কি আছে কাকু? এই বাস্কেটে শুয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে দুধ খাবে। আবার শুয়ে পড়বে। আবার দুধ খাবে। আবার শুয়ে পড়বে। মিঁউ করলেই বুঝবেন, খিদে। ম্যাঁও করলেই বুঝবেন রাগ। ঘড়র ঘড়র করলেই বুঝবেন, কোলে উঠবে। আর মিঁঞাও করলেই বুঝবেন, পালাবার তাল খুঁজছে।'

'এই ত ওদের ভাষা, ম্যাঁও, মিঁউ, মিঁঞাও মাঁও।'

'মাঁওটা ত বললি না।'

'ওটা ত আমি ঠিক জানি না কাকু। বাবার কাছে জেনে এসে বলব।'

রেখা বললে, 'আমি জানি। মাঁও মানেই দুষ্টুমি করার ইচ্ছে, মাঁও মানে আরও আর কি। টেবিলের ওপর থেকে কিছু একটা ফেলব। ফেলে ভাঙব।'

'আচ্ছা, তা হলে তোরা আয়।'করুণ গলা কাকুর।

'আপনি কিছু ভাববেন না কাকু, আমরা মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব, খবর নিয়ে যাব।'

দাদুর আজ আর কোর্টে যাওয়া হল না। বাবা অ্যাটম নিয়ে রিসার্চ করেন। তিনি ঠিক সময়ে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলন। পুজোটুজো সেরে দাদু সাড়ে দশটার সময় এক বাটি মুড়ি নিয়ে আরাম করে বেতের চেয়ারে বসলেন। খোলা পিঠে ইয়া মোটা সাদা এক গোছা পইতে আড়াআড়ি পড়ে আছে। দাদু বলেন, ব্রহ্মদৈত্যের পইতে। পইতেতে চাবি বাঁধা।

মুড়ি খেতে খেতে দাদু মাকে বললেন, 'বুঝলি, বেড়ালটার একটা ব্যবস্থা হওয়ায় বড় আনন্দ পেলুম। ভালো ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবার মত আনন্দ।'

মায়ের অত জীবে দয়া নেই। 'হুঁ' বলে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। দাদু আপন মনেই বক বক করে চললেন। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে দুপুরের দিকে চলে গেল। খাওয়া দাওয়া সারার পর দাদু বললেন,

'আয় বুড়ো ফুরফুরে হাওয়ায় একটু ঘুমোনো যাক।'

আদর এলে দাদু আমাকে বুড়ো বলেন।

দু'জনেরই ঘুম এসে গিয়েছিল। এমন সময় নিচে থেকে মা ডাকলেন, 'জ্যাঠাইমা এসেছেন।'

নাড়া দিয়ে দাদুর ঘুম একটু পাতলা করার চেষ্টা করলুম। 'দাদু, দিদা এসেছেন।'

ঘুমের ঘোরে দাদু বললেন, 'কোন্ দিদা?'

'বেড়াল দিদা।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছেড়ে গেল। উঠে বসলেন। শুনতে পাচ্ছি, দিদা ওপরে উঠতে উঠতে বলছেন, 'সব সুখের শরীর। বেলা তিনটে অবদি পড়ে পড়ে ঘুম। রাজমিস্ত্রী হলে ভরায় উঠে এখন ইট গাঁথতে হত।'

দাদুর মুখ দেখে মনে হল বেশ লজ্জা পেয়েছেন। পা নামিয়ে বিদ্যাসাগরী চটি পরছেন। দিদা ঘরে ঢুকলেন। সাদা ধবধবে থান কাপড়। চোখে চশমা। বেশ রাগ রাগ মুখের ভাব।

'এই যে, ঘুম ভাঙল? বেশ আছেন যা হোক! যা শত্রু পরে পরে। অ্যাঁ।'

দাদু উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় বললেন, 'কেন বলুন তো? কেন বলুন তো?'

'কেন বলুন তো?' দিদার গলা বেশ চড়েছে। 'একটা ফাটা রেকর্ড পাঠিয়ে বেশ আরামে দিব্যি দিবানিদ্রা হচ্ছে। ও দিকে অস্টপ্রহর মিউ মিউ করে আমাকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকু কোথায় দিদা!'

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলেন, 'তিনি অফিসে। তাঁর আর কি! হাসি হাসি মুখে বলে গেলেন, একটু দেখো মা। কে দেখবে বাবা ওই জিনিসকে। একবার দুধ খাওয়াতে গেলুম। থালায় পড়ে চান হয়ে গেল। এখন আষ্টে পৃষ্ঠে লাল পিঁপড়ে ছেঁকে ধরেছে।'

দাদু লাফিয়ে উঠলেন, 'অ্যাঁ বলেন কি? বুড়ো?'

'আজ্ঞে দাদু।'

'গ্যামাকসিন।'

মা এসে দাঁড়িয়েছেন। লক্ষ্য করা হয় নি। ধীর গলায় বললেন, 'উঁহু, মরে যাবে। হলুদ।'

দিদা বললেন, হলুদ কি গ্যামাকসিন, সে তোমরা বোঝো। বেড়ালটাকে দয়া করে নিয়ে এস। আমি দায়িত্ব নিতে পারব না।'

দিদার চড়া চড়া কথায় মায়ের মনে হয় একটু রাগ হল। আমারও বেশ রাগ হচ্ছে। মা বললেন, 'আমরা লজ্জিত। আপনার অসুবিধে করার জন্যে। আমরা এখুনি নিয়ে আসছি।'

দাদু যেন বল পেলেন, 'তুই যাবি?'

'হ্যাঁ যাই। জীবটাকে পিঁপড়েতে মেরে ফেলবে তা ত আর হয় না।'

আমরা দু'জনে দিয়ে দেখলুম বেড়ালটার শোচনীয় অবস্থা। কোথায় তোয়ালে, কোথায় বাস্কেট। জুতোর র‍্যাকের সঙ্গে খাটো দড়ি দিয়ে বাঁধা। দুধে ভিজে লোম ড্যালা ড্যালা। ছোট ছোট থাবায়, নাকে, কানে মহানন্দে লাল পিঁপড়ে ঘুরছে। কিছু দূরে দেয়ালে শ্রীচৈতন্য গলায় মালা পরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

মা আমাদের দলে এসে গেছেন। আর কিসের ভয়। দেখতে দেখতে পিঁপড়ের বংশ নির্বংশ। বেড়ালটাও যেন এতক্ষণে মা পেয়েছে। ঘড়ড় ঘড়ড় শব্দ করছে, আর আদুরে গলায় মিউ মিউ করে ডাকছে। বেড়াল আবার ফিরে চলল। এ যেন উলটো রথ। মায়ের আঁচলের তলায় ম্যাও। কেন জানি না বেড়াল শব্দটা মায়ের ভাল লাগে না। একটু আদর-টাদর এলেই বেড়ালকে ম্যাও বলেন। ম্যাও কোলে মা চলছেন আগে আগে। লটবহর নিয়ে আমি পেছনে।

বাবা অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। এখন জামা কাপড় ছাড়েন নি। দু'জনেই বেশ উত্তেজিত। আমাদের ফিরতে দেখে দু'জনেই হৈ হৈ করে বলে উঠলেন, ওয়েলকাম পুসী, ওয়েলকাম পুসী।'

মা ম্যাওকে আঁচলে করে টমকে ফাঁকি দিয়ে দাদুর লাইব্রেরিতে নিয়ে এসেছেন। বাব তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধকরে দিলেন। টম এখন দোতলায় জানলার সামনে বসে গলা সাধছে। দাদু মায়ের কোল থেকে পুষীকে নিজের কোলে নিয়ে বললেন, 'বাঁচা গেল বাবা। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এল।' তারপর বারোয়ারি তলায় পুজোর নাটকের মেনীদার মত বাঁ হাতে বেড়াল ধরে, ডান হাতটাকে বাতাসে গোল করে ঘুরিয়ে বললেন, 'এই হল তোমার সাম্রাজ্য। অসংখ্য ইঁদুর ঘুরছে আইনের বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে। আইন বাঘা বাঘা অপরাধীদের কাত করলেও ক্ষুদ্র ইঁদুরের কিস্যু করতে পারে না। এইবার তুমি এসেছ। তুমি পারবে। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাও।'

মা দু হাত তুলে দাদুকে থামালেন, 'আর হাসি নয়, আর হাসি নয়। এখনও হাসির সময় আসে নি। রাত আসছে। কে কোথায় থাকবে ঠিক করুন।

বাবর মাথা আবার ঘামতে শুরু করল। ইউরেকার মত বাবার চিৎকার, 'পেয়েছি, পেয়েছি, ডগ গেট।'

বেড়াল কোলে দাদু র‍্যাকের কাছ থেকে উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন, 'ইয়েস, ডগ গেট।'

পর মুহূর্তেই দু'জনে চুপসে গেলেন, 'সে ত তৈরি করাতে সময় লাগবে!' 'তা হলে?'

আবার বাবার আবিষ্কার, 'পেয়েছি, 'পেয়েছি। আইন দিয়ে কুকুর ঠেকাব।'

'সে কি?'

'দেখবেন, যখন করব, তখন সেটা কি।'

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝের বড় ধাপে রাত দশটার সময় কোমর উঁচু একটা বড় র‍্যাক পড়ল, দেয়ালে ঠাস হয়ে। সার সার সাজান হল ল ম্যানুয়েলস। ইয়া মোটা মোটা বইয়ের দুর্ভেদ্য দেয়াল। দোতলায় দাদু আর বেড়াল। নিচের তলায় টম। বইয়ের পাঁচিলে পা তুলে গলা বাড়িয়ে, জিভ বের করে টম হ্যা হ্যা করছে।

বাবা বললেন, 'যতই চেষ্টা কর আইন লঙ্ঘন করার ক্ষমতা তোমার নেই। তবে তোমার আছে, কারণ তুমি বেড়াল। আপনি ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখুন। কাল সকালে মিস্ত্রী ডেকে গেট তৈরি করান হবে।'

নিচে থেকে আমরা দু'জনে দাদু আর দাদুর বেড়ালকে, 'গুড নাইট' করলুম। টম ভুক্ করল।

দাদু বললেন, 'কাল সকালে তোমরা আমাকে গুড মর্নিং না করালে এই আইন টপকে আমার পক্ষে বাগানে যাওয়া সম্ভব হবে নাযে!'

বাবা বললেন, 'আমাকে তা হলে কাল একটু বেআইনী করে ভোরে উঠতে হবে।' 'শুভরাত্রি'।

টম এতক্ষণ ছোট ছোট ঢেঁকুরের ভুক্ ভুক্ তুলছিল। আর সামলাতে পারল না। এবার উদাত্ত ভেউউউ!

অরূপ যাত্রা

ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট দশেক দেরি আছে। ওপরের বাঙ্কে অরূপের জায়গা। ভালই হয়েছে, এক ঘুমেই যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। নামা ওঠার ব্যাপার নেই। কেউ বিরক্তও করবো না। নিচের আসনে, সারা কমপার্টমেন্টে যাই হোক না কেন, সবার মাথার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে ঘুমোতে সে দিব্যি চলে যাবে।

অরূপকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন তার বাবা, মা, আর ছোট বোন। গরমের ছুটি কাটিয়ে অরূপ চলেছে সাঁওতাল পরগনার আবাসিক বিদ্যালয়ে। স্বাস্থ্যকর জায়গা, নামকরা স্কুল। দুঃখের কিছু নয়। আনন্দেরই ব্যাপার। লেখাপড়া শেষ করে যখন বেরিয়ে আসবে তখন অরূপ হয়ে যাবে অরূপবাবু।

বাঙ্কে হোল্ডল খুলে বিছানা পাতা হয়ে গেছে। হুকে জলের বোতল ঝুলে গেছে। দরকারি কথা যা বলার সব বলা হয়ে গেছে। অরূপ ভোম হয়ে নিচের আসনেই বসে আছে। অরূপের বাবা, মা আর ছোট বোন সামনেই দাঁড়িয়ে। অন্যান্য যাত্রীদের কিছু এপাশে ওপাশে বসেছেন। কিছু প্ল্যাটফর্মে জানালার পাশ ঘেঁসে নিজেদের আসন আর মালপত্রের দিকে কড়া নজর রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ কেউ ভাঁড়ে চা খাচ্ছেন। গার্ড সাহেব বাঁশি বাজালেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠবেন।

কথা শেষ হচ্ছে না। মনে পড়লেই ছুটছাট বেরিয়ে আসছে। ছেলে আবার সেই পুজোর ছুটিতে ফিরবে। এর মাঝে এদিকে থেকেও কেউ যেতে পারবে না। ঘন ঘন গেলে স্কুল-কর্তৃপক্ষ বড় অসন্তুষ্ট হন। ছেলের মন চঞ্চল হয়ে যায়।

কে একজন বললেন, 'সিগন্যাল দিয়েছে। এবার গাড়ি ছাড়বে।'

যাঁরা বিদায় জানাবার জন্যে এসেছিলেন তাঁরা সব একে একে নামতে লাগলেন। অরূপের মায়ের চোখ ছল ছল করছে। বোনের মুখ কাঁদো কাঁদো। চেষ্টা করেও গলা দিয়ে আর কথা বেরোচ্ছে না। অরূপের বাবা ছেলেকে সাবধান করলেন, 'তোমার ঘুম কিন্তু সহজে ভাঙে না। একটু সজাগ থেকো। দেখো, ঠিক জায়গায় যেন ঘুম ভাঙে। কেমন?' অন্যান্য যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়লে একটু জাগিয়ে দেবেন অনুগ্রহ করে। যশিডিতে নামবে।'

পান চিবোতে চিবোতে একজন ভরসা দিলেন, 'কিচ্ছু ভাববেন না। মধুপুরেই ঠেলে তুলে দেবো।'

'গিয়ে চিঠি দিস।'-বলে, একে একে সবাই নেমে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়ালেন। যতক্ষণ চোখের দেখা দেখা যায় ছেলেটাকে। ঘ্যাড়াং করে একটা শব্দ হলো। ট্রেনে ইঞ্জিনের টান ধরেছে। শেষ বাঁশি বাজল ফুর্‌র্‌ করে। প্ল্যাটফর্ম ধীরে ধীরে উলটো দিকে সরছে। কেউ কেউ দৌড়ে শেষ কথা সারছেন। যাঁর সঙ্গে কথা তাঁর সঙ্গে বহুদিন হয়ত আর দেখা হবে না। কেউ খুব কায়দা করে রুমাল নাড়ছেন। ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে বাড়ছে। প্ল্যাটফর্ম আর কিছুতেই পাল্লা দিতে পারছে না। ক্রমশই পেছিয়ে পড়ছে।

যাক্, আলোটালো সব পেছনে পড়ে রইল। বিশাল অন্ধকারে সুড়ঙ্গ কেটে ট্রেন ছুটছে। সকলেই গোছগাছ করে বসেছেন। অনেকেই ছুটছেন ডোরাকাটা পাজামা আর চীনে কোটে নিয়ে বাথরুমের দিকে। রাতের পোশাক। এই ট্রেনেই কেউ থাকবেন একদিন, কেউ পাক্কা দু'দিন। ট্রেন সোজা চলে যাবে একেবারে হিমালয়ের কোলে।

অরূপের ও সব বায়নাক্কা নেই। হাফপ্যাণ্ট, হাফ-হাতা টি-শার্ট। মোজা, জুতো। জুতো জোড়া খুলে মাথার পাশে রেখে আর একটু রাত হলেই শুয়ে পড়বে। আর তারপর কি হবে সে জানে না। জানেন ওই ভদ্রলোক যিনি এখানো পান চিবোচ্ছেন, অরূপকে মধুপুরে তুলে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'কি নাম তোমার?'

'অরূপ।'

'বোর্ডিং-এ চললে?'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ ক্লাস?'

'এইট।'

'মন খারাপ হচ্ছে?'

'না, আমি তো সিক্স থেকে পড়ছি।'

অরূপ হাই তুলল। সন্ধ্যাবেলা মা পেট ঠেসে ভাল মন্দ খাইয়ে দিয়েছে। ট্রেনটাও তেমনি দুলছে। বাইরেটাও তেমনি অন্ধকার। চোখে কিছুই পড়ছে না। মাঝে মাঝে আলোর বিন্দু ছিটকে ছিটকে পেছনে পালাচ্ছে। আশে পাশে সমবয়সীও কেউ নেই। কোণের দিকে এক বৃদ্ধ বাতের ব্যাথায় মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছেন। সঙ্গের মহিলা একটা বালিশ নিয়ে কোমরের পেছনে নানা কায়দা করছেন, আর বলছেন, 'একটু সহ্য কর বাবা, দেরাদুনে সহস্রধারায় চান করলেই তোমার বাত সেরে যাবে।' বৃদ্ধ যন্ত্রণার গলায় বললেন, 'তার আগেই তো আমি শেষ হয়ে যাব!' ওপাশে চশমা চোখে, রাগী রাগী চেহারার, গোঁফওলা এক ভদ্রলোক বললেন, 'অত কাতর হলে চলে বাবা! শেওড়াফুলিতে দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে দেবো, চন্দননগরেই ফ্ল্যাট হয়ে যাবেন। আপনি না এক সময়ে বারবেল ভাঁজতেন!' বৃদ্ধ করুণ সুরে বললেন, 'সে তো নাইনটিন থার্টি ফোরে, তখন বাঙালী বুকে হাতি তুলত।' ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'আবার আসবে সেদিন, ভয় নেই।' ট্রেন একটা মোক্ষম ঝাঁকুনি দিল। বৃদ্ধ, 'উরে বাবারে' বলে ককিয়ে উঠলেন, তারপর বললেন, 'আর এসেছে সেদিন!'

অরূপের আবার হাই উঠল। পান-চিবোনো ভদ্রলোক সুটকেস থেকে এখটা চাদর বের করতে করতে বললেন, 'শুধু শুধু কষ্ট করছ কেন? যাও টঙে উঠে শুয়ে পড়। বিছানা তো করাই আছে। ঠেসে জল খাও। শেষ রাতে বাথরুমের টানেই তোমার ঘুম ভেঙে যাবে। আমার উপর বিশেষ ভরসা রেখ না। তোমার বাবাকে তখন বললুম বটে, তবে আমিও ভীষণ ঘুমকাতুরে। শুলেই মরে যাই।

বৃদ্ধ বললেন, 'কোথায় নামবে খোকা?'

অরূপ বললে 'যশিডিতে।'

'আমি আবার এ লাইনের কিছু চিনি না। তুমি বলে দিও, আমি ডেকে দেবো।'

মহিলা বললেন, 'বাবা, ও যদি ডাকতেই পারবে তাহলে আর নামতে কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেও তো ঠিক কথা। তাহলে তোরাই বাপু একটু ডেকে দিস।'

'নামার সময়টা যে বড় বেয়াড়া। একেবারে শেষ রাত। ওই সময়টাই তো ঘুমের।'

'তাহলে তুমি দুর্গা বলে শুয়ে পড়। মা তোমাকে ঠিক তুলে দেবেন। ঈশ্বরে ভক্তি রাখ। সর্ববিঘ্ন বিনাশনং।'

মাথার পাশে জুতো রেখে অরূপ দুর্গা বলে শুয়ে পড়ল। আর তো কিছু করার নেই। সবাই বিদেশে চলেছে সংসার নিয়ে, অসুখ নিয়ে। যে যার নিজেদের কথায় ব্যস্ত। তার সঙ্গে কে আর সারারাত বকর বকর করবে। ট্রেন চলেছে দুলে দুলে। যা কিছু বকাঝকা সবই হচ্ছে লাইনে, চাকায়, ইঞ্জিনে। ট্রেন চলেছে, ঘুম চলেছে। গভীর থেকে গভীরে। অরূপ প্রথমে যখন জুতো খুলে শুয়েছিল তখন মনে ছিল চলমান ট্রেনের বাঙ্কে ট্রেনের বাঙ্কে শুয়ে আছে। তারপর আর কিছু মনে রইল না। এক সময় মনে হলো, বালীগঞ্জের বাড়িতে দোতলার দক্ষিণের ঘরে নরম বিছানায় শুয়ে আছে।

এদিকে ট্রেন চলে চলে ভোরের দিকে যশিডি স্টেশানে এসে থেমেছে। দূরে ইঞ্জিন হাঁসফাঁস করছে। চা-গরম হাঁকছে ভেণ্ডাররা। স্টেশানের কোলেই একটা পাহাড় জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে। চূড়োর দিকে আলোর ছোঁয়া লেগেছে। খেজুর গাছের পাতা ঝিরিঝিরি দুলে অন্ধকার ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। স্টেশান মাস্টারের ঘরে এখনো রাত। চড়া চড়া আলো জ্বলছে। প্যাল্টফর্মের বেঞ্চিতে চাদরমুড়ি দিয়ে মানুষ ঘমোচ্ছে। পাণ্ডারা হাঁকছে,-বৈদ্যনাথ ধাম, পাণ্ডা চাই

গার্ড সাহেবের বাঁশি বাজল। ট্রেন দুলে উঠল। মালকোঁচা মেরে ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা দু'জন মানুষ উদ্গ্রীব হয়ে প্ল্যাটফর্মে যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। একের পর এক কামরা যাই যাই বলে পাহাড়ের কোলে অদৃশ্য হয়ে গেল। এঁরা এসেছিলেন অরূপকে নিয়ে যেতে। বাইরে টাঙ্গা অপেক্ষা করছে। কোথায় অরূপ! সে তখন গভীর নিদ্রায়। যাঁরা তাকে তুলে দেবার ভার নিয়েছিলেন তাঁদেরও একই অবস্থা। বাতের ব্যথায় বৃদ্ধ ঘুমের ওষুধে অচৈতন্য। সেই পান-খাওয়া দাদা উলটো দিকের দ্বিতীয় বাঙ্কে হাঁ করে ঘুমোচ্ছেন। ট্রেন ছুটেছে ঝাঁঝার দিকে।

রোদ চড়ছে। বিহারী গরমের হলকায় কামরায় খুরখুরে পাখার বাতাস যেন আগুনের নিঃশ্বাস। চারপাশের গোলমাল ক্রমশই বাড়ছে। লোকজনের ওঠা-নামা। এক সময় অরূপের ঘুম ভাঙল। ঘোর কাটতেই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। এখম তো ভোর নয়। চারপাশে ক্যাটকেটে রোদ। বাঙ্ক থেকে মুখ ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যশিডি কি এসেছে দাদা?'

'অ্যাঁ, যশিডি?' সকলেরই এক প্রশ্ন। 'আরে, সে কি, তুমি এখনও নামো নি? সে তো অনেকক্ষণ চলে গেছে, হে। পরের স্টেশান পাটনা।'

অরূপ হুড়মুড় করে নিচে নেমে এল। বাথরুম থেকে দাড়িটাড়ি কামিয়ে চান করে ফ্রেশ হয়ে এলেন সেই পান-চিবানো দাদা। এক হাতে ভিজে তোয়ালে, অন্য হাতে সাবানের কেস। অরূপকে দেখেই আধ হাত জিভ বের করে বললেন, 'আরে ছি ছি! ভীষন ভুল হয়ে গেছে। তোমারও দোষ আছে বাপু। আমার মতো করতে পার না? আমি এমন জায়গায় কখনই যাবার চেষ্টা করি না যেখানে ভোরবেলা নামতে হয়। গেলেও, এগিয়ে গিয়ে পেছিয়ে আসি। তুমিও তাই কর। পাটনায় নেমে ট্রেন ধরে যশিডি চলে যাও। এসো তোমাকে সাহায্য করি। আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে তো!'

ভদ্রলোক ডিঙি মেরে হোল্ডল গোটাতে লাগলেন। যেন কত বড়ই কাজ করছেন। অরূপ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ভীষণ ভয় করছে। টেলিগ্রাম করা ছিল। স্টেশানে যাঁরা নিতে এসেছিলেন, তাঁরা বোর্ডিং-এ ফিরে গিয়ে এখুনি কলকাতায় ফিরতি টেলিগ্রাম করবেন, ছেলে আসে নি, তারপর কি হবে! যশিডিতে নেমে সে কিভাবে একা একা বৈদ্যনাথধাম যাবে। যত রকমের ভয় ছিল সব একসঙ্গে এসে তার মনের ওপর চেপে বসল। আর ট্রেনও ধীরে ধীরে পাটনা স্টেশানে ঢুকে পড়ল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতক্ষণে একটি মাত্র কথা বললেন, 'ছি ছি, তোমাদের এতটুকু দায়িত্ববোধ নেই!'

পান-চিবোনো ভদ্রলোক খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'থামুন মশাই। বাপ-মায়েরই যেখানে দায়িত্ব নেই, সেখানে দায়িত্ব থাকবে রাস্তার লোকের? কি করে আশা করেন! আমার ঘুম ভাঙলে নিশ্চয়ই নামিয়ে দিতুম। সূর্য মাথার ওপর এসে গেলেই আমি ফিট। এখন আমি এই হোল্ডল ঘাড়ে করে, এর হাত ধরে পাটনা স্টেশানে কেমন নামিয়ে দি দেখুন। এটা দায়িত্ব নয়?'

অরূপের হাত ধরে বললেন, 'এসো এসো। এখুনি ট্রেন আবার ছেড়ে দেবে।'

প্ল্যাটফর্মে নেমে হোল্ডলটা দুম করে পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ঈস্, ফর্সা গেঞ্জিটা গেল! যাকগে। পরোপকার করতে গিয়ে কত লোক জীবনদান করে ইতিহাস হয়ে আছে। আচ্ছা, ওই হল স্টেশান মাস্টারের ঘর। সোজা গিয়ে বল-ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ছাত্র, আমি এখন যশিডি যাব, ব্যবস্থা করে দিন। আরে ম্যান, ঘাবড়ে গেলে চলে! জীবনে কত বড় বড় বিপদ আসতে পারে জান? সব সময় মনে রাখবে, একলা চল রে।'

প্ল্যাটফর্মে অরূপকে একলা ফেলে ভদ্রলোক চলে গেলেন। বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন দুলে উঠল। অরূপ হোল্ডলের ওপর বসে পড়ল। তার এখন কাঁদতে ইচ্ছে করছে। খিদে পেয়েছে। জলতেষ্টা। জলের বোতলটা ট্রেনেই ঝুলছে। ট্রেনটা চলে যাবার পর প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। মনটা যেন কেমন করছে। অথই জলে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। একজনও নেই যার সঙ্গে বাংলায় কথা বলা যায়। চারপাশে সব হিন্দি। অরূপের চোখে জল এসে গেছে।

বসে থাকলে তো চলবে না। খোঁজখবর নিতে হবে। পাটনা স্টেশানটা তার ঘরবাড়ি হতে পারে না। উঠতে হবে, জানতে হবে, যেতে হবে। তাদের বিদ্যাভবনেই তো প্রার্থনা হয়-উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত। বেডিংটা তেমন ভারি নয়, সহজেই মাথায় তোলা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, বাবুগিরি না ছাড়লে বাঙালী মানুষ হবে না। অরূপ বেডিংটা কাঁধে তুলে নিয়ে, স্টেশান মাস্টারের ঘর লক্ষ্য কর্ এগোল। এগোতে এগোতে মনে হলো তিনি কি করবেন? টিকিট কেটে ডাউন ট্রেনে উঠতে হবে। প্রথমে ট্রেনের সময় জানতে হবে। সে তো যে কেউ বলতে পারে। লেখাও থাকে কালো বোর্ডে সাদা হরফে।

এইবার একটু একটু সাহস আসছে মন। শ্রীঅরবিন্দ সাত বছর বয়েসে বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে একা থেকেছিলেন, লেখাপড়া করেছিলেন। তবে? তবে সে কেন পাটনা থেকে যশিডি যেতে পারবে না? দু'চারবার ধাক্কা খেয়েই অরূপ জেনে গেল সন্ধের আগে কোনও ট্রেন নেই। ভালই হয়েছে, বিপদ যখন এসেছে ভালভাবেই আসুক। যে ছেলে সময়ে ঘুম থেকে উঠতে পারে না, তার পাটনাতেই পরে থাকা উচিত।

একটা ঘরের বাইরে লেখা আছে, লেফট লাগেজ। অরূপের চেনা শব্দ। এখানে কিছুক্ষণের জন্যে মালপত্র রাখা যায়। বেডিংটাকে লেফট লাগেজে ফেলে, অরূপ বেশ ঝাড়া হাত পা হলো। এখন চান করা যায়, খাওয়া যায়। ইচ্ছে করলে শহরটাকেও দেখে আসা যায়। এখনো অনেক সময় আছে।

বেলা চারটে নাগাদ অরূপের মনে হলো যথেষ্ট ঘোরাঘুরি হয়েছে, এবার একটু বসা যেতে পারে। অচেনা স্টেশানের সবটাই চেনা হয়ে গেছে। কোনটা ডাউন প্ল্যাটফর্ম, কোনটা আপ। কোনটা তারঘর। বেশ লাগছে কিন্তু। এদিক থেকে ওদিক থেকে ট্রেন কত দিকে চলে যাচ্ছে। তার জলের বোতলটা এতক্ষণে কত দূরে চলে গেছে।

সন্ধের আগেই সে একটা টিকিট কেটে ফেলল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন এসে পড়বে। এখন কলকাতার বাড়িতে কী হচ্ছে, কে জানে? বাবা অফিসে! অঞ্জুর গানের মাস্টারমশাই এসেছেন। মা এখন ছাদে। সে এখন কত দূরে!

প্ল্যাটফর্ম চঞ্চল হয়ে উঠল। কলকাতার ট্রেন আসছে। ঠ্যাং ঠ্যাং করে লোহার ঘণ্টা বাজছে। অরূপ কাঁধে বিছানা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তারই মতো একটি সাঁওতাল ছেলে, কাঁধে লাঠি। লাঠির ডগায় পুঁটলি বাঁধা। খুব ভাব করতে ইচ্ছে করছে।

ট্রেন এসে গেছে। কত দূর থেকে আসছে, ইঞ্জিনের হাঁপ ধরেছে। অরূপ যে কামড়ায় উঠল ছেলেটিও সেই কামড়ায় উঠল। তেমন ভিড় নেই। বসার জায়গা আছে। কম্বলের আসনে একজন সাধু বসে আছেন। বড় বড় চুল, দাড়ি। লাল জবাফুলের মতো বড় বড় চোখ। অরূপ একপাশে বসে পড়ল। সাঁওতাল ছেলেটি উলটো দিকে বসেছে। শিশু কৃষ্ণের মতো দেখতে। পুঁটলি থেকে একটা পেয়ারা বের করে খাচ্ছে। এক কামড় দিয়েই অরূপের দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর আর একটা পেয়ারা বের করে হাসি হাসি মুখে তার সামনে এগিয়ে ধরল। বেশ ভাব হয়ে গেল দু'জনে। অরূপ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাবে ভাই?'

ছেলেটি বললে, 'মোগলসরাই।'

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ?'

'আমি যশিডি যাব।'

সাধু এতক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন। দু'জনের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'মায়া,মায়া। একই ট্রেনের দুটো আসন দুটো দিকে ছুটেছে। একটা ওপর দিকে, একটা নিচের দিকে। মায়া, মায়া।'

অরূপ প্রথমটা কিছু বুঝতে পারল না। এতে মায়ার কি আছে? দু'জন দু'জায়গায় তো যেতেই পারে। সকলকেই যে একই জায়গায় যেতে হবে তার কি মানে আছে! পরেই খেয়াল হলো, সত্যিই তো? মোগলসরাই তো পাটনার মাথার ওপরে। যশিডি তো নিচের দিকে। তা হলে? অরূপ সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল, 'এ ট্রেন কোথায় যাবে, ঠিক, ঠিক?'

'যদি উলটে না যায় তা হলে মোগলসরাই।'

'আমি তা হলে ভুল ট্রেনে চেপে বসেছি।'

'লেড়কা, মানুষের জীবনই তো ভুলে ভরা। উসমে কেয়া হ্যায়!'

'আমি যে যশিডি যাব?'

'যাবে, আজ না যেতে পার, কাল পারবে, কাল না পারলে পরশু পারবে। শুধু লক্ষ্যটা ঠিক রাখ। ভুল হোক। একশোবার হোক। হাজারবার হোক। কিন্তু লক্ষ্য যেন হারিয়ে না যায়। মা ভৈঃ।'

ঘ্যাচাঘ্যাম ঘ্যাচাঘ্যাম ট্রেন ছুটছে। সাঁওতাল ছেলেটির মাথা ঘুমে ঢুলছে।

আর অরূপ! এখন আর তার ঘুম আসছে না।

নবেন্দু

নবেন্দু এতক্ষণ কোমরে হাত রেখে গম্ভীর চালে আমাদের কাজকর্ম সুপারভাইজ করছিল। হোল্ডলের বেল্টটা নিচু হয়ে দুবার টেনে দেখে বললে, 'আর একটু টান হবে, আরো দুঘর যাবে।' পরেশ বললে, 'নে নে, ওই যা হয়েছে যথেষ্ট। এটা তো একটা গন্ধমাদন হয়েছে রে! কী নেই এর ভেতর! পুরো একটা রাজত্ব।'

নবেন্দু পরেশের কথায় কানই দিল না। নিজের মনে গজগজ করতে লাগল, যত সব অপদার্থ, একটা বেডিং পর্যন্ত বাঁধতে পারে নৈ, বাইরে বেড়াতে যাবার শখ! আয় তো অপূর্ব! এতক্ষণের পরিশ্রমে পরেশের কপাল ঘেমে গেছে! হাতের তালুর উল্টো পিঠে খাম মুছতে মুছতে বলল, তুই যদি আর একটা ঘর কামাতে পারিস, আমি এইখানে একহাত নাক-খত দেবো।

অপূর্ব ঘরের কোণে ফার্স্ট-এড বক্স সাজাচ্ছিল, নবেন্দুর ডাকে উঠে এল। পরেশ একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'দুই পালোয়ানের কেরামতিটা একবার দেখা যাক।' নবেন্দু পরেশের একবার বাঁকা চোখে তাকাল, কোনো কথা বলল না। নবেন্দুর স্বভাবে কথা কম, কাজ বেশি। সোজা কথা, স্পষ্ট সোজাভাবে বলে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তার চরিত্রে লেখা নেই। রাগে কম। যখন রাগে তখন রক্ষে নেই, তখন হাতটাই বেশি চলে।

পরেশের চ্যালেঞ্জ তার টকটকে ফর্সা মুখটা একটু লাল হল, জলজ্বলে বড়বড় চোখে একটু আগুন জ্বলল। নবেন্দু হোল্ডলটা খুলে ফেলল। আমাদের পাঁচজনের বিছানা, পাঁচটা পাতলা তোশক, যতই পাতলা হোক একসঙ্গে বেশ পুরু হয়েছে, তার সঙ্গে হাওয়া দিয়ে ফোলানো যায় এমন পাঁচটা রবারের চোপসানো বালিশ, দুফেটি মোটা দড়ি, দুটো খেঁটে লাঠি, দুটো রেনকোট, পাঁচ জোড়া গ্লাভস, পাঁচটা চাদর, পাঁচখানা মশারি, একটা শিল-নোড়া, সব একসঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে এল।

পরেশ এতগুলো জিনিস একসঙ্গে ঠিক ম্যানেজ করতে পারেনি, কোন করমে জড়িয়ে-মড়িয়ে, যা হোক করে বেঁধেছিল। নবেন্দু সেই ছত্রাকার রণাঙ্গনে দু'মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে রইল। আর ঠিক সেই সময়ে আলুথালু অবস্থায় ঘরে এসে ঢুকল অপর্ণা, নবেন্দুর ছোট বোন, হাতের ট্রেতে পাঁচটা বিশাল বাটিতে ফুলকো করে চিঁড়ে ভাজার সঙ্গে চীনে বাদাম আর কুঁচো পাঁপরের মিশেল।

অপর্ণাও দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘরে অজস্র ছড়ানো জিনিসের মধ্যে পাঁচটি অসহায় প্রাণী হাবুডুবু খাচ্ছে। সাবধানে ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়ে অপর্ণা বললে, 'যাচ্ছিস তো মধুপুর, দেখে মনে হচ্ছে এভারেস্ট জয় করতে যাচ্ছিস। এখন দয়া করে খেয়ে উদ্ধার কর।'

দুপুর থেকে কসরত চলছে। সন্ধে প্রায় গড়িয়ে এল। খিদেও পেয়েছিল। পাঁচটি প্রাণী লাফিয়ে উঠে হাত বাড়ালো। আমাদের মধ্যে প্রাণেশটা চিরকালই একটু উটমুখো। একদিকে পা ফেলতে আর এক দিকে ফেলে। প্রাণেশের পা লেগে হ্যারিকেনটা ফুটবলের মত ছিটকে অপর্ণার পায়ের কাছে পড়ে চিমনিটা ফুটিফাটা হয়ে গেল।

প্রাণেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে করুণ গলায় বললে, 'দেখতে পাইনি রে।' পরেশ বললে, 'ছোটোখাটো জিনিস কোনো কালেই তো তোমার চোখে পড়ে না। হাতি ছাড়া তুমি কিছুই দেখতে পাও না। বিশেষ করে খাবার গন্ধ পেলে তোমার একটা ইন্দ্রিরই এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, অন্যগুলোর ফাংশান স্টপ হয়ে যায়।'

প্রাণেশের অপ্রস্তুত ভাবটা অপর্ণাই কাটিয়ে দিল। 'ওর কি দোষ! সারা ঘরে পা ফেলার এক ইঞ্চিও জায়গা নেই, মানুষ যায় কোথা দিয়ে?' প্রাণেশ যেন একটু বল ফিরে পেল, 'দেখ না, বেলা একটা থেকে এই চলছে।'নবেন্দু আবার হোল্ডলটা নতুন করে খুলে ফেলল। বাটিগুলো এতক্ষণে আমাদের হাতে এসে গেছে। তোফা মুচমুচে চিঁড়ে ভাজা, অল্প আদা পেঁয়াজের কুঁচি মেশানো। আর একটু রাত গড়ালেই আর একটা জিনিস আসবে। মাঝারি সাইজের পোর্সিলেনের বাটিতে ঠাণ্ডা জমাট ক্ষীর মৃদু গোলাপের গন্ধযুক্ত। নবেন্দুরদের বাড়িতে পাঁচ পাঁচটা জার্সি গরু, অঢেল দুধ, ঘি, ছানা, ননী, ক্ষীর। নবেন্দুর ঠাকুমা মাঝে মাঝে আমাদের রসিকতা করে বলেন, আমার গোয়ালে পাঁচটা চারপেয়ে আর ঘরে পাঁচটা দু'পেয়ে।

নবেন্দুর বোধ হয় ঝাল লেগেছিল, খাড়া ধারালো নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অপর্ণা বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'সবই তো নিয়েছিস, কিছুই বাকি নেই, কেবল একটা তোলা উনুন হলেই হয়। বলিস তো ঠাকুমার উনুনটা এনে দি, হোল্ডলে ঢুকিয়ে নে।'

নবেন্দুর মুখে তখন একমুখ চিঁড়ে। ভরা মুখে সে ধমক উঠল, 'যা যা, তোকে আর বেশি পাকামো করতে হবে না।' অপর্ণা কথাটা শুনেও শুনল না, বরং আর একটা টিপ্পুনি দূ থেকে ছুঁড়ে দিল, 'তোরা তো আবার দুধের বাছা, একটা গরুও তাহলে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যা, সন্ধেবেলা সকলে মিলে দুধ খাবি।'

বেশ তারিয়ে তারিয়ে আমরা মুচমুচে চিঁড়ে ভাজা খেয়ে, জামার আস্তিনে মুখ মুছে আবার বাঁধা-ছাঁদায় লেগে গেলুম। নবেন্দু সত্যিই অসাধারণ। হোল্ডলটাকে অপূর্বর সাহায্য সে ঠিক কায়দা করে ফেলল। স্ট্র্যাপটাকে সে শুধু এক ঘর সরালো না, চার চারটে ঘর সহজেই কমিয়ে দিয়ে বেশ টাইট করে ফেলল গম্ভীর গলায় পরেশকে বলল, 'সব কিছুই একটু যত্ন করে করতে হয় বুঝলি পরেশ, বেগার ঠেলায় কিছু হয় না।'

পরেশকে একটু যেন ম্লান দেখাল। আমাদরে দলে পরেশটা চিরকালই একটু ফাঁকিবাজ। আমাদের ক্লাবের কি একটা ফাংশানে একবার একটা বাঁশের দরকার হয়েছিল। কোথায় পাওয়া যায়! গ্রামের শেষ সীমায় দত্তদের একটা বাঁশঝাড় ছিল। দলবল চলল বাঁশ কাটতে, পরেশও সেই দলে। নবেন্দুই বাঁশ পাতার খোঁচা উপেক্ষা করে কয়েকটা বাঁশ ঝাড় থেকে কেটে নামাল। এইবার নিয়ে যাবার পালা। বাঁশের লিকলিকে ডগার দিকটায় পরেশ। মাঝে আমি। গোড়ার দিকে কখন নবেন্দু, কখন অপূর্ব। মাইল তিনেক হাঁটাপথে পরেশ বাঁশের পুরো ভারটা আমার কাঁধে ছেড়ে দিয়ে ডগার দিকে কাঁধ ঠেকালো কি ঠেকালো না, গান গাইতে গাইতে সারাটা পথ এল। এই হল পরেশ-তবুও পরেশ আমাদের প্রিয় বন্ধু।

নবেন্দু বললে, 'ফ্রেণ্ডস, আমাদের কাজ আপাতত শেষ। সবই প্রায় গোছানো হয়ে গেছে। নাউ ডিসপার্স। এখন স্নান, এখন বিশ্রাম। কাল সকালে স্টার্ট। আমরা ঠিক আটটার সময় বেরোবো। মনে থাকে যেন।'

অপূর্ব বললে, 'চল-না নবেন্দু আমরা সবাই মিলে এই সন্ধের অন্ধকারে দল বেঁধে স্নান করে আসি।' নবেন্দু ঠোঁটে আঙুল রেখে কিছুক্ষণ ভাবল; তারপর বলল, 'নট এ ব্যাড আইডিয়া। চলো তাহলে।' দলপতির নির্দেশ পেলে আমরা সব সময় রেডি। এ-যেন এক ক্ষুদে সামরিক দল।

কোমরে গামছা বেঁধে আমরা সারি সারি বেরোচ্ছি, ঠাকুমা তখন চওড়া লাল রকে বসে মালা ঘোরাচ্ছিলেন। তুলসীতলায় সবে প্রদীপ দেখানো হয়েছে। মালা ঘোরানোর ফাঁকেই আমাদের হেঁকে বললেন-এই ছেলের দল, একটু পরেই সব আসবি, তোদের কিলোবো। ঠাকুমার কিলোনো আমাদের জানা আছে, পেটে খেলে পিঠে সয়। অপর্ণাই বোধহয় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়েছিল, গোয়ালের দিক থেকে ধোঁয়া ওঠা একটা ধুনোচি আনতে আনতে বলল, 'সন্ধেবেলা গঙ্গায় চান করতে যাচ্ছ যাও, আমি কিন্তু মাকে বলে দেবো, তারপর বুঝবে ঠেলা।'

নবেন্দু বললে, 'তোকে আর বেশী পাকামো করতে হবে না, অয়েল ইওর ওন মেশিন।'-'ঠিক আছে তোমাদের মেশিনে মা-ই অয়েল দিয়ে দেবেন।' অপর্ণা ঘরে ঘরে ধুনো দিতে চলে গেল। আমাদের সকলের নাকেই মিষ্টি চন্দনের গন্ধ এসে লাগল। সামনেই পশ্চিমের আকাশে তখন সন্ধ্যার সেই অনেক দিনের বড় তারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। উঠোনের একপাশে জুঁই ফুলের গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেছে, যেন অসংখ্য মায়ের মুখের ছোট ছোট নাকছাবি।

বাড়ি থেকে দু'কদম হাঁটলেই প্রাচীন কালের গঙ্গার ঘাট, রাধা-গোবিন্দের মন্দির, শিব মন্দির। রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি শুরু হয়েছে। ঘণ্টা বাজছে। মৃদু মিষ্টি একটানা আওয়াজ। গঙ্গা একেবারে কূলে কূলে ভরা। ঘাটের কিনারায় জল ছলকে লাগার আওয়াজ উঠছে। ওপারে জুটমিলের সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে। ঘাটের খুব কাছ দিয়ে ধীরে ধীরে একটা নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে। উদাস মাঝি হালে বসে আছে। পশ্চিমের আকাশের গায়ে যেন কালো রঙে আঁকা একটা ছবি।

নবেন্দু আমাদের সতর্ক করে দিল, 'একদম নিঃশব্দে স্নান সেরে নাও। একদম ঝাঁপাই জুড়বেন না।' নিস্তব্ধ এই সন্ধ্যায় প্রকৃতি যেন ধ্যানে বসতে চলেছে। কোনো রকম শব্দ করে তা ধ্যান ভঙ্গ করা চলবে না। যেমন নির্দেশ, শীতল কালো জলে ডুব দিয়ে আমাদের

শরীর জুড়িয়ে গেল। জলে ডুব দিয়েও আমরা যেন কতদূর থেকে ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলুম। জল ছলকে ছলকে যেন রাতের প্রার্থনার মত কী এক সঙ্গীতে মত্ত!

নবন্দুদের বাড়িতে অনেক দিন ধরে একটি প্রথা চলে আসছে-সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা। হলঘরে সাবেক আমলের একটা অর্গান আছে! নবেন্দুর মা খুব সুন্দর অর্গান বাজাতে পারেন। আমরা যখন গঙ্গা থেকে চান সেরে বাগানের পথে ফিরছি তখনই কানে এল অর্গানের মিষ্টি সুর। নবেন্দু বললে, 'পা চালিয়ে চল, প্রেয়ার শুরু হয়ে গেছে।'

বিশাল হলঘর। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা। দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং, বাঘের মাথা, হরিণের ফ্যাঁকড়া শিং। নবেন্দুর ঠাকুরদা হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তাঁর আমলে বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তি এই হল ঘরে আসর জমাতে আসতেন শুনেছি। ঘরের একটা কোণে লাইব্রেরী, বড় বড় বই-ঠাসা আলমারি। নবেন্দুর ঠাকুরদা আবার একজন বড় শিকারী ছিলেন। দেয়ালে তাঁর একটা বড় অয়েলপেন্টিং ঝুলছে। ছবিটা এতই জীবন্ত, মনে হবে ছবি ছেড়ে সুদীর্ঘ পুরুষটি বুঝি এখনই কার্পেটের উপর নেমে এসে আমাদের মাঝে বসবেন।

প্রার্থনার সময় ঘরের সমস্ত চড়া আলো নিবিয়ে দিয়ে একধরনের ঘষা কাঁচের ডুমে ঢাকা আলো জেলে দেওয়া হয়। সারা ঘরে একটা পাথুরে আলো ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয়, মার্বেল পাথরের ঘরে একদল মার্বেল পাথরের মূর্তি স্থির হয়ে বসে আছে, আর উদাও গানের সুর ধূপের ধোঁয়ার মত পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নবেন্দুর মা অর্গান বাজিয়ে তখন গাইছিলেন 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে'; আমরাও সকলে গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু ককরলাম। নবেন্দুর গলা মিষ্টি তেমনি চড়া। পরেশের গলা একটু ভাঙা ভাঙা। চড়ার দিকে সে আর সাহস করে গাইছিল না। অপূর্বর গলাও বেশ ভাল। পরের গান 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন'।

প্রার্থনা শেষ হবার পর আমরা সকলে একতলার ছাদে এসে মাদুর পেতে বসলাম। আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। ভিজে ভিজে হাওয়া বইছে। ছাদেও একটা সুন্দর বাগান। লতানে অপরাজিতা একটা মাচার উপর ডালপালা মেলে হাওয়ায় দুলছে। তলায় চাঁদের আলোর ছায়া কাঁপছে।

কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। সকলকেই যেন প্রকৃতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। এমনকি অপর্ণা যখন আমাদের জন্যে ঠাকুরমার 'কিল' নিয়ে এল, তার কথায়ও কোনো চপলতা নেই। চকচকে ট্রেটা আমাদের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে শান্ত পায়ে চলে গেল। আমরা সকলে ঝুঁকে পড়লাম। কুলফি মালাই। গায়ে পেস্তার ছিটে। ভুরভুরে গোলাপের গন্ধ। খাঁটি দুধের ক্ষীর দিয়ে তৈরি। এক একটা টুকরো জিভের উত্তাপে গলে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। পরেশ শুধু বললে, 'এমন জিনিস আগে কখনও খাইনি'। অপূর্বর শুধু একটিই কথা, 'কী অপূর্ব'!

সকাল বেলা আকাশটা আবার একটু মেঘলা মেঘলা করছে। বৃষ্টি হবে নাকি! হলেও কিছু করার নেই। ঠিক দশটার মধ্যে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে হবে। সাড়ে দশটায় ট্রেন। দশ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে। অবশ্য ভাবনার কিছু নেই, নবেন্দুদের গাড়িতে যাওয়া হবে।

মাকে বলাই ছিল। ভোর-ভোর উঠে সব কাজ সেরে নিতে হবে। খাওয়া নবেন্দুদের বাড়িতে। আমরা সকলে একসঙ্গে খেয়ে দেয়ে টুক্ করে গাড়িতে উঠে বসব। কি মজা! মেঘলা আকাশ হলেও যাবার আনন্দে মন নেচে উঠল। নবেন্দুর নির্দেশ, আমরা সকলেই স্কাউটের পোশাক পরে যাবো। স্নান করে, বাবার ছবিতে প্রণাম করে, মাকে প্রণাম করে দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়লুম। বেরোবার মুখে আমাদের কুকুর ভুলো বসেছিল। আমাকে দেখে ল্যাজ নেড়ে একটু রসিকতা করল। ভুলোটা ওই রকমই। ঠিক যেন মানুষের মত। চোখের দিকে তাকালে মনে হয় হাসছে। সব জানে, সব বোঝে, কেবল কথাটাই যা বলতে পারে না। ভুলো আবার অঙ্কও জানে।

একদিন দুপুরে ঘরে বসে অঙ্ক করছি। ভুলো থাবার উপর মুখ রেখে বসে আছে সামনে, যেন কিছুই জানে না। সরল করাটা চিরকালই আমার একটু কেমন হয়ে যেত। হয় শূন্য কিম্বা এক উত্তর হবে, আমি যত সাবধানেই করি না কেন, শেষকালে পূর্ণ-ফুর্ণ দিয়ে একটা বিদ্ঘুটে উত্তর হয়ে যেত। নিয়মটা জানাই ছিল-BODMAS, অর্থাৎ আগে ব্রাকেট, তারপর অফ, তারপর ডিভিসান, মাল্টিপ্লিকেশন, এ্যাডিসান, সাবট্র্যাকসান। সেদিনও সেই ভাবে করছিলাম, তবে অজস্র অঙ্কের ভিড়ের মধ্যে কিভাবে ভাগের আগেই

গুণ করতে শুরু করেছিলাম, ভুলো অমনি ঘ্যাঁক করে হাতটা কামড়ে ধরল। অঙ্কটা ভুল হতে হতে বেঁচে গেল। উত্তর হল শূন্য।

ভুলোটা আবার শয়তানও ছিল। একদিনও পড়ার বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে গল্পের বই পড়ছিলুম। ভুলো চুপি চুপি মাকে ডেকে এনে ধরিয়ে দিল। বই গেল। প্রহারও হল। সাতদিন ভুলোর সঙ্গে রেগে কথা বললুম না। তারপর ভুলো একদিন নিজে এসেই ভাব করল। সামনে এসে চুপ করে বসল, তারপর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কেউ কাঁদলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। ভুলোর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। নিজে হাতে গোটা দুই বিস্কুট খাইয়ে দিলুম।

নবেন্দুর বাড়িতে যখন পৌঁছলুম তখন নটা বেজে পাঁচ। সকলেই এসে গেছে। খাবার টেবিলে প্লেট পড়েছে। নবেন্দু বললে, 'বসে পড়, বসে পড়, আর দেরি নয়'। অপর্ণা জল দিচ্ছিল, বললে, 'যতটা পারিস একসঙ্গে খেয়ে নে! কতদিন যে খাওয়া জুটবে না। এক মাসের খাওয়া একসঙ্গে খেয়ে নিতে পারবি দাদা!' পেটুক পরেশ যেন একটু ঘাবড়ে গেল। মুখটা করুণ-করুণ করে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে নবেন্দু, না খেয়ে মরতে হবে নাকি! মধুপুরে দোকানপাট নেই! সবটাই কি গভীর জঙ্গল!' নবেন্দু কিছু বলার আগে অপর্ণাই বলল, 'তোমাদের খাবার জন্যে অনেকে আছে, তোমাদের খাবার কিছু মিলবে মনে হয় না। এক ওয়াগন শুকনো চিঁড়ে আর ভেলি গুড় নিলে তবু প্রাণটা বাঁচত।' অপর্ণা মার ডাকে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরেশের আবার প্রশ্ন, 'আমাদের কে খাবে রে নবেন্দু?' পরেশটা জীবনে গ্রামের বাইরে পা দেননি। তার ধারণা, খুব বড় বড় শহর ছাড় ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গাই গভীর অরণ্যের ছায়ায় ঘুমোচ্ছে। সেখানে বাঘ ভাল্লুক কুমীর বড় বড় ময়াল সাপ তার জন্যে ওঁত পেতে বসে আছে। ভাঙা মন্দিরে মাঝ রাতে টিমটিমে আলোর সামনে কাপালিকরা রোজই নরবলি দিচ্ছে। অপূর্বই পরেশের প্রশ্নের উত্তর দিলে, 'কে আবার খাবে! গোটা কতক বড় বড় কেঁদো বাঘ আছে তাদেরকেই একটু সামলে চলতে হবে। তোর মতই খাইয়ে সব। কোনো কিছু বাছবিচার করে খেতে শেখেনি। গরু-ছাগলের অভাব হলে টপাটপ মানুষ খেয়ে জলযোগ করে, আর কি!' পরেশ দেখলুম বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'মার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই ভাই। আমি না হয় নাই গেলুম।' নবেন্দু এতক্ষণ ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে এক ধমক লাগলা, 'ইডিয়েট, তোর লজ্জা করে না? তুই না পুরুষ মানুষ। মধুপুর কোথায় জানিস?' পরেশ ঘাড় নাড়ল, জানে না। নবেন্দু নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'তা জানবে কেন? ভূগোলে তো ওই জন্যেই চিরকাল গোল্লা পাও'। আমি একটু উসকে দিলুম, 'মধুপুর হল উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে একটা গভীর বন। সেখানে দিনের বেলা হ্যারিকেন জ্বেলে গাছের ডাল কেটে কেটে পথ করে এগিয়ে যেতে হয়। গাছের ডালে ডালে অসংখ্য রক্তচোষা বাদুড় মাথা ঝুলিয়ে দোল খায়। মানুষ দেখলেই ঝপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পরেশ যে ভাবে আইসক্রীম খায় সেই ভাবে ঘাড় থেকে রক্ত শুষে নেয়।' বাকিটা আমায় আর বলতে হল না। অপর্ণা মাছভাজা নিয়ে ঢুকছিল-সে-ই বললে, 'দু-একটা প্রাগৈতিহাসিক জীব যেমন ডায়নাসোর, টেরোডাকটিল এখনো সেখানে আছে, তারা পরেশদা যে ভাবে মুগরীর ঠ্যাং চিবোয় সেই ভাবে আস্ত মানুষ মুখে পুরে চোখ বুজিয়ে মৌজ করে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।' অপর্ণার হাতে ইয়া বড় বড় মাছের দাগা দেখে পরেশের ভয় তখন অনেকটা কেটে গেছে; একগাল হেসে বলল, 'যাঃ তোরা ইয়ারকি করছিস। মধুপুরে তোদের বাড়ি আছে। কাকাবাবু তো মাঝে মধ্যেই যান, একজন মালী তো সারাবছর সেখানে থাকে।'অপর্ণা মাছভাজা পরিবেশন করতে করতে বলল, 'যাও-না, গেলেই বুঝবে কত ধানে কত চাল!'

খাওয়াটা খুব জোর হয়ে গেল। শুয়ে পড়তে পারলেই ভাল হয়। পরেশ তো এইসা খেলো, ভয় হচ্ছিল ওর পেটটা না ফেটে যায়। নবেন্দু একবার ঘাবড়ে গিয়ে পরেশকে বাধা দিতে গিয়েছিল। পরেশ খুব করুণ গলায় বললে, 'ভাই, বাধা দিসনি, এত সুন্দর রান্না হয়েছে নিজেকে সামলে রাখতে পারছি না।'অপূর্ব বললে, পেট খারাপ হলে কে দেখবে!' পরেশ ম্লান মুখে বললে, 'ওইটা যে আমার কিছুতেই হতে চায় না রে। আমার পেটে যে কি আছে, খালি খিদে পায়। মা বলেন, আমি নাকি খেয়ে খেয়েই সংসারটা উচ্ছন্নে পাঠালুম।' পরেশ শেষ এক গ্লাস জল খেয়ে একটা পেল্লায় ঢেঁকুর তুলে খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেল, কারণ নবেন্দুর বাড়িতে জোরে হাঁচা, শব্দ করে ঢেঁকুর তোলাকে অসভ্যতা বলা হয়। পরেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাঁচু মুখে বলল, 'চাপতে পারলুম না রে।' অপর্ণা সেই সময় ঘরে ছিল, হেসে বললে, 'আমাদের বাছুরটা ঠিক ওইভাবে ডাকে।'

বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। মালপত্র সব উঠে গেছে। গুরুজনদের প্রণাম করে আমরাও একে একে উঠলাম। ঠাকুমা থুতনিটা ধরে আমাদের প্রত্যেককে চুমু খেয়ে বললেন, 'সাবধানে থাকিস, বেশী বীরত্ব দেখাতে গিয়ে বিপদে পড়িসনি।' অপর্ণা দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, ভেবেছিলুম অনেক কিছুই বলবে, কিন্তু একটা কথাও বলল না। আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু, চোখ দুটো মনে হল জলে টলটল করছে।

গাড়িটা সাবেক আমলের বেশ বড়। শুনেছি ইঞ্জিনটা নাকি অসাধারণ। কোনো শব্দ নেই, বিশ্বাসী কুকুরেই মতই দীর্ঘদিন এই পরিবারের সেবা করে আসছে। পেছনের সিটে আমরা চারজন, সামনে ড্রাইভারের সিটের পাশে বসেছেন প্রফুল্লদা। এই বাড়িতে অনেকদিন কাজ করছেন। বিশাল চেহারা। গায়ে অসুরের ক্ষমতা। শুনেছি এক সময় নাকি ডাকাত দলের সর্দার ছিলেন। এখন ভাল হয়ে গিয়ে আমাদের অভিভাবকের মত, আমাদের বিশ্বাসী বন্ধুর মত প্রফুল্লদা সঙ্গে চলেছেন। আমাদের হাওড়ায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এবার ফিরে আসবেন। গাড়িটা ছাড়ার মুখে পরেশ আর একটা বিশাল ঢেঁকুর তুলল। এবারে আর বাছুরের ডাক নয়, অনেকটা ঝড়ের কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের গুড়ু গুড়ু। গাড়ির স্টার্ট পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। প্রফুল্লদা ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'পেটে কি পুরেছো? বিদ্রোহ

শুরু করে দিয়েছে মনে হচ্ছে!' অপূর্ব বললে, 'বিশেষ কিছু নয়। মাঠের কাছে যে বড় রুই মাছটা ঘুরতো, মাথা সমেত তার আধখানা, এক বিঘে জমির ধান থেকে তৈরি চাল, আর পাঁচ পোয়াটাক দই।' প্রফুল্লদা বললেন, 'নিজেকে এত কষ্ট দিলে কেন?' 'কষ্ট!' অপূর্ব হাসল, 'উপায় ছিল না, ও একেবারে একমাসের র্যাশান লোড করে নিয়ে চলেছে।'

গাড়ি আবার স্টার্ট নিল। পরেশ কোণের দিকে মুখ টিপে বসে আছে। আর কিছুতেই ঢেঁকুর উঠতে দেবে না। এবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলে নবেন্দু গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবে। নবেন্দু সকাল থেকেই অসম্ভব গম্ভীর। কথা খুব কম বলছে। নবেন্দুকে সময় সময়, বিশেষ করে এইরকম সময়, বয়স্ক লোকেদের মত দেখায়। কোথা থেকে একটা অসম্ভব ব্যক্তিত্ব ওর উপর জাঁকিয়ে বসে। নবেন্দু চিরকালই একটু খেয়ালী। কখনও বিশাল সবুজ মাঠে সাদা সাদা কান লোটা লোটা ছাগল ছানার সঙ্গে আপন মনে দিকবিদিক্ দৌড়োদৌড়ি করে খেলা করে। কখনও পাতার পর পাতা অঙ্ক কষে বই শেষ করে ফেলে। কখনও বসে বসে আপন মনে ছিব আঁকে।

দেখতে দেখতে গাড়ি শ্যামবাজার মোড়ে এসে পড়ল। পরেশটা এতক্ষণ ঢুলছিল। সকালের শহরের ভীড়, গাড়ি, ট্রাম, সাজানো দোকান দেখে জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে খাড়া হয়ে বসল। আমাকে ফিস্ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, 'কাঞ্চন, এইটা কলকাতা না কি রে?' 'তোর কি মনে হয়?' পরেশ কিছুক্ষণ গুম্, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'বাপ্স, কী ব্যাপার রে! এখানে লোকের পথ চলতে ভয় করে না?'

'ওরা তো গ্রামের লোক নয় যে ভয় করবে, ওরা শহরের মানুষ। শহরের কায়দা কানুন সব জানে।'

'দিন কতক পরে আমরাও এখানে কলেজে পড়তে আসব, কি বলিস্। বিশ্ববিদ্যালয়টা কোন্ দিকে রে?'

'ওদিকে। সে দিকে আমরা যাবো না।' পরেশ হঠাৎ হৈ হৈ করে উঠলো, 'ওই দেখ কাঞ্চন, আকাশের গাঁয়ে একটা বিশাল ক্রেন!' এইবার মাথায় গাঁট্টা! 'গবেট, ওটা ক্রেন নয়, ওটা হাওড়ার ব্রিজ।' পরেশ সামনের উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে হাঁ করে ব্রিজের দিকে তাকিয়ে রইল।

হাওড়ার পোলের উপর আমাদের গাড়ি নাকটা ঢুকিয়েই নিশ্চল হয়ে পড়ল। কি ব্যাপার কে জানে! সারা পোল জুড়ে এধারে ওধারে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে। মাঝের একসার ট্রাম ঠ্যাঙ উঁচু করে স্থির। কারুরই কোন যাবার গরজ নেই। প্রফুল্লদা সামনের জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে একবার দেখলেন। কিছু বুঝতে পারলেন বলে মনে হল না। বরং বেশ নিশ্চিন্তে পকেট থেকে একটা গোল মত টিনের কৌটো বের করে বিড়ি ধরালেন! ড্রাইভার সাহেবের পকেট থেকে বেরোলো সরু চোঙা মত একটা কৌটো, সঙ্গে চ্যাপ্টা মত ছোট একটা বাচ্চা কৌটো। বড়টায় আছে দোক্তা পাতা, ছোটোটায় চুন। হাতের তালুর উপর দুটোকে ফেলে দলাই মলায়। চোখে একটা ভাবালু উদাস দৃষ্টি। একজন মৌজ করে বিড়ি ফুঁকছেন, অন্যজন খইনি দলছেন। জগৎ যেন চলতে চলতে হঠাৎ গতি হারিয়ে ফেলেছে।

এদিকে আমরা মনে মনে ছটফট করছি। ট্রেন ধরতে হবে। ট্রেন শেষে ছেড়ে না দেয়! নবেন্দু একটু উদখুস করে জিজ্ঞেস করল-'হল কি?'

ড্রাইভার সাহেব দু আঙুলে চিমটি করে দাঁত আর ঠোঁটের ফাঁকে খইনি গুঁজে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল-'হুয়া কুছ্'। প্রফুল্লদা আর একবার মাথাটা বের করলেন। পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক শরীরের চারদিকে মালপত্র ঝুলিয়ে একটি ছেলের হাত ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলেন। প্রফুল্লদার মুণ্ড প্রশ্ন করল-'কি হয়েছে মশাই?' ভদ্রলোক গতিবেগ কিছু মাত্র না কমিয়ে অনেকটা দূর থেকে বললেন-'গুষ্টির পিণ্ডি'।

'বাবা কী মেজাজ।' প্রফুল্লদা মাথা ঢুকিয়ে নিলেন।

পরেশ হাঁ করে খানিক গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বললে, 'যাই বলিস, বেশ লাগছে কিন্তু।' অপূর্ব বললে, 'তা তো লাগবেই। এদিকে মধুপুরের বারোটা। নির্ঘাত ট্রেন ফেল।'

আমার আবার পোলটোলের উপর বেশিক্ষণ থাকতে অস্বস্তি লাগে। যদি ভেঙে পড়ে যায়! বলা তো যায় না। আমার ভয়টা

পরেশের কানে কানে বলতেই পরেশএর মুখ শুকিয়ে গেল। নবেন্দুর দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'চল আমরা দৌড়ে ওপারে চলে যাই।'

'পরেশটা কি বলছে রে?' অপূর্ব জানতে চাইল।

'বলছে, পোলটা যদি ভেঙে পড়ে যায়! চল আমরা দৌড়ে ওপারে চলে যাই'-আমি ভাল মানুষের মত মুখ করে বললুম। পরেশকে একটু অপ্রস্তুত করার জন্যেই বললুম।

প্রফুল্লদা ঘাড় না ঘুরিয়ে আর একটা ভয় তৈরি করে ফেললেন, 'পোলের উপর দৌড়োবে! বল কি? দৌড়োলেই পুলিশে ধরবে। পোলের উপর দৌড়োদৌড়ি চলে না, বুঝেছো! এটা তোমার গ্রামের সাঁকো নয়, এর নাম হাওড়ার পোল।'

নবেন্দু বাঁ দিকের দরজা খুলে রাস্তায় নেমে ফুটপাথের উপর উঠে দাঁড়ালো। বেশ চিন্তিত। সত্যিই চিন্তার কথা। আধঘণ্টা হয়ে গেল। উল্টো দিক থেকে এক ভদ্রলোক আসছিলেন বেশ ধীরে সুস্থে বেড়াতে বেড়াতে। গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবি মুখে বিশাল চুরুট। নবেন্দু বেশ বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কি? ভদ্রল্যেক মুখ দিয়ে চিমনির মত ধোঁয়া ছেড়ে বললেন-'গরু'।

নবেন্দুর ফর্সা মুখ রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল। 'গরু মানে? ভদ্রভাবে একটা প্রশ্ন করলুম আর আপনি আমাকে গরু বললেন! হোয়াট ডু ইউ মিন?' দলদল আমরা তখন রাস্তায় নেমে পড়েছি। মাথায় থাক মধুপুর। আমাদের দলনায়কের প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি! থাক-না মুখে চুরুট। হোক না ভারিক্কি চেহারা। তা বলে যাকে তাকে গরু বলে সরে পড়বেন বিনা কারণে, এ কেমন কথা! হয়ে যাক এক হাত। তারপর দেখা যাবে ট্রেন প্লাটফর্মে শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য রইল কি গেল।

ভদ্রলোক উল্টোদিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন, নবেন্দুর চ্যালেঞ্জে ফিরে এলেন। মুখের চুরুটে অনর্গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নবেন্দুর দিকে হাসি হাসি মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'নবেন্দু না। আমাদের পরেশবাবুর ছেলে। প্রথমে চিনতে পারিনি, তারপর মনে হল গলাটা চেনা চেনা লাগছে। তুমি কত বড় হয়ে গেছো হে!' আমরাও যেমন অবাক নবেন্দুও তার চেয়ে কম নয়। কে এই ভদ্রলোক! আমরা আস্তিন গুটিয়েছিলুম। আবার নামিয়ে নিলুম। ভদ্রলোক তখন হো হো করে হাসছেন, 'চিনতে পারলে না তো?' নবেন্দু চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না। আমরা তো চিনিই না। ভদ্রলোক চুরুটটা মুখে পুরতে পুরতে বললেন, 'চিনলে না তো! আমি পার্থর বাবা।' নবেন্দুর মারমুখী ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল। টপ্ করে নিচু হয়ে ভদ্র-লোককে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি নবেন্দুকে তাঁর ছাপান্ন ইঞ্চি ছাতিতে জড়িয়ে ধরে গদ্‌গদ গলায় বললেন, 'ব্রেভ বয়'। আমরাও নবেন্দুর দেখাদেখি টপাটপ নমস্কার করে ফেললুম। 'তোমার দলবল? আরে ওই দেখ।' ভদ্রলোকের কথায় আমরা তাকিয়ে দেখলুম। হাওড়ার দিক থেকে পালে পালে গরু কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা আধটা নয়, প্রায় শ দুয়েক। 'গরু' বলার অর্থ এতক্ষণে আমাদের কাছে স্পষ্ট হল! এত গরু ছিল কোথায়! এল কোথা থেকে! নবেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'এত গরু ছিল কোথায়?'

'পাঞ্জাবে ছিল। এসেছে আজ সকালে। চলেছে কলকাতার খাটালে। এক একটা গরু মিনিমাম ২০ লিটার দুধ দেবে দিনে।'

'ও' এই জন্যেই সব রাস্তাঘাট বন্ধ!' নবেন্দুর মনে হল এতক্ষণে বুঝেছে।

'যাকগে, তোমরা চলেছ কোথায় সদলে?'

নবেন্দু হেসে বলল, 'কয়েকদিনের জন্যে মধুপুরে যাচ্ছি মেসোমশাই।'

'আই সি! মধুপুর। মধুপুর বড় ভাল জায়গা হে। ওঃ, সেই কত কাল আগে গিয়েছিলুম!' মেসোমশাইয়ের চোখ দুটো কী রকম স্বপ্নময় হয়ে এল মধুপুরের নামে।

'তোমার বাবা কেমন আছেন নবেন্দু?'

'ভাল আছেন।' নবেন্দু একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল। বোধহয় ট্রেনের কথা মনে পড়েছে। এ ট্রেনটা যে আমরা ধরতে পারবো না,

ঘড়ি অন্তত তাই বলছে। পরে আর কি ট্রেন আছে জানি না।

'তোমাদের ট্রেন ক'টায়?' ভদ্রলোক নেভা চুরুটটা দেশলাই দিয়ে ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করলেন। নবেন্দু সময়টা বলতেই পাঞ্জাবির হাতা উল্টে ভদ্রলোক সময় দেখলেন। 'আর বেশি সময় নেই। তোমরা বরং গাড়ি ছেড়ে কুইক মার্চ করে চলে যাও। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই জ্যাম ক্লিয়ার হতে সময় নেবে। পরেশটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখছিল। কুইক মার্চ শব্দটা তার কানে যেতেই করুণ মুখে এগিয়ে এল, 'মালপত্তরের কি হবে মেসোমশাই?'

'মালপত্তর!' পরেশের দিকে তাকিয়ে মেসোমশাই সহজ গলায় হেসে হেসে বললেন, 'ইয়ং ম্যান ট্রেন যদি ধরতে চাও, মাল মাথায় করে দৌড় লাগাও স্টেশনের দিকে, নো আদার অলটারনেটিভ।' পরেশের মুখ দেখে মনে হল কেঁদে ফেলবে। বেশ আয়েশ করে ঘুমোতে ঘুমোতে আসছিল। এ কী মহাবিপদ! শ' খানেক গরু আমাদের সুখ গুঁতিয়ে ফেলে দিয়েছে। এখন জগদ্দল মাথায় দৌড়োতে হবে। আমাদের কারুরই এই পরিণতি ভাল লাগছিল না। একটু আধটু মাল নয়। মালের হিমালয় ঠাসা আছে গাড়ির বনেটে, আমাদের পায়ের কাছে। এর চেয়ে গাড়িটা মাথায় করে দৌড়ান অনেক সহজ।

নবেন্দুকেও বেশ চিন্তিত দেখাল। সেও বোধহয় একই কথা ভাবছে। ভদ্রলোক তাড়া দিলেন, 'নাও নাও, গেট রেডি, আমি তোমাদের স্টার্ট করিয়ে দিয়ে যাব। জানো, আমি একজন ভাল স্টার্টার। হাওড়ায় যেখানে যত স্পোর্টস্ হয় সব জায়গায় আমি।' হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন 'রেডি গেট সেট গোও ও।' আমরা কেউই দৌড়োলুম না। নন স্টার্টার হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

টর্পেডোর মত চুরুটটা মুখ থেকে বের করে, ছাইটাই ঝেড়ে পরিষ্কার করে মেসোমশাই একটা খালি দেশলাই বাক্সে ভরে ফেলে বললেন, 'তোমাদের দৌড় শুরু করে দিয়ে আমি এই গাড়িটা নিয়েই অফিসে চলে যাব। বেশি দূরে নয়-এই জি. পি. ও. -তে। তোমাদের সঙ্গে কথায় কথায় ভীষণ দেরি হয়ে গেছে।'

আমরা তখন মহা দ্বিধায় পড়েছি। কি যে করা উচিত ঠিক করতে পারছি না। নবেন্দুর কাছ থেকেও কোনো নির্দেশ নেই। এমন সময় কানে এল সেই ঘণ্টার শব্দ। দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। দমকল। একটা নয় পর পর দুটো। কলকাতা থেকে হাওড়ার দিকে ছুটছে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে।

দূর থেকে দমকলের ঘণ্টা শুনেই প্রফুল্লদা ড্রাইভারের সিটের পাশে বসেই চিৎকার করে উঠলেন-'কুইক! ঝটপট সব ঢুকে পড়, এই সুযোগ, দমকলের পেছনে পেছনে আমরা বেরিয়ে পড়ব, তা না হলে তোমাদের ট্রেন ধরার বারোটা।' আমরা পড়ি কি মরি করে গাড়িতে ঢুকে পড়লুম। পরেশটা চিরকালের ল্যাদাড়ুস। গাড়ির চালটা যে নিচু হয় একথা বোধহয় তেড়ে-ফুঁড়ে ঢোকার সময় ভুলেই গিয়েছিল। মনে পড়ল ধাঁই করে মাথাটা ঠুকে যাবার পর। কপালটা দেখতে দেখতে ছোটো নতুন আলুর মত ফুলে উঠল। নবেন্দু বললে, 'ঠিক হয়েছে, লাগতে লাগতে যদি একটু আক্কেল হয়।' পরেশের চোখে তখন জল এসে গেছে।

আমাদের ড্রাইভার প্রফুল্লদার চেয়েও ওস্তাদ। দমকলটা গাড়ি আর গরুর জটিল জট ফুঁড়ে বেরোতেই স্টার্ট নিয়ে পিছু ধাওয়া করল। যে লোকটি দমকলের ঘণ্টা বাজাচ্ছিল সে যেতে যেতে আমাদের একটা দাবড়ানি দিল। আমরা তখন মরিয়া। দুপক্ষের তাড়া। দমকল চলেছে আগুন নেভাতে, আমরা চলেছি ট্রেন ধরতে। ইতিমধ্যে আর একটা দমকল তেড়ে এসেছে। প্রচণ্ড ঘণ্টার আওয়াজে গরুগুলো তাদের পরিচালকের হাতছাড়া হয়ে এলোপাথাড়ি ছুটতে শুরু করেছে। একজন ট্রাফিক পুলিশ দৌড়ে আসছিল আমাদের গাড়িটাকে দুটো দমকলের মাঝখান থেকে টেনে বের করে দিতে, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। বিশাল একটা গরুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, হেই রাম বলে ছিটকে পড়ে গেল। দুটো গাড়ির মাঝখানে স্যাণ্ডুইচ হয়ে আমরা এঁকে বেঁকে এগিয়ে চললুম। প্রফুল্লদার ঠোঁটের বিড়ি উত্তেজনায় টানতে ভুলে গিয়ে নিভে গেছে। আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'একে পুরনো গাড়ি, একবার স্টার্ট বন্ধ হলেই পিছনের গাড়িটা আমদের ছাতু করে দিয়ে চলে যাবে। কোন কেসই হবে না।' সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। পরেশ দেখি আমার ডান হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেছে। ভয়ে তার কপালের যন্ত্রণা ভুলে গেছে। ফোলাটাও যেন চুপসে গেছে। ভেবেছিলুম, বেশ বড় সাইজের একটা নৈনিতাল আলু হবে। তা আর হল না।

হাওড়া স্টেশন

সবার আগে প্রফুল্লদা। ডান হাতে ঝুলছে সেই ম্যাগনাম সাইজের হোল্ডল, যার মধ্যে কি না আছে! খুঁজলে বিশল্যকরণীও পাওয়া যাবে হয়ত। শক্তি বটে একখানা! ওই অতবড় একটা ওজনদার জিনিস এমন অক্লেশে বয়ে নিয়ে চলেছেন যেন ছোটদের একটা বই রাখা সুটকেস। প্রফুল্লদার পেছনে পেছনে আমরাও ছুটছি। ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট তিনেক বাকি আছে। প্রথমে আমাদের বলেছিল আট নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে। এখন মাইকে ঝাঁ ঝাঁ করে বলছে ১২ নম্বর থেকে ছাড়বে। আমরা ছুটছিলুম আটের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে এখন মুখ ঘুরিয়ে আবার বারোর দিকে। সারাটা স্টেশনে যেন তোড়পাড় কাণ্ড। প্রফুল্লদার পেছনে নবেন্দু, তার পেছনে আমরা। সবার শেষে পরেশ। একে সে বেচারা প্রচুর খেয়েছে তারপর গাড়িতে বসে বসে বোধহয় একটু ঘুমিয়েছে। পরেশ যেন আর নড়তেই পারে না। তার উপর হাতে একটা বালতি। বালতির মধ্যে একটা কেরোসিন স্টোভ, তেলের বোতল, সুতুলি দিয়ে ঠেসে টাইট করে বসানো। দলবল তখন বারো নম্বরে ঢোকার বেড়ার কাছে এসে গেছে। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে-আমরা দেখতে পাচ্ছি। এমন সময় আমাদের ল্যাজের দিকে একটা হৈচৈ শুনতে পেলুম। সেই সঙ্গে পরেশের গলা। পরেশ করুণ সুরে বলছে, 'আমি কি করবো বলুন! আমার কি দোষ বলুন!' সঙ্গে একটা হেঁড়ে গলা, 'তুমি কি করবে? তোমার কি দোষ? ইডিয়েট, তুমি দেখে চলতে পার না!' পিছন

ফিরে ঘটনা দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। পরেশের হাতের বালতি প্লাটফর্মে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কেরোসিনের বোতলটা গড়াচ্ছে। ভাগ্য ভালো ভাঙেনি। কিছু দূরে মাটিতে কাৎ হয়ে পড়ে আছে একটা খাঁচা। দরজাটা খোলা। গোটা দশেক গিনিপিগ দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে। অসহায়ের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন খাঁচার মালিক। লম্বা চওড়া এক মানুষ। পরনে কালো স্যুট, টাই। ঘাড় অবধি লম্বা লম্বা চুল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা গিনিপিগগুলো এদিক ওদিক দৌড়াতে দৌড়াতে ক্রমশই দূরে চলে যাচ্ছে। একটা ফুট-ফুটে বাচ্চা মেয়ে মার হাত ছাড়িয়ে একটি গিনিপিগের পেছনে হৈহৈ করে ছুটে চলেছে। মা ছুটেছেন মেয়ের পেছনে-'ডলি ডলি, চলে আয় বলছি, চলে আয় দুষ্টু মেয়ে।' এক ভদ্রলোক হুইলারের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন দেখছিলেন। এক হাতে ধরা ছিল চেনে বাঁধা একটা বড় সাইজের কুকুর। ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে বই দেখছিলেন। কুকুরটা দেখছিল ছুটন্ত গিনিপিগ। কাছাকাছি আসতেই ভৌ-ও বলে বিশাল এক লাফ মারল। আচমকা লাফের জন্যে কুকুরের মালিক প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চিৎপাত হয়ে উল্টে পড়লেন। কুকুর হাতছাড়া হয়ে চেন সমেত সারা প্লাটফর্মে দাপাদাপি শুরু করে দিল। এই হুড়োহুড়ির মধ্যে পড়ে এক বুড়ী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রমহিলা চিলের মত গলায় চিৎকার শুরু করলেন 'পুলিশ, পুলিশ।' একজন ফাদার আসছিলেন ঝুলো গাউন পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে। এক হাতে ধরা সোনালী বাইবেল। কুকুরের তাড়া খেয়ে একটা গিনিপিগ তাঁর কোট কামড়ে ধরে ঝুলছে। ফাদার দাঁড়িয়ে পড়ে বুকে ক্রুশ আঁকছেন আর আমেন আমেন বলছেন।

ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক রেগে খাঁচাটাই একটা লাথি মেরে আশেপাশে ছড়ানো জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে অনেকটা বিবাদী পক্ষের উকিলের গলায় বললেন, 'এই সব উটমুখো জানোয়ারগুলো স্টেশনে ছাড়া পায় কি করে?' এ প্রশ্নের কে জবাব দেবে! টিকিট কাটলেই স্টেশনে ঢোকা যায়। যে কেউ ঢুকতে পারে। পরেশ এতক্ষণ মাথা নীচু করে অপমান হজম করছিল। জানোয়ার বলায় তার সুপ্ত পৌরুষ এবার জেগে উঠল। জনতার আদালতের দিকে তাকিয়ে সেও এইবার তার প্রশ্ন রাখল, 'এই সব চিড়িয়াখানা নিয়ে স্টেশনে আসার কি দরকার ছিল! এত বড় একটা খাঁচা নিয়ে সকলকে খোঁচাতে খোঁচাতে উনিই বা কেন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছিলেন।' ট্রেন ধরার আশা তখন আমরা ছেড়েই দিয়েছি। গার্ডসাহেবের হুইসিল বেজে লাল পতাকা নড়ে গেছে। পরেশের মুক্তির জন্যে আমরা এগিয়ে গেলুম। বেচারা মহা ফ্যাসাদে পড়েছে। নবেন্দু বললে, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন যা হোক একটা কিছু করা দরকার। ট্রেনটাও আমরা ফেল করেছি।' 'ট্রেন!' ভদ্রলোক তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন, 'সর্বনাশ, আমিও যে ওই ট্রেনে যাব। কার হুকুমে ট্রেন ছেড়ে গেল?' ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলেন, 'গার্ডসাহেবের হুকুমে।' ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ ইট।' যিনি আগের উত্তরটা দিয়েছিলেন তিনি ততোধিক জোরে বললেন, 'ইয়েস স্যার!' জনতা হৈহৈ করে হেসে উঠল।

ফাদার এইবার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। তাঁর সাদা গাউনের বুকে নিশ্চিন্তে আরামে লেপ্টে আছে একটা গিনিপিগ। জুলজুলে চোখে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। 'বাবু, ইজ দিস ইওরস?' ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'থ্রো ইট। ফেলে দিন। দূর করে ফেলে দিন।' ফাদারের মুখে সেই মিষ্টি হাসি। যীশুর মুখের হাসির মত। 'বাবু, হোয়াই ইউ আর সো এ্যাংরি! ওতো রাগতে নেই। রাগ আমাদের এনিমি আছে। আমি একটাকে উদ্ধার করিয়েছি। বাট দেয়ার আর সো মেনি অফ দেম।' ভদ্রলোক কিছুই করতে চাইছেন না দেখে, আমি খাঁচাটা সোজা করে ফাদারের হাত থেকে গিনিপিগটা নিতে গেলুম। সে বেটা কি সহজে আসতে চায়! ফাদারের বুক আঁকড়ে মজাসে পড়ে আছে। জোর করে ছাড়িয়ে আনলুম। খচমচ্ করে হাতে একটু আঁচড়ে দিলে। কোন রকমে খাঁচায় ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। খাঁচার দরজাটা ডিফেকটিভ। সহজে বন্ধ হতে চায় না। বন্ধ হলেও ছিটকিনিটা ঠিকমত আটকানো যায় না। নবেন্দু খুব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা ছিল? ভদ্রলোক তখনও বেশ রেগে আছেন। বললেন, 'জানি না।'

'জানি না বললে তো চলবে না, জিনিসটা কার, মালটা কার ছিল?' ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন রেলওয়ে প্রোটেকসান ফোর্সের একজন অফিসার। 'সারা স্টেশনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। একজন ভদ্রমহিলা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। কে একাজ করেছে! ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারাটা মনে আসছে না, কত নম্বর ধারা-কত নম্বর ধারা, ধ্যুত তেরি মনে আসছে না।' ভদ্রলোক বার কয়েক মাথার টুপিটা তুললেন আবার বসালেন। 'ধারাটা আমার এখন ঠিক মনে আসছে না, মনে না এলেও ধারাটা নেই এমন মনে করার কোন কারণ নেই। রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আছেন, তিনি বুঝবেন কত নম্বর ধারায় অপরাধীকে সাজা দেবেন। আমার কাজ অপরাধীকে অ্যারেস্ট করা।' প্রোটেকসান ফোর্সের অফিসার বুক ফুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। গিনিপিগের মালিকও কিন্তু কম যান না। তিনি এতটুকু ভয় পেলেন না। ইংরেজীতে বললেন, 'হু আর ইউ? আমি যাকে তাকে আমার কাজের কৈফিয়ত দিই না, আমি তার সঙ্গেই কথা বলব হু ইজ নট বিলো দি র্যাঙ্ক অফ এ ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট।' অফিসার একটু ঘাবড়ে গেলেন। ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'ম্যাজিস্ট্রেট এখন ভাত খেতে বাড়ি গেছেন। খাবার পর তিনি একটু ঘুমোবেন, তারপর তিনটে নাগাদ আসবেন। আপনি কি বলতে চান ততক্ষণ এই জন্তুগুলো সারা প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়াবে! একটা তো সুপারিনটেনডেণ্টের ঘরে ঢুকে তাঁর চায়ের কাপ উল্টে দিয়েছে।' ভদ্রলোকের

কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, কুকুরে চিৎকারে স্টেশন ফেটে যাবার উপক্রম, সেই সঙ্গে একটা অসহায় মানুষের চিৎকার-'টম, নো টম, যাঃ খেয়ে ফেলেছে'। সকলের নজর বইয়ের স্টলটার দিকে চলে গেল। কুকুরের মালিক ধুলো ঝেড়ে উঠেছেন কিন্তু কুকুরটাকে সামলাতে পারছেন না। কুকুরটা জিভ দিয়ে মুখ চাটছে। গোঁফের কাছে সাদাসাদা লোম। একটা গিনিপিগ সাবাড় করে আর একটাকে ধরার জন্যে চেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। ভদ্রলোক অসহায়ের মত চিৎকার করছেন, 'টম, নো নো, হেল্প, হেল্প'। কে হেল্প করবে!

আমাদের আশেপাশে যে ভিড় জমেছিল, সেই ভিড়ে কিছু পুরোনো লোক চলে যাচ্ছেন এবং অনবরতই কিছু নতুন লোক এসে জমছেন। ফলে জটলার আকৃতি সেই একই থেকে যাচ্ছে। বরং যাঁরা নতুন এসে জমেছেন তাঁদের একপ্রস্থ ব্যাপারটা গোড়া থেকে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। সে দায়িত্বটা অবশ্য একজনই নিয়েছে। সে হল স্টেশনের একজন উর্দিপরা পোর্টার। নবেন্দু এতক্ষণ ঘটনার দ্রুত পট পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরেই বোধহয় চুপচাপ দাড়িয়েছিল। এইবার সে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। গিনিপিগের মালিকের সামনাসামনি এগিয়ে এসে বললে-'কি ছেলেমানুষী করছেন। একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। সারাদিন নিশ্চয়ই এইভাবে আমরা সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকব না!' ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক মনে হল একটু নরম হয়েছেন, বললেন, 'কি করবে? এত বড় স্টেশনে কোথায় কোন্‌টা কোন্ ঘুপচির মধ্যে ঢুকে গেছে, কে বার করবে শুনি?' 'কেন, আমরা সকলে মিলে। ফাদার একটাকে ধরে এনেছেন। সেটা এখন খাঁচায়। একটাকে কুকুরে খেয়েছে। এখন বলুন, আর ক'টা আছে?' নবেন্দু হিসেব চাইল। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন, 'যাঃ, কুকুরে খেয়ে গেল! কার কুকুর, কোথাকার কুকুর?'

নবেন্দু ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরের মালিককে দেখিয়ে দিল। ভদ্রলোকের তখন পরিত্রাহি অবস্থা। তিনি কুকুরের মালিক না কুকুর তাঁর মালিক বোঝাই দায়। ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। কুকুর থেকে একটু সম্মানজনক দূরত্বে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি আনট্রেনড, আনসিভিলাইজড কুকুর মশাই আপনার?' কুকুরধারী চেনটাকে আঁকড়ে ধরে বললেন, 'তাতে আপনার কি মশাই? আপনার পাকা ধানে মই দিয়েছে কি?'

'নিশ্চয়ই দিয়েছে, তা না হলে বলব কেন? আমি যেচে কারুর সঙ্গে কথা বলি না, বুঝেছেন।'

'আমার কুকুর কি করেছে আপনার?'

'আমার রিসার্চ গিনিপিগ খেয়ে ফেলেছে।'

'কোনো প্রমাণ আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। প্রত্যক্ষদর্শীয় সাক্ষ্য আছে। তা ছাড়া ওই তো সারা মুখে সাদাসাদা লোম লেগে আছে। বত্রিশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা আগে ছাড়ুন, একটা গিনিপিগের দাম, তারপর লম্বা চওড়া বাত ছাড়ুন। বুঝেছেন।'

'একটা গিনিপিগের দাম আটচল্লিশ টাকা বত্রিশ পয়সা, বলেন কি মশাই! কোথাকার গিনিপিগ? অস্ট্রেলিয়ার?' কুকুরের আচমকা হেঁচকা টানে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে ব্যঙ্গের সুরে ভদ্রলোক বললেন।

'কানে কম শোনেন না কি মগজে গ্রেম্যাটার্সের অভাব হয়েছে? আটচল্লিশ টাকা বত্রিশ পয়সা নয়, বত্রিশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা।'

'ওই হল মশাই, একটু গুলিয়ে ফেলেছিলুম। বড় বড় লোকদের ওই রকম একটু আদটু ভুল হয়েই থাকে, তাদের মাথায় সব সময় বড় বড় চিন্তা পাক খায়। আইনস্টাইনের কথা শোনেননি?'

'আইনস্টাইন আর আপনি! হাসালেন মশাই। আপনি আমার চেয়েও বড়! আমার নাম জানেন? আমার নাম ডকটর ল্যাং।' নিজের নাম ঘোষণা করে ভদ্রলোক বেশ গর্বের সঙ্গে ভিড়ের দিকে তাকালেন। ভিড়টা ইতিমধ্যে আগের জায়গা থেকে এদিকে সরে এসেছে। নামটা কুকুরের মালিককে এতটুকু সমীহ করে তুলেছে বলে মনে হল না। তিনি আগের মতই বেপরোয়া ভাবে বললেন, 'ডকটর ল্যাং! জীবনে এরকম নাম শুনিনি। কিসের ডাক্তার! ঘোড়ার? হর্স ডকটর!' ল্যাং সাহেব একটু আহত হলেন। হাত দিয়ে টাইটা চেপে ধরে বললেন, 'কিসের ডাক্তার আর ঘণ্টাখানেক পরেই বুঝতে পারবেন।' একটা রহস্যের আভাস দিয়ে ডকটর ল্যাং

নবেন্দুকে বললেন, 'চল মাস্টার, বাকিগুলোকে উদ্ধার করে আনি বিফোর ইট ইজ টু লেট।' ডক্টর ল্যাঙের সঙ্গে আমরা একটু এগিয়ে যেতেই কুকুরের মালিক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এক ঘণ্টা পরে কি হবে?' 'এক ঘণ্টা পরেই বুঝতে পারবেন। তখন আপনার ওই ডাঁট চুপসে যাবে। তখনই বুঝতে পারবেন ডক্টর ল্যাং কে!'

কুকুরের মালিক একটু এগিয়ে এসে বেশ সমীহ করে বললেন, 'বলুন না স্যার কি হবে? আমি আবার সাসপেন্সে থাকতে পারি না, পেট ফোলে। এটা আমার ছেলেবেলার রোগ। তখন কত আর বয়স আমার, এই এদের মতই হবে, অবাধ্যতা করেছিলুম বলে আমার ফাদার রায়বাহাদুর হরিশঙ্কর রায় আমাকে সারারাত আমাদের নির্জন বাগানবাড়ির চিলেকোঠায় বন্ধ করে রেখেছিলেন। লোকে বলত বাড়িটা ভূতের বাড়ি। উঃ, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়, এই দেখুন এত বছর পরেও।' ভদ্রলোক বাঁ হাতটা এগিয়ে দিলেন।

ডক্টর ল্যাং হাতটার দিকে তাকালেনও না, ভুরু দুটো ধনুকের মত বাঁকিয়ে বললেন, 'ও গল্প! স্টোরি। আপনার গল্প শোনার মত সময় আমার নেয়। আমার এক সেকেণ্ড সময়ের দাম কত অনুমান করতে পারেন?' 'অনেক দাম স্যার। আমি প্রতিবাদ করছি না স্যার। কেবল দয়া করে বলে যান একঘণ্টা পরে কি হবে।' ডক্টর ল্যাঙের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। নবেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?'

'নবেন্দু।'

'আই সি। নবেন্দু, বলেই দিই একঘণ্টা পরে কি হবে, কি বল?' নবেন্দু উত্তর দেবার আগেই আমরা সমস্বরে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেই দিন। আমাদেরও ভেতরটা কেমন কেমন করছে।'

ডক্টর ল্যাং প্যান্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে শরীরটা টান টান করে ভারিক্কি চালে বললেন, 'শুনুন, দিস ডগ, আপনার এই বাঁদর কুকুরটা একটা গিনিপিগ খেয়েছে। এরা সকলেই দেখেছে। আপনি অবশ্য দাম দেবার ভয়ে অস্বীকার করেছেন। আপনার স্বীকার অস্বীকারে আমার ঘণ্টাটি, বুঝেছেন! ফলেন পরিচীয়তে। ওই গিনিপিগটাকে হাই ডোজে হরমোন ইন্জেকসান করা আছে, বুঝেছেন! যেটা আপনার গাধা কুকুরটা খেয়েছে। অবশ্য কুকুরের আর দোষ কি বলুন। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে-কুকুরকে দেখে তার প্রভুকে চেনা যায়। রায়বাহাদুরের বংশধরদের কি অবস্থা তা আমার জানা আছে।'

'ঠিক বলেছেন স্যার।' ভদ্রলোক কাচুমাচু করে ডক্টর ল্যাঙের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডক্টর ল্যাং তাঁর বেদনার মুখটা উসকে দিতেই ভদ্রলোকের এতক্ষণের অহংকারের আলখাল্লাটা যেন নিমেষে পায়ের তলায় খুলে পড়ল। অনেকটা আত্মগতভাবেই বললেন, 'কি অবস্থা দেখুন আমার, বাবা মারা যাবার পর সেই ভূতুড়ে বাগানবাড়িটা রেখে গেলেন, তাও আবার তিনবার মর্টগেজ করা। আর রেখে গেলেন তেরপলের চালওলা একতা পুরোনো গাড়ি। সেটার চালে এখন ছত্রিশটা ফুটো। আর এই কুকুরটা। বাবার আমলে এটা মাসে তিনশো টাকা খেত, এখন দশ টাকায় ম্যানেজ করতে হয়। কতদিন মাংসের মুখ দেখেনি। আলোচালের ভাত খেয়ে খেয়ে ওর স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে! কতদিন পরে আজ একটু মাংসের মুখ দেখল!'

'সেই মাংসই ওর কাল হবে। কড়া ডোজের হরমোনে ও ঘণ্টাখানেক পর থেকেই ফুলতে থাকবে, আকৃতিতে বাড়তে বাড়তে এখনকার চেয়ে একশোগুণ হয়ে যাবে, চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলবে। শার্লক হোমসের হাউণ্ডস অফ বাস্করভিল পড়েছেন?' ভদ্রলোক অসহায়ের মত মুখ করে বললেন, 'ইংরেজি পড়তে জানি না। ছেলেবেলাটা বাড়ির বড় ছাদে ঘুড়ি উড়িয়ে কাটিয়েছি। আর একটু বড় হয়ে কেবল সিনেমা আর থিয়েটার দেখে কাটিয়েছি। আহা, সে কী সব অভিনেতা আর অভিনয়, দুর্গাদাস, শিশির ভাদুড়ি, অর্ধেন্দু শেখর, নরেশচন্দ্র, অপরেশ মুখোপাধ্যায়।'

'ছি ছি'-ডক্টর ল্যাং ছি ছি করে উঠলেন। 'জীবনটা এইভাবে নষ্ট করেছেন! যাক, আর দুঃখের কিছু রইল না। এই কুকুরটাই আপনাকে উদ্ধার করে দেবে। হাড় মাংস সমেত প্রথমে আপনাকেই জলযোগ করবে। তারপর চেনফেন ছিঁড়ে পাড়ায় বেরিয়ে পড়ে, যাকে পাবে তাকে খাবে। তারপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মিলিটারি ডেকে গুলি করে মারার চেষ্টা করবে। ভাবনার কিছু নেই। চল নবেন্দু।' ডক্টর ল্যাং এগোতে শুরু করলেন। আমরা তাঁর পিছনে। কুকুরের চেন ধরে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। ভয়ে মুখটা ছাইয়ের মত সাদা।

'চলো এবার'। ডাঃ ল্যাং নবেন্দুর কাঁধে হাত রাখলেন। প্রত্যেকটা গিনিপিগ এক এক ধরনের মারাত্মক রোগবীজাণু নিয়ে ঘুরছে। কারুকে কামড়ে দিলে মহা মুশকিল হবে। নবেন্দু আর ডাঃ ল্যাং হাতখানেক এগোতেই আর পি এফের অফিসার বাধা দিলেন, 'যাচ্ছেন কোথায়? আপনাকে তো আমি এ্যারেস্ট করেছি।' 'অ্যারেস্ট!' ডাঃ ল্যাং থেমে পড়ে ভ্রূ দুটোকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে বিস্ময়ে প্রকাশ করলেন। নবেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলে কিন নবেন্দু, এই পেটি অফিসার অ্যারেস্ট করবে ডাঃ ল্যাংকে! এত বড় শক্তি এই ক্যারিকেচার অফ এ পুলিশ ম্যানের। দেখা যাক কার শক্তি বেশি।' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে ডাঃ ল্যাং রুখে দাঁড়ালেন।

নবেন্দু আর আমরা দলবল চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলুম। কি হবে বোঝা যাচ্ছে না। কার শক্তি যে বেশি! ডাঃ ল্যাঙের পুরো পরিচয়ই তো জানি না। পুলিশের শক্তি আমরা জানি। পুলিশের কেরামতি আমাদের পাড়ায় কয়েক বার দেখেছি। ঘাড়ে রদ্দা মেরে, পেটে রুলের গুঁতো মেরে বাঘা বাঘা আসামীকে নিমেষে ঘায়েল করা কোনো একটা ব্যাপারই নয়। তারপরই তো আসামীর বাড়ানো দুটো হাতে ক্ল্যাং করে দুটো লোহার বালা ঢুকে যাবে। কোমরে জড়িয়ে যাবে মোটা একটা কাছি। তাপর! তারপর ভাবতেও হাসি পায়, ডাঃ ল্যাং আগে আগে চলবেন, পেছনে হাতে দড়ি ধরে ওই পুলিশ অফিসার। প্রফুল্লদা একবার নবেন্দুদের একটা গরুকে এই ভাবে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন।

ডাঃ ল্যাঙের হাত তখনও নবেন্দুর কাঁধে। ঠোঁট ঝুলছে মস্ত একটা টোব্যাকো পাইপ। ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। নিভে গেছে বোধ হয়। ডাঃ ল্যাং বললেন, 'চলো। দেখি হতভাগাগুলো কোথায় আছে।' পুলিশ অফিসার এতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাক্তারের বোলচালে বোধ হয় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এইবার ডাক্তার এগোতে চাইছেন দেখে একটু তৎপর হয়ে উঠলেন। ইংরেজীতে বললেন, 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।' নবেন্দুর কাঁধ থেকে ডাক্তারের হাত নেমে এল। পাইপটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে ছাই ঝেড়ে কোটের পকেটে ফেলে দিলেন। বিড় বিড় করে বললেন, 'অ্যারেস্ট, অ্যা অ্যারেস্ট, তাই না' তারপর ধাঁ করে অন্য পকেট থেকে বের করে ফেললেন অনেকটা রিভলভারের মত দেখতে ছোটো একটা অস্ত্র। আমরা আবার থমকে দাঁড়ালুম। এবার আড় ডাঃ ল্যাঙের গাঁ ঘেষে নয়, বেশ দূরে দূরে। বলা যায় না, গুলি-গোলা ছুটে কে কখন ঘায়েল হয়। পুলিশের রাইফেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কি ওই মাঝারি সাইজের রিভলভার! কাঁধে রাইফেল অথচ অফিসার ভদ্রলোক কি রকম ভয়ে ভয়ে দূরে সরে যাচ্ছেন! নবেন্দুটার কিন্তু আচ্ছা সাহস। দু পক্ষের মাঝখানে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, বিরাট একটা তামাশা। যাঁরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিছক মজা দেখছিলেন তাঁরাও সুড়সুড় করে পালাতে শুরু করলেন। প্রফুল্লদা এতক্ষণ আরাম করে আমাদের পেল্লায় বেডিংটার উপর বসেছিলেন। উত্তেজনা বেশ বাড়ছে দেখে কৌটো খুলে নতুন করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিলেন। পরেশ কানে কানে বললে, 'আচ্ছা কাল হল দেখছি। এর হাত থেকে সহজে উদ্ধার পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

পুলিশকে পিঠ দেখাতে নেই বলেই বোধ হয় অফিসার ভদ্রলোক যতটা সম্ভব পিছু হটে সরে যেতে বললেন, 'গুলি করবেন নাকি মশাই? ডাঃ ল্যাং স্টেশন-ফাটানো হাসি হেসে বললেন, 'গুলি! আমি কি সাধারণ ওয়াগনব্রেকার যে গুলি করব? এ জিনিস গুলিয়ে চেয়ে মারাত্মক।' অফিসার ভদ্রলোক আরো দু কদম পিছিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তবে কি এটম বম?' এটম বম শব্দটা কানে যেতেই প্রফুল্লদা কুঁক কুঁক করে হেসে উঠলেন। হাসির শব্দটা অফিসারের কানে যেতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'হাসে কে? হাসার কি আছে? এটা কি যাত্রা না থিয়েটার !' জীবন অনেক পুলিশ চরিয়েছেন প্রফুল্লদা। ভয়-ডর কিছুই নেই। বসে বসেই জবাব দিলেন, 'হাসবো না কেন? হাসির কথা হলেই হাসি চাপা যায় না! এটম বোমা মশাই তিনিটেই ছিল, যুদ্ধের সময় জাপানের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিল। ব্যস, স্টক শেষ, আর মাল নেই।'

'মাল নেই? আপনি সব জেনে বসে আছেন! আমি রোজ সকালে নিয়ম করে কাগজ পড়ি, বুঝেছেন। আমার একটা বইও আছে আণবিক বিজ্ঞান, আমি রোজ একটু করে পড়ি।' অফিসারের কথায় প্রফুল্লদার হাসি তো কমলই না, বরং বেড়ে গেল, 'গড়ে পড়ে তো ওই জ্ঞান হয়েছে। আণবিক বোমা হাতে করে ছোঁড়া যায়? আর আণবিক বোমা ডাক্তার সাহেব ছুঁড়বেন কেন? মশা মারতে কেউ কামান দাগে মশাই!'

'মশা? আমি হলুম গিয়ে মশা! দেখাব মজা। দেখিয়ে দোবো একবার মশা বলার মজাটা।' প্রফুল্লদা একটা ঠ্যাং আর-একটা ঠ্যাংয়ের উপর তুলে দিয়ে বললেন, 'মশা মারতে লোকে মশামারা তেল ব্যবহার করে, ডাক্তার সাহেবের হাতের ওই যন্ত্রে সে ইতেল ভরা আছে।'

পরেশ আমার কানে কানে বলল, 'ওটা কী রে, ফ্লেম-থ্রোয়ার নাকি রে!' পরেশটা আবার জেমস বণ্ড গুলে খেয়েছে। প্রফুল্লদার কথায় অফিসার আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সব রাগ গিয়ে পড়ল প্রফুল্লদার উপর। ডাঃ ল্যাঙের কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।' প্রফুল্লদা নিমদাঁতন করা ঝকঝকে দু'সার দাঁত বের করে বলল, 'আমার অপরাধ স্যার!' অফিসার একটু ঘাবড়ে গেলেন, আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লজ্জা করে না সব কথায় হ্যা হ্যা করে হাসতে। যখন তখন যেখানে সেখানে হাসাটাও অপরাধ। দণ্ডবিধির, দণ্ডবিধির ধারাগুলো ছাই মনেও আসে না।'

'আসবে কি করে?' ডাঃ ল্যাং হাতের অস্ত্রটা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'মাথায় তো কিছু নেই, পুরোটাই তো কাউ ডাং? তা না হলে আসল কাজ পড়ে রইল আর উনি গোঁফ বাগিয়ে অ্যারেস্ট অ্যারেস্ট করে তখন থেকে-মোস্ট ডিস্টার্বিং। চল নবেন্দু।' ডাঃ ল্যাং খুব সহজ ভাবেই এগোতে চাইলেন। চাইলে কি হবে। সেই অশান্তি। এইবার অফিসার ভদ্রলোক একটু লম্ফঝম্ফ করে এগিয়ে এলেন। 'সাহস বেড়ে গেল, তাই না মিস্টার অফিসার? তা হলে মজাটা এইবার দেখুন।' ডাক্তার তাঁর অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলেন। অফিসার হঠাৎ বেগ সম্বরণ করতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলেন, নবেন্দু ধরে সামলে দিল। নবেন্দুরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। প্রকৃতিই বিরক্তিকর ব্যাপার। নবেন্দু বললে, 'একে কোনো রকমে অ্যারেস্ট করা যায় না। তখন থেকে পায়ে পায়ে বেড়ালের মত ঘুরছে।' ডাঃ ল্যাং বললেন, 'ঠিক বলেছ নবেন্দু, উৎপাত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভেবেছিলুম, খেটে খাওয়া মানুষ, বিপাকে ফেলব না, তা বেশি বিড়বিড় করলে আমি কি করব? দিতেই হবে এক ডোজ ভরে। তারপর-তারপর, উঃ ভাবা যায় না!'

'কি হবে তারপর?' অফিসার তাঁর গর্তে ঢোকা চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, 'মরে যাবো।'

'মরে গেলে তো বেঁচেই গেলেন। তবে এ জিনিস মরে না, দগ্ধে দগ্ধে শেষ করে দেয়! যতদিন বাঁচবেন জ্বলে পুড়ে যাবেন।' ডাক্তার মুখটাকে ভয়াবহ করে শেষ পরিণতিটা জানালেন। 'জিনিসটা কি? বেশ দেখতে কিন্তু!' পুলিশ অফিসার ছেলেমানুষের মত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। 'এর নাম জেট ইঞ্জেক্টার। চোখের পাতা পড়ার আগে এক ডোজ ঢুকে যাবে উপরের হাতে। একটা মোক্ষম প্রেপারেশান। দেখতে দেখতে চামড়াটা কালো হয়ে যাবে। ভেতর থেকে ধীরে ধীরে পুড়তে থাকবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সারা শরীর জড়িয়ে পাকিয়ে ফিকে গোলাপী ধোঁইয়া বেরোচ্ছে। পাটের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলবে।'

'তাই নাকি!' একটা লোক যে এত এত দৌড়াতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না? অফিসার পলকে প্লাটফর্মের কোণে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ডাঃ ল্যাং হো হো করে হসে বললেন, 'বীর পুরুষ। পুরুষসিংহও বলা যেতে পারে। যাক নাও কোস্ট ইজ ক্লিয়ার। তটভূমি এখন অবরোধমুক্ত। চল দেখি, আমার সাঙ্গো-পাঙ্গোদের উদ্ধার করার চেষ্টা করি।'

প্রফুল্লদা কখন বেডিংয়ের সুখাসন ছেড়ে উঠে এসেছেন লক্ষ্য করিনি। ল্যাঙ সাহেবের কাছে এসে বললেন, 'জিনিসটা কি?' 'জিনিসটা?' প্রশ্নটা ডাক্তার যেন নিজেকেই করলেন। 'জিনিসটা হল'-প্রফুল্লদা কিছু বোঝার আগেই তাঁর বাহুমূলে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। যন্ত্রটা ছিক করে একটা আওয়াজ করে খানিকটা তরল পদার্থ প্রফুল্লদার শরীরে ভরে দিল। পরেশ দাঁড়িয়ে ছিল পাশে, তারও ওই এক হাল হল। নবেন্দু এবার গর্জে উঠল, 'এটা কি হল ডকটর ল্যাং? যে বিষ আপনি পুলিশের শরীরে ভরে দিতে ভয় পাচ্ছিলেন সেই বিষ ঢুকিয়ে দিলেন এদের শরীরে!' নবেন্দু ভাবতেও পারেনি যে, ডক্টর ল্যাং নবেন্দুকেও বাদ দেবেন না। নিমেষে নবেন্দুর হাতেও ডকটর ফুঁড়ে দিলেন। প্রফুল্লদা বোধ হয় ঘটনার আকস্মিকতায় একটু কাবু হয়ে পড়েছিলেন, এইবার হাতা গুটিয়ে এগিয়ে এলেন, 'মরার আগে মেরে যাবো। দেখি কতবড় ডাক্তার তুমি।' ডাক্তার মিটি মিটি হেসে বললেন, 'তোমাকে মারলুম কে বললে? তোমাকে, তোমার এইসব চেলাদের বাঁচালুম বলতে পার।'

প্রফুল্লদা একে রাগী মানুষ তার আবার শরীরে অসীম ক্ষমতা। ডাঃ ল্যাঙের মত কৃশকায় একজন মানুষকে দু হাতে মাথার ওপর তুলে দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া কিছুই নয়। আমরাও তাই চাইছিলুম। ভদ্রলোকের জন্যে আমরা ট্রেন ফেল করেছি। সারা স্টেশনের মানুষ উদ্ব্যস্ত; হোক, হয়ে যাক একটা হেস্তনেস্ত। তা ছাড়া ভদ্রলোক আমাদের বিনা কারণে আক্রমণ করেছেন। শরীরে মারাত্মক একটা কি জানি কি বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। প্রদুল্লদা বাঘের মত এগিয়ে আসছেন। এইবার ডাঃ ল্যাঙের দফা রফা। এইবার থানা পুলিশ না হয়ে যায় না। যাচ্ছিলুম, মধুপুরে। এইবার ডাঃ ল্যাংকে মেরে দলবল সমেত যাব হাজতে। তবে পুলিশও বহুত রেগে আছে। প্রফুল্লদার প্যাঁচ আমাদের জানা আছে। ঝাঁ করে লাফিয়ে পড়বেন বিদ্যুৎগতিতে। ডাঃ ল্যাং কিন্তু এতটুকু ভীত নন। মুখে অদ্ভুত একটা মৃদু হাসি। হাসি যেন বলতে চাইছে, আসছ এস, দেখি তোমার কেরামতি।

প্রফুল্লদা বাঘের মত লাফিয়ে উঠলেন। ডাঃ ল্যাং আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই করলেন না। শুধু ডান হাতের তর্জনিটা একটু প্রফুল্লদার গায়ে আলতো ঠেকিয়ে দিলেন। ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হল। গরম লোহা জলে ডোবালে যেমন শব্দ হয়। একটু ধোঁয়া মত বেরোলো। বাপ বলে একটা শব্দ করে প্রফুল্লদা চিৎপাত হয়ে প্লাটফর্মে শুয়ে পড়লেন। কোনো সাড়াও নেই শব্দও নেই। কি যে হল, ব্যাপারটা বোঝা গেল না। ডাঃ ল্যাং মুখে ওকটু চুকচুক শব্দ করে বললেন-'আহা বেচারা।'

আমরা সকলে প্রফুল্লদার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লুম। বেঁচে আছেন না মারা গেছেন বোঝা যাচ্ছে না। পরেশ ফিস ফিস করে বলল, 'ডেড'। নবেন্দু উঠে দাঁড়াল। 'এ আপনি কি করলেন-মার্ডার?' ডাঃ ল্যাং পাইপ ধরাতে ধরাতে খুব শান্ত গলায় বললেন, 'যাঃ, ছুঁচো মেরে কেউ হাত গন্ধকরে! নাড়ীটা দেখ না।' নবেন্দু আবার নিচু হয়ে প্রফুল্লদার কবজিটা দু আঙুল তুলে নিল। ডাঃ ল্যাং চিমনির মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বুঝছো? নবেন্দু আবার উঠে দাঁড়াল, 'বেঁচে আছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি হল?' পাইপ চিবোতে চিবোতে ডাঃ বললেন, 'কিছু না। বড্ড লম্ফঝম্ফ করছিল। ঠিক পছন্দ হল না। বেশী ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই আমার ভীষণ খারাপ লাগে! তাই একটু লো ভোলটেজ চালিয়ে দিলুম।'

'লো ভোলটেজ মানে?'

'ইলেকট্রিসিটি।' ঘড়ি দেখতে দেখতে ডাঃ ল্যাং উত্তর দিলেন।

'ইলেকট্রিসিটি কোথা থেকে পেলেন?' আমরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম।

'কেন, আমার আঙুল। ইচ্ছে করলে আমার সব ক'টা আঙুল কন্ডাকটার করে ফেলতে পারি। একবার দেখবে নাকি?'

'না না', নবেন্দু প্রফুল্লদার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করেই বলল। 'কিন্তু বিদ্যুতের উৎসটা কি? আপনি কি শরীরের মধ্যে ব্যাটারি লুকিয়ে রেখেছেন নাকি?'

'ব্যাটারি পাব কোথায়, প্রয়োজনই বা কি?'

'তবে?' পরেশ খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

ডাঃ ল্যাং লোহার একটা সরু শিক দিয়ে পাইপের মুখে খোঁচা মারতে মারতে বললেন, 'তোমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। একটু লেখাপড়া কর-না কেন?'

নবেন্দু একটু প্রতিবাদের গলায় বলল-'লেখাপড়ায় আমরা খুব একটা খারাপ নই, বুঝেছেন? শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ সম্পর্কে কিছু জ্ঞানও রাখি, কিন্তু আঙুলের ডগা থেকে বিদ্যুৎ বের করে মানুষ ঘায়েল করার কৌশল এই প্রথম দেখলুম; কিন্তু কায়দাটা বুঝলুম না।'

'জল-বিদ্যুতের কথা শুনেছো? Hydro-electricity?'

'শুনেছি।' সমস্বরে আমরা জানালুম।

'গতিশীল জল বাধা পেলে, কোনো কিছুতে ধাক্কা খেলে, জল-তরঙ্গের গতি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। করে কিনা?'

'হ্যাঁ, করে।'

'বেশ, এইবার শোনা আমার আশ্চর্য আবিষ্কার। তোমার আমার সকলের শরীরে রক্ত বয়ে চলেছে। যেমন করে নদীতে জল প্রবাহিত হয়। রক্তের একটা গতিবেগ আছে। এই রক্তপ্রবাহের মধ্যে আমি সূক্ষ্ম কায়দায় একটা ছোট্ট টারবাইন বসিয়ে রেখেছি। সেটা ঘুরছে, অনবরত ঘুরছে। পাশেই আছে একটা জেনারেটার, এইবার আমার আঙুলটা দেখ।' ডাঃ ল্যাং তর্জনিটা তুলে দেখালেন। নবেন্দু হাত দিতে ইতস্তত করছিল, শক খাবার ভয়ে। ডাঃ ল্যাং আশ্বাস দিলেন, 'ভয় নেই। পাওয়ার হাউস বন্ধ আছে।'

নবেন্দু আঙুলটা হাত দিয়ে দেখল। ডাঃ ল্যাং বললেন, 'বুঝলে কিছু?'

'কি যেন একটা লাগানো রয়েছে।'

'দ্যাটস রাইট। পাতলা একটা তামার চাদর। কন্‌ডাক্টার।

এই কন্‌ডাকটারের মধ্যেই দিয়েই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।'

'এখন কিভাবে আপনি প্রবাহ বন্ধ করলেন?'

'তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই হিটার বা ইস্ত্রি আছে। মাঝে মাঝে হয়তো দেখেছো, যেই সুইচ অন করলে ফট্‌ করে একটা শব্দ হয়ে একটু আগুন ছিটকে লাইনটা ফিউজ হয়ে গেল।'

পরেশ খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই সকালে আমার সেই ঘটনা ঘটেছে। জামাটা আর ইস্ত্রিই করা হল না। কলারটা কি রকম কুঁচকে আছে।' পরেশ খুঁত খুঁত করতে লাগল।

ডাঃ ল্যাং বললেন, 'তোমাদের বডিগার্ডের গায়ে হাত ঠেকানো মাত্রই সেই ঘটনা ঘটল। তোমরা একটা আওয়াজ শুনেছো, একটু ধোঁয়াও হয়তো দেখেছো। পজেটিভ, নেগেটিভ এক হয়ে আমার ফিউজ উড়ে গেছে।'

'ফিউজ উড়ে গেছে মানে?' আমরা সবাই ঝুঁকে পড়লুম।

ডাঃ ল্যাং বাঁ হাতের কবজির ঘড়িটা দেখালেন। মোটা, মানে সাধারণ ঘড়ির ব্যাণ্ডের চেয়ে চওড়া একটা অদ্ভুত ধরনের কালো ব্যাণ্ড খাপ হয়ে বসে আছে। ঘড়িটাও অদ্ভুত দেখতে। কালো ডায়াল। বারোটা বেজে পনের মিনিট হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। সেণ্টার সেকেণ্ডের কাঁটাটা একটু বেশি চকচকে। কাঁটাটা ঘুরছে না। ছত্রিশ সেকেণ্ডে স্থির হয়ে আছে।

'বুঝলে কিছু?' ডাঃ ল্যাং মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন। আমরা বোকার মত ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'কিছুই বুঝিনি।'

'এই ঘড়িটার সঙ্গে ফিউজ লাগানো আছে। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা দেখেছো তো?'

আমরা সমস্বরে বললুম, 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'বারোটা বেজে পনের মিনিট ছত্রিশ সেকেণ্ডে তোমাদের ওই কমরেড কাত হয়েছে। এখন ফিউজটা ঘড়িটা আবার চলতে শুরু করবে।

'ফিউজ লাগাবেন না?'

'লাগাবো একটু পরে।'

রক্তপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ, ব্যাপারটা যেন অবিশ্বাস্য। নবেন্দু একটু খুঁত খুঁত করে বলল, 'আমি আপনার থিওরিটা আর একটু ভাল করে বুঝতে চাই।'

'ভেরি গুড।' ডাঃ ল্যাং এতোগুলো উৎসাহী ছাত্র পেয়ে বেশ খুশি হলেন। 'বোঝাবো বোঝাবো, তার আগে তোমাদের এই ফ্রেণ্ডকে একটু চাঙ্গা করে তুলি।' ডাঃ ল্যাং প্রফুল্লদার উপর ঝুঁকে পড়লেন। ট্রাউজারের হিপ পকেট থেকে লম্বা চকচকে একটা লোহার মত যন্ত্র বের করে প্রফুল্লদার হার্টের উপর কিছুক্ষণ ধরে রাখতেই, প্রফুল্লদা চোখ খুললেন। ডাঃ ল্যাং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ফাইন। নাও উঠে বস। আর কখনো এই রকম হঠকারিতা কোরো না। জেনে রাখো, বিজ্ঞানীরা অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী।'

প্রফুল্লদা উঠে বসে চোখ পিট পিট করে বললেন, 'একটা বিড়ি খাবো।'

'নো, নো নাও। একটু পরে। আগে এক কাপ গরম কফি খাবে, তারপর ধূমপান।'

ডাক্তারের একটা হাত আমার কাঁধে আর একটা হাত নবেন্দুর। দলবল এগিয়ে চলল কফি কর্ণারের দিকে। প্রফুল্লদার পা দুটো যেন একটু টলছে। মুখটা বিমর্ষ। বড্ড হেরে গেছেন। 'গিনিপিগ উদ্ধারের কি হবে?' ডাক্তার ল্যাং নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, 'হবে, হবে, ফার্স্ট কফি, তারপর পিগই বল আর গিনিপিগই বল, যা হয় একটা কিছু হবে।'

কফি খানায় ডাঃ ল্যাং

পরেশটা আবার কফি ভালবাসে না। পোড়া পোড়া গন্ধ লাগে। এক চুমুক খেয়েই পেয়ালা নামিয়ে রেখেছে। মুখটা করুণ। যেন তাকে ভীষণ সাজা দেওয়া হয়েছে। প্রফুল্লদা ডবল স্পীডে খেয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে পরেশের না খাওয়া কাপের দিকে তাকাচ্ছেন। মনের খুব ইচ্ছে নিজেরটা শেষ করে ওটাও শেষ করে ফেলেন। কেউ একবার বললেই নিজের মনের ইচ্ছেটা তিনি কাজে করে ফেলবেন, এই আর কি।

ডাঃ ল্যাং আবার তাঁর পাইপ নিয়ে পড়েছেন। কী ভীষণ জিনিস। সারাদিনের বারোটা ঘণ্টাই এই পাইপ নিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। খোঁচাখুঁচি করে। তামাক ভরে। কিংবা বারে বারে দেশলাই দিয়ে ধরাবার চেষ্টা করে। পাইপে তামাক ভরতে ভরতে ডাক্তার একবার আড়চোখে আমাদের দেখে নিলেন। বেশ দেখতে ডাঃ ল্যাংকে। সরু উঁচু পাতলা নাক। অসম্ভব ঘন কালো চুলে কপালের প্রায় আধখানা ঢাকা। টকটকে ফর্সা রং। বলে না দিলে সাহেব বলেই ভুল হতে পারে। বিজ্ঞানীদের এত সুন্দর চেহারা খুব কম দেখা যায়। আমাদের ক্লাসের বিজ্ঞানের স্যারের মত নয়। মাথা জোড়া বিশাল টাক। কুচকুচে কালো রঙ। ইয়া মোটা মোটা হাত। হাত নয়তো, থাবা। ডাঃ ল্যাঙের আঙুলগুলো কী সুন্দর! লম্বা লম্বা সরু সরু।

ডাক্তার কফিতে চুমুক দিলেন। আমরা সবাই চুপ করে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছি। কী অদ্ভুত মানুষ! অপরেশ কানে কানে বললে, 'মানুষ নয়তো, চলমান জেনারেটার। সঙ্গে বিদ্যুৎ নিয়ে ঘোরেন।' অপরেশ ফিস ফিস করে বলেছিল। ডাঃ ল্যাং কিন্তু শুনে ফেলেছেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন-'ফ্রেণ্ডস, আমরা সবাই জেনারেটার। কেউ জানে, কেউ জানে না। মানুষ যদি নিজের কলকব্জার খবর রাখত, তাহলে প্রতিটি মানুষই অসীম শক্তির অধিকারী হতে পারত। আমরা সকলেই এক একটি অদ্ভুত শক্তিশালী যন্ত্র। আমরা রেডিও, আমরা টিভি, আমরা জেট প্লেন, আমরা কমপিউটার, আমরা আণবিক বোমা। পৃথিবীর জানা অজানা সমস্ত মেশিনের সমন্বয়।'

প্রফুল্লদা আর থাকতে পারলেন না, বলেই ফেললেন, পরেশের কফিটা আমি...'

'ও সিওর'-ডাঃ ল্যাং দাঁতে পাইপ চেপে অনুমতি দিলেন। প্রফুল্লদা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালেন। হাতটা এখনো অল্প অল্প কাঁপছে। 'আর একটু পরে তুমি আর এক কাপ কফি খাবে।' পাইপটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে ডাঃ ল্যাং আর এক কাপ কফি মঞ্জুর করলেন।

'ওই বিদ্যুতের ব্যাপারটা'-নবেন্দু আর ধৈর্য ধরতে না পেরে বলেই ফেলল। ডাঃ ল্যাং ধোঁয়া ছাড়লেন। মুখটা ধোঁইয়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাত দিয়ে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বললেন, 'হার্টের ফাংশান, আই মিন হৃদযন্ত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তোমাদের আছে নিশ্চয়ই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আছে।'

'অল রাইট, তাহলে বুঝতে পারবে। এই আমার হাতের মুঠোর মত ছোট্ট এতটুকু একটা হৃদয়ের ক্ষমতা কিন্তু বিশাল। এই খুলছে এই মুড়ছে। এই সংকুচিত হচ্ছে আবার বেড়ে যাচ্ছে বা প্রসারিত হচ্ছে। সংকোচন আড় প্রসারণ। লাব্ ডুব লাব্ ডুব। সারাদিন ধরে তোমাদের শরীরে এই পাম্প চলছে। ওয়েটার!' -ডাঃ ল্যাং ওয়েটারকে ডেকে আবার ফকির অর্ডার দিলেন?

পরেশ বললে-'আমি না।'

'নাবালক'-ডাঃ ল্যাং সস্নেহে হাসলনে। হাসার সময় চোখ দুটো একটু ছোট হল।-'এই পাম্প প্রতিদিন ন থেকে দশ টন রক্ত পাম্প করে। প্রতিবারে শরীরের সমস্ত রক্তের একশো ভাগের এক ভাগ ঠেলে 'এওর্টার' মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেখান থেকে বাঁধ-ভাঙা নদীর গতিতে এই রক্ত আমাদের শরীরের মাইলের পর মাইল দীর্ঘ শিরা উপশিরার মধ্যে কুল কুল করে প্রবাহিত হচ্ছে। কোনো ধারণা আছে? আমাদের শিরা-উপশিরা একসঙ্গে যোগ কশলে দৈর্ঘ্যে কত মাইল হবে?'

পাইপ মুখে দিয়ে ডাক্তার আমাদের দিকে তাকালেন। আমরা সকলেই চুপ। পরেশ হঠাৎ বলে ফেলল-'কুড়ি গজ।'

'ইজ ইট? তুমি নবেন্দু?' -ডাঃ ল্যাং নবেন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন। নবেন্দু একটু ইতস্তত করে বলল-'এক মাইল।'

'ওঃ হো, নো নো। ধারে কাছে গেল না। ইট ইজ সিক্সটি থাউজেণ্ড মাইলস। ৬০ হাজার মাইল। আমাদের শরীরে শাখা-প্রশাখা মিলিয়ে ৬০ হাজার মাইলের রক্তনদীর ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমাদের ভারতইবর্ষের যে কোনো দুটো রিভার সিস্টেমের চেয়ে বড়।'

আমরা সকলে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। নবেন্দু নিজের হাতটা চোখের সামনে তুলে বার কয়েক দেখল। এ যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার! আমাদের এই ক্ষুদ্র শরীরে প্রবাহিত গঙ্গা, প্রবাহিত সিন্ধু! বুকের বাঁ পাশে হাতের মুঠোয় আকারে একটি পাম্প রোজ ন থেকে দশ টণ্ড রক্ত পাম্প করে ৬০ হাজার মাইলের সুদীর্ঘ প্রবাহ-পথে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কী বিস্ময়! কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, চুমুক দেওয়ার কথা সকলেই যেন ভুলে গেছি।

'হার্টের ভালভটা কেমন জানো! ইট হ্যাজ থ্রী লিভস ট্র্যাঙ্গুলার ইন শেপ। ভালভটার তিনটে কপাট, ত্রিভুজের মত দেখতে। কলম আছে? দাও এঁকে দেখিয়ে দি।'

নবেন্দু ডট পেন আর পরেশ বুকপকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দিল। কাগজটার এক পিঠে একটা ঠিকানা লেখা, অন্য পিঠ সাদা। দাঁটে পাইপ চেপে ডাঃ ল্যাং বললেন, 'কার ঠিকানা?' পরেশ আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে আমাদের বাড়ির। মা লিখে দিয়েছেন।' 'হাউ ফানি। তোমার নিজের বাড়ির ঠিকানা মেমারিকে রাখতে পার না?' পরেশ একটু লজ্জা পেলেও তার ব্যাখ্যাটা শোনার মত।-'ঠিকানাটার উপর চোখ বোলান।' ডাঃ ল্যাং জোরে জোরে পড়লেন-'২৩৩/১৪/সি/১০/এইচ ৭৬/পি ৭, হোয়াট ইজ দিস? এ তো দেখছি কমপিউটারে ফিড করার মত একটা কোড নম্বর। কোথাকার ঠিকানা হে? চিঠিপত্তর আসে তো!' পরেশ দিগ্‌বিজয়ীর মত মুখ করে বলল, 'নতুন পিওন এলে প্রথম প্রথম চিঠিপত্তর আসে না। চিঠি না এলেও ক্ষতি নেই। মুশকিল ইলেকট্রিক বিল নিয়ে। বাবা তখন পোস্ট অফিসে গিয়ে পিওনকে একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে আবার চিঠি আসতে থাকে। পুরানো পিওন বদলির আগে বলে যায়- নতুন কে আসছেন, তাঁর নাম কি!'

হো হো করে ডাঃ ল্যাং হেসে উঠলেন, 'মাই গড! পৃথিবীটা কী ফানি প্লেস! মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিনই তার নতুন নতুন শিক্ষা হবে? পৃথিবীর পাঠশালাতে উই আর ইটারন্যাল স্টুডেণ্টস্।' ডাঃ ল্যাং কাগজের সাদা দিকটায় সুনিপুণ হাতে হার্ট আর ভালভের ছবি এঁকে ফেললেন। 'কাম হিয়ার।' সব ক'টা মাথা এগিয়ে এল। আমার মাথাটা নবেন্দুর সাথে ঢাঁই করে ঠুকে গেল। ঠুকে গেলেও আমাদের তখন অন্য কোনো লক্ষ্য নেই! নিজেদের শরীরের রহস্য জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

'ইয়ার ইজ ইওর হার্ট, ছবিটা টেবিলের উপর ফেলে, বাঁ হাতে কফির কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিলেন। 'হার্টের মেকানিজমটা আরো একটু বোঝার চেষ্টা কর। আমাদের হৃদয়ের চারটি প্রকোষ্ট। দুটো ঘরের দেওয়াল খুব পাতলা, এদের নাম অরিকল। আর দুটো ঘরের পেশী খুব শক্তিশালী, নাম ভেনট্রিকল। তার মানে হৃদইয় হল দুটি সহযোগী পাম্প। নাও সি'-ডাঃ ল্যাং ডট

পেনটা আবার হাতে তুলে নিলেন। এই দেখ দক্ষিণ হৃদয়-একটা অরিকল, একটা ভেনট্রিকল। আমাদের দেহের মোটা মোটা শিরা রক্তস্রোত বহন করে আনছে এই দক্ষিণ হৃদয়ে। দুটি বিশাল প্রবাহিত রক্তনদী, একটির নাম ইনফিরিয়র ভেনাকেভা অন্যটির নাম সুপরিয়র ভেনাকেভা, অবিশ্রান্ত ধারায় নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছে এই হৃদয়ের দক্ষিণের দুটি প্রকোষ্ঠে। কান পেতে শোনো, অনবরত কুল কুল শব্দ শুনতে পাবে।' ডাঃ ল্যাঙের চোখ দুটো হঠাৎ তীক্ষ্ণ থেকে কেমন যেন ভাবালু হয়ে উঠল, তোমরা জল-প্রপাত দেখেছো নিশ্চয়ই! হুড্রু, জুনা? হু হু করে জল ঝরে পড়ছে হাজার হাজার ফুট নিচে। গুম গুম শব্দ, পাথরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে মহাসংগীতের মত উর্ধ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। চার-দিকে সূক্ষ্ম জলকণা ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়ছে। হৃদয়ের এই দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে যদি তোমাদের বেড়াতে যাওয়ার সৌভাগ্য হতো, তোমরাও অবিকল ওই দৃশ্য দেখতে-চারদিকে লাল রক্তের স্রোত প্লাবনের নদীর মত ফুলে ফেঁপে এগিয়ে আসছে।' ডাঃ ল্যাং এক চুমুক কফি খেলেন। আমাদের কারুর মুখে কোনো কথা নেই। 'এইবার কি হচ্ছে?' হাতে ডট পেনটা তুলে নিলেন। 'দক্ষিণ হৃদয় পাম্প করে এর রক্তকে পাঠিয়ে দিচ্ছে লাংসে। এই দেখ ফ্রম হিয়ার টু দেয়ার।'

ডাঃ ল্যাং হঠাৎ ডট পেনটা ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমরা একটু ভয় পেলুম। কি হল কে জানে। আমাদের কারুর পা গায়ে লাগে নি তো! টেবিলের তলায় জোড়া জোড়া পা। ডক্টর হঠাৎ একটু হাসলেন। আমরাও হাসলুম। 'একটু খিদে খিদে পাচ্ছে, তাই না!' সমর্থনের আশায় আমাদের উদ্বিগ্ন মুখের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলেন। 'বেশীক্ষণ মাথার কাজ করলে আমার ভীষণ খিদে পায়।'

'আমারও'-পরেশ সোৎসাহে সমর্থন করল।

'দ্যাটস রাইট। হি ইজ মাই টাইপ। এই ছেলেটা বড় হলে আমার চেয়ে বড় সাইন্টিস্ট হবে। হোয়াট ইজ ইওর অ্যাড্রেস?' পরেশ তার বাড়ির নম্বরটা মনে করার চেষ্টা করে '২৩৩/১৪ বাই,বাই,' পরেশ বাই বাই করল দশ বারো বার। ডাঃ ল্যাং হাত তুলে বললেন, 'বাস্, বাস্ ফাটা রেকর্ডের মত বেজো না। ইউ নীড প্লেন্টি অফ প্রোটিন টু রিমেম্বার দ্যাট অ'ফুল নাম্বার। বয়!' তীক্ষ্ণ ডাকে বয় দৌড়ে এল-'কাটলেট ফর অল অফ আস। রাইট। হারি আপ।' পাইপটা নিভে গেছে! তবু ঠোঁটে লাগালেন। 'নাও সি বয়েজ। লাংসে গিয়ে রক্ত কি করছে? গেটিং প্লেন্টি অফ অক্সিজেন। তোমার প্রতিটি শ্বাসে ফুসফুস তাজা অক্সিজেন বায়ু থেকে নিচ্ছে। রক্তপ্রবাহ বুদ্‌বুদ্ করে উঠছে। রক্ত অক্সিজেন শুয়ে নিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দিচ্ছে। যেটা ফোঁস করে বেরিয়ে যাচ্ছে তোমার প্রশ্বাসের সঙ্গে। বাঁ দিকের হৃদয় ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্তের ধারা গ্রহণ করে পাম্প করে পাঠিয়ে দিচ্ছে ধমনীতে। তার মানে রক্তনদীর ধারা চলেছে এইভাবে।' ডাঃ ল্যাং ডট পেন দিয়ে কাগজে লিখলেন-

'ফ্লো অফ ব্লাডঃ দি গ্রেট ভেনস-রাইট আট্রিয়াম-রাইট ভেনট্রিকল-লাংস (ভায়া পালপোনারি আর্টারি) -লেফ্‌ট আট্রিয়াম (ভায়া দি পালমোনারি ভেন), লেফ্‌ট ভেন্‌ট্রিকল-অ্যাওর্টা (শরীরের সবচেয়ে বড় শিরা, মহানদী)। একে বলে রক্তপ্রবাহের ক্লোজড সার্কিট। শরীরের মধ্যে অনবরত প্রবাহিত এই স্রোতোধারা সরু, মোটা, নানা মাপের রক্তবাহিকা নালির মধ্যে অবিশ্রান্ত ছুটছে। প্রবাহের পথে বসে আছে হাতের মুঠোয় আকারের এই শক্তিশালী পাম্প, যার নাম হৃদয়। অ্যাণ্ড হিয়ার কামস আওয়ার কাটলেট।'

বয় টপাটপ ডিসগুলো আমাদের প্রত্যেকের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। অপূর্ব গন্ধে জিভে জল এসে যায়। দাঃ ল্যাং মরিচের পাত্রটা হাতে তুলে নিলেন। পরেশ আমার কানে কানে জিজ্ঞেস করলে-'এই হলদে মত জিনিসটা কি রে?' আমারও ঠিক জানা ছিল না। নবেন্দুকে প্রশ্নটা চালান করে দিলুম। উত্তর ঘুরে এল -মাস্টার্ড। একটু করে কাটো, মাস্টার্ডে ছোঁয়াও, আলতো গালে ফেলে দিয়ে একটু স্যালাড চালান করে দাও।'

'ডেললিসাস'। ডাঃ ল্যাং জ্বলজ্বলে চোখে মন্তব্য করলেন, দেয়ার ইজ নাথিং লাইক কাটলেট। কাটলেট না খেলে মানুষ সিভিলাইজড্ হয় না। আমার আবার এক ডজনের কমে মন ভয়ে না। দ্যাটস দি প্রবলেম। বয় বয়।' ডাঃ ল্যাং তারস্বরে চিৎকার শুরু করলেন, 'কাটলেটের কামড়ে আমার ধমনীর রক্তপ্রবাহের গতিবেগ বেড়ে গেল। আমার বিল্ট ইন জেনারেটারে এখন হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ খেলছে। প্রফুল্ল আর একবার হবে নাকি?' ডাঃ ল্যাং হাসতে লাগলেন। প্রফুল্লদার তখনো ঘোর কাটে নি। করুণ মুখে বললেন, 'আজকে কার মুখ দেখে উঠেছি জানি না। ঘণ্টা দুয়েক হয়ে গেল, হাওড়া স্টেশনেই আটকে আছি এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারবো কিনা জানি না।' ডাঃ ল্যাং বেশ তারিয় তারিয়ে কাটলেট খেতে খেতে বললেন, 'কার মুখ দেখেছো নবেন্দু, ঈশ্বরের নয়তো?'

নবেন্দু একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। চমকে উঠে বলল, 'ও হ্যাঁ, সে এক সাংঘাতিক লোক। নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।'

'ইজ ইট?' ডাঃ ল্যাং হাড়ের টুকরোটা ডিশে ফেলে দিলেন- 'হু ইজ হী? যার এত পাওয়ার! মাস্ট বি এ সায়েন্টিস্ট লাইক মি?'

'সে এক সুদখোর, বন্ধকী কারবার করে।' নবেন্দু নামটা আর করল না। আমার ঠোঁটের ডগায় নামটা এসে গিয়েছিল, কোনোক্রমে সামলে নিলাম।

'আমি আর এক কাপ কফি খাই, কেমন? ডোণ্ট মাইণ্ড। তোমাদের দুবার হয়েছে। নো মোর।'

'আমি আর এক কাপ খেতে পারি না ডাক্তারবাবু?' প্রফুল্লদার করুণ প্রার্থনা। 'ডাক্তার বাবু! দ্যাটস ফাইন। আমি তোমার ফিজিসিয়ান! নট ব্যাড। আচ্ছা স্যাংকসানড। বয়!' দু'কাপ কফির অর্ডার গেল। 'নাও বয়েজ, কাম হিয়ার। আর একটু বাকি আছে।'

আমাদের সব ক'টা মাথা আবার ঝুঁকে পড়ল কাগজের উপর।

'এইবার ভরা পেটে তোমাদের দুটো সাংঘাতিক ইংরেজী শব্দ শেখাবো।' ডান হাতের সরু সরু লম্বা দুটো আঙুল 'ভি'র মত করে ডাঃ ল্যাং আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আমাদের উৎসুক কয়েক জোড়া চোখ। 'শব্দ দুটোর একটা হল ডায়াস্টোল, আর একটা সিসটোল। বল, তুমি বল, রিপিট কর শব্দ দুটো, পরেশের অগ্নীপরীক্ষা। বোধ হয়, একটু অন্যমনস্ক ছিল পরেশ। আমতা আমতা করে বলল, 'কাশীর টোল আর শেরশাহের টোল।'

ডাঃ ল্যাং কিছুক্ষণ অবাক হয়ে পরেশের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ওরে আমার সোনার চাঁদ ছেলে রে! কি সেরিব্রাল পাওয়ার। নবেন্দু, তোমার দলে এরকম পাঁঠা আর ক'জন আছে? একে এখুনি কাটলেট করে খেয়ে ফেলা উচিত। গর্দভ। টোল শনলেই বেদের টোল, পণ্ডিতমশায়ের টোল, টুল বলে নি এই আমাদের ভাগ্য।' প্রফুল্লদা বললেন, 'ডায়াস্টোল সিসটোল।' ডাঃ হাসি-ছাসি মুখে প্রফুল্লদাকে বললেন- 'আ, হিয়ার ইজ মাই ব্রাইট ফ্রেণ্ড। আরে, তোমার মগজে দেখছি ওই ইডিয়েটটার চেয়ে বেশি গ্রে-মেটার আছে।' পরেশের মুখটা লজ্জায় লাল। হালভাঙা নাবিকের মত বললে, 'আমার মাথায় সহজে কিছু ঢুকতে চায় না।'

'ঢুকবে কি করে বাবা। তোমার মধ্যে ঢোকার যে একটি রাস্তা। মুখ দিয়ে উদরে। জ্ঞান জিনিসটা তো আর কাটলেট নয় যে, পরেশ বাবু ফর্কে গেঁথে বিট বাই বিট মাস্টার্ড মাখিয়ে খেয়ে ফেলবে! তোমার দাওয়াই আমার পকেটে আছে।' পরেশ হুমড়ি খেয়ে ডাঃ ল্যাংয়ের পা জড়িয়ে ধরে আর কি, 'আমাকে বাঁচান, অঙ্কে তিরিশ, ইংরেজী বত্রিশ, লাইফ সায়েন্স বাইশ।'

'স্প্লেনডিড। চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও। ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয়ে যায়। একদনি তোমারও হবে। ইহজন্মে কিংবা পরজন্মে।' পরেশ কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়ল, 'পরের বার এইরকম রেজাল্ট হলে বাবা বলেছেন, গম ভাঙার কলে লাগিয়ে দেবেন।'

'আ, এ ব্রাইট ফিউচার। কিন্তু সেখানেও যে হিসেব আছে বাবা, আচ্ছা নবেন্দু কি বলে? নবেন্দু, তোমার ফ্রেণ্ডকে একটু ইনটেলিজেণ্ট করে দেবো?' নবেন্দু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'করা যায় নাকি?' ডাঃ ল্যাং বললেন, 'যায় না বলে পৃথিবীতে কোনো শব্দ নেই। দেখবে যায় কি না?' ডাঃ ল্যাংয়ের কাছে ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। আর দেখাই গেছে, যে কোনো চ্যালেঞ্জ তাঁর চেহারা।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রূপোলী কৌটো বের করলেন। কৌটোটার একটা দিক চাপ দিতেই খুট করে ডালাটা খুলে গেল, ভেতরটা গাঢ় নীল। সারি সারি সাজানো সোনালী ট্যাবলেট। দু আঙুলে একটা ট্যাবলেট তুলে নিয়ে বললেন, 'ওয়ান ট্যাবলেট উইল ট্রান্সফর্ম ইউ। তোমার পার্সোন্যালিটি ভেঙে চুরমার করে, তোমার ভেতর থেকে আর একটা সেল্ফ বের করে আনবে। বাট মাইণ্ড ইট, তোমার স্বভাব কিন্তু একেবারে পাল্টে যাবে। তোমার খাই খাই ভাব কমে যাবে, ঘুম কমে যাবে, কথা বলার ইচ্ছে কমে যাবে।' পরেশ সোনালী ট্যাবলেটটা খাওয়ার জন্যে পাখির ছানার মত বারে বারে হাঁ করছিল। ডাক্তার তাকে নিরাশ করে ট্যাবলেটটা আবার কৌটায় ভরে রাখতে বললেন, 'তোমার অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া এটা আমি তোমাকে দিতে পারব না। এ খেলে মানুষের ক্যারেকটার চেঞ্জ হয়ে যায়।' পরেশ দুঃখ পেলে কি হবে? আমাদের খুব আনন্দ হল। একা পরেশ বুদ্ধিমান হয়ে যাবে, আর আমরা সব ক'টা যেমন ছিলুম তেমনি থাকবো! তা কি করে হয়!

'তোমাদের আর প্রশ্ন করব না, কি বলতে কি উত্তর দেবে; আমার কাটলেট খাওয়া মেজাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ডায়াস্টোল আর সিসটোল হল হৃৎস্পন্দনের দুটো পর্যায়। ডায়াস্টোল হল হার্টের বিশ্রামের সময়, যে সময় রক্ত আট্রিয়া থেকে ভেনট্রিকলে যায়। সিসটোলের সময় ভেন্ট্রিকল ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হয়। রক্ত তখন ফুসফুসের দিকে ছুটতে থাকে শিরা-উপশিরার দিকে। এই পর্যায়ে হৃদয়ের দুটো ভাগে স্পন্দন অদ্ভুতভাবে মিলে মিশে কাজ করে। ডায়াস্টোলের সময় হার্টের বাঁ এবং ডান প্রকোষ্ঠ হাত পা ছড়িয়ে এই আমার মত বসে থাকে। রিল্যাক্সড। আমার এখন ডায়াস্টোল। সিসটোলের সময় দুটোই সঙ্কুচিত হয়। ওই প্রফুল্লর গানের মত।' প্রফুল্লদা ঠিক সেই সময় বিড়ির ধোঁয়া টানছিলেন।

'পরেশ কিছু বুঝছে বলে মনে হয় না, তবু আমায় বলতে হবে, বলা যখন শুরু করেছি, কি বল নবেন্দু? না বন্ধ করবো? রহস্যটা রহস্যই থেকে যাক্, কি বল? আমার সিক্রেট।' ডাঃ ল্যাং উদাস উদাস মুখে তাকিয়ে রইলেন। আমরা হৈ হৈ করে উঠলুম, 'তা কি করে হয়? আমরা যে হাঁ করে আছি শোনার জন্যে।' 'তা হলে শোনো।' ডাঃ ল্যাং ডট পেন তুলে নিলেন হাতে, 'সারা জীবন, তোমরা যতদিন বাঁচবে, তোমাদের এই ছোট্ট হৃদয় নিয়মিত আপনি আপনি স্বয়ংচালিত ঘড়ির মত ধুকধুক করবে। যেদিন ইনি থামবেন সেদিন তোমার গণেশ উল্টে যাবে। শরীরের প্রয়োজন অনুসারে ঠিক যতটা রক্ত যখন যে সময়ে পাম্প করা উচিত তাই করবে। কি করে তা সম্ভব! কে সেই যন্ত্রী যে আমাদের হৃদয়ের কারখানায় সারা জীবন বসে বসে এর চলা নিয়ন্ত্রণ করছে! গোছা গোছা বিশেষ একধরনের টিসু বা তন্তু হার্টের মধ্যে এমন কায়দায় জড়ানো আছে যারা এই ঘড়ির কায়দায় হৃদয়ের স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করছে। দক্ষিণ আট্রিয়ামের উপর বসে আছে হার্টের 'পেসমেকার'। 'পেসমেকার' মানে কি পরেশ?' পরেশের বুদ্ধি খুলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'আজ্ঞে পেসকার? কোর্টে পাওয়া যায়। আমার পেসকার ছিলেন স্যার।'

ডাঃ ল্যাং, 'উরে বাবারে' বলে দুটো হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরলেন। পরেশ যেন গুলি করেছে। 'নাঃ, সোনালী ট্যাবলেট এই গবেটটাকে খাওয়াতেই হবে।' ডাঃ ল্যাং পাইপ খুঁচতে খুঁচতে বললেন, 'পেসমেকার মানে-যে চলার ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে। হার্টের পেসমেকারের নাম সাইনো-অরিকিউলার নোড। এই পেসমেকার প্রতি মিনিটে হার্টের স্পন্দন ৬০ থেকে ৯০ বারে ধরে রেখেছে। পরেশ নামটা একবার রিপিট করবে নাকি? না বাবা, দরকার নেই, এখুনি হয়তো বলে বসবে সাইনো সোভিয়েট প্যাক্ট। এই যে মিনিটে ৬০ থেকে ৯০ বারের স্পন্দন, এই স্পন্দন বাম এবং ডান আট্রিয়ার দেওয়াল বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, ফলে কি হচ্ছে,হার্টের সঙ্কোচন। এইবার আর একটা দাঁতভাঙা নাম বলি-ইণ্টার আট্রিয়াল সেপটাম। বাম এবং ডান আট্রিয়ার সীমানায় ইনি প্রহরী। প্রহরী কেন, আর এক যন্ত্রবিৎ, যিনি আর একটি স্পন্দনের ঢেউ তুলে রেখেছেন যার নাম রাখা হয়েছে এ ভি। বড় করে বললে এট্রিয়ো ভেনট্রিকিউলার নোড। এই এ ভি আবার স্পন্দনটাকে রিলে করে দিচ্ছে দুটো ভেন্ট্রিকলের গা বেয়ে, যার ফল ভেন্ট্রিকল দুটোয় একইভাবে সঙ্কুচিত হচ্ছে। হৃদয় তাই ময়ুরের মত নাচছে কিনা জানি না, তবে গান গাইছে লাবডুব লাবডুব। হার্টকে আমাদের যেন সিসটেম নাচাতে পারে, হৃদয়হীন কিংবা হৃদয়বান করে তুলতে পারে, তিনি বসে আছেন এই ব্রেন সেণ্টারে। পরেশেরও আছে। আমরা বলি না-ভয়ে বুক কেঁপে গেল, আনন্দে তিড়িক তিড়িক করে নেচে উঠল, গর্বে দশহাত হল! এসব অনুভূতি-রাজ্যের জিনিস। ব্রেনের এইসব অনুভূতি দুটি আলাদা রাস্তায় ব্রেন থেকে হৃদয়ে নেমে আসে। একটি পথ-ধর ন্যাশনাল হাইওয়ে-১-যার নাম সিমপ্যাথেটিক পাথওয়েস, ব্রেন থেকে হার্টে এসেছে। এই রাস্তায় যে অনুভূতি আসে তা আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। আর এন এইচ দুই, যার নাম প্যারা সিমপ্যাথেটিক পাথওয়েস, সেই রাস্তাএসেছে মেরুদণ্ড থেকে হৃদয়ে। দুঃখ, ভয়, আনন্দ এইসব অনুভূতি ব্রেন থেকে সোজা এই দু'রাস্তায় হৃদয়ে নেমে এসে তার স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে। বুঝলে কিছু? ঘোড়ার ডিম বুঝেছো।'

ডাঃ ল্যাং আর একবার পাইপ ধরালেন। 'এইবার তোমাদের আর্টারির কথা বলবো, কিন্তু তার আগে, ডোণ্ট মাইণ্ড, এক কাপ কফির অর্ডার দি। বক বক করে গলা শুকিয়ে গেছে। বয় বয়!' ডাক্তার কফির অর্ডার ছিলেন। 'রক্ত, বুঝলে নবেন্দু, এয়োর্টা দিয়ে হার্ট থেকে বেরিয়ে আসে কলকলিয়ে, আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় ধমনী। কৃষ্ণা, কাবেরী কিংবা গঙ্গা। আমর দেহের উপরের খোলসটা যদি ছাড়িয়ে ফেল, তাহলে তোমাদের কি মনে হবে জানো? -আমি যেন একটা গাছ। অসংখ্য শিরা-উপশিরার শাখা-প্রশাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সবচেয়ে বড় ধমনীর প্রবাহপথে হৃদয় ত্যাগ করে রক্তের নদী হার্ট থেকে যত দূরে যাচ্ছে, ততই ছোট ছোট শাখা নদীতে ঢুকে পড়ছে। যে সংকোচনকে আমরা সিসটোলিক বলছি, সেই চাপে রক্ত ছুটছে ধমনীতে, শিরা-উপশিরায়, সমস্ত দেহকাণ্ডে। কবজির কাছে নাড়ীতে আঙুল ছোঁয়ালে যে স্পন্দন আমরা অনুভব করি সেইটাই হল হার্টের সিসটোলিক কনট্রাকশান বা আমরা সাধারণভাবে যাকে বলি পাল্স। দাঁড়াও, এইবার একটু ককি খাই। আয়্যাম ড্যাম থার্স্টি।'

কফি খেতে খেতে ডাঃ ল্যাংয়ের পেটটা যেন কফির ট্যাঙ্ক হয়ে গেল। বিজ্ঞানীদের ব্যাপারই আলাদা। 'এইবার শোনো, এই যে আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে থাকা আর্টারি, এ তোমার জলের পাইপের মত শুধু রক্ত বহন করে না, এদের আবার কিছু নিজস্ব ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা। এই আর্টারি রক্তের প্রবাহ সারা শরীরে বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেসব আর্টারি বা ধমনী বেশ মোটা তাদের ভেতরের দেওয়ালে আছে ইল্যাসটিক টিসু। হার্টের সিসটোলিক সংকোচনে যেই রক্তের প্রবাহ বাড়ে অমনি এই ইল্যাসটিক টিসুর আবরণে আবৃত আর্টারি প্রসারিত হয়ে সেই বাড়তি রক্তধারা প্রবাহের পথ করে দেয়। আবার ডায়াস্টোলের সময় স্বাভাবিক হয়ে যায়। একবার ফুলছে আবার পরক্ষণেই কুঁচকে যাচ্ছে।

'সরু ধমনীর ভেতরের দেওয়ালের মসৃণ পেশীরও কিছু কাজ আছে। তুমি অলস বসে থাকতে পার হাত পা ছড়িয়ে কিন্তু তোমার শরীরের ভেতরের সিসটেম বসে নেই। সবসময়ে তারা নিজেদের কাজ করে চলেছে। আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর স্বয়ংক্রিয় শাখার অতি সূক্ষ্ম লেজগুলো এই মসৃণ পেশী-দেওয়ালে লেপ্টে আছে। এদের বলে আর্টারিয়োল, বেশ সোরগোলের জিনিস। এরা আমাদের সতর্ক প্রহরী। আমাদের শরীরের ভেতরের কাজকর্মের সঙ্গে আপনা আপনি সঙ্গতি বজায় রেখে চলেছে। আমাদের স্নায়ুর চাহিদা অনুসারে এইসব আর্টারিয়োল বেড়ে গিয়ে কিংবা কমে দিয়ে শরীরের যে অংশে যেমন রক্তের প্রয়োজন তা পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এরা সব গ্রেট ম্যানেজার।'

ডাঃ ল্যাং কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা খালি করলেন। ডান হাত দিয়ে মাথায় চুল ঠিক করলেন। হাতের ঝকঝকে রিস্ট ব্যাণ্ড আলোয় ঝলসে উঠল, যেখানে আছে তাঁর বিদ্যুৎশক্তির উৎস।'

'ঈল' বলে একরকম মাছ আছে জানো? সিল নয় কিন্তু, 'ঈল'।

আমাদের মধ্যে নবেন্দুর পড়াশোনাই বেশি। জানেও অনেক। সহজে ঠকে না। নবেন্দু বললে, 'ঈল মাছ হল সামুদ্রিক বান মাছ। গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এদের সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এদের চাল-চলন জন্ম-বৃত্তান্ত সবকিছুই রহস্যাবৃত ছিল। এখন অবশ্য এদের সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছুই জেনেছে। আরো জানার চেষ্টা চলছে।'

'স্প্লেনডিড।' ডাঃ ল্যাং হাসি-হাসি মুখে নবেন্দুর পিঠ চাপড়ে দিলেন। 'ঠিক বলেছ। ঈল হল জীবজগতের বিস্ময়। ভূমধ্য-সাগরের নাবিকরা একসময় যখনই ঈল ধরতো, দেখতো সব মাছই বড়। ছোটো মাছ কিংবা মাছের ডিম কখনই তাদের জালে পড়ত না। তারা অবাক হয়ে ভাবত, ঈলের তাহলে কি বাচ্চা হয় না? এরা কি ডিম পাড়ে না? কিন্তু আমি তোমাদের হঠাৎ ঈল মাছের কথা বলছি কেন? কেন বলছি পরেশ?'

পরেশ বোকার মত একটু হাসল। ডাঃ ল্যাং বড় বড় চোখ করে প্রশ্নটা আবার করলেন। তিনি উত্তর চান। চুপ করে থাকলে চলবে না। অথচ পরেশ ঠেকে শিখেছে, যা জানে না তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা মানেই, ডাঃ ল্যাঙের উপহাসে চুপসে যাওয়া। পরেশ বুদ্ধিমানের মত বললে, 'ঠিক জানি না।'

'গুড'। ডাক্তার বললেন, 'ভেরি গুড। যা-তা বলার চেষ্টা করনি এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এই ঈল মাছেদের মধ্যে এক ধরনের ঈল আছে যাদের বলে ইলেকট্রিক ঈল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটা গল্প শোনো।' ডাক্তার পাইপ ধরাবার জন্য একটু চুপ করলেন। পরেশ হাঁউ করে বিশাল একটা হাই তুলল।ডাক্তার আড়চখে তাকিয়ে বললেন, 'হোয়াট ইজ দ্যাট? ঈলের কথা শুনে তুমি দেখছি শীলের মত হাই তুলছো। তোমার বুঝি শুনতে ভাল লাগছে না। দেন আই স্টপ হিয়ার।'

আমরা সকলে হৈ হৈ করে উঠলুম, 'না-না, আপনি বলুন, আপনি বলুন।' পরেশটার মাথায় খটাস করে একটা গাঁট্টা মারতে ইচ্ছে করছিল। ডাঃ ল্যাং একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'দেন আই বিগীন।' আমরা সবাই সোজা হয়ে বসলুম।

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একদল যুদ্ধ-ঘোড়া ইওরোপের একটা অগভীর নদী সাঁতরে পার হচ্ছিল। যুদ্ধসম্ভার নিয়ে যাচ্ছিল আর কি। দেখা গেল এক একটা ঘোড়া জলে নেমেই যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছে। চিঁ হিঁ হিঁ করে চিৎকার করে উঠছে। মহা বিপদ, ব্যাপারটা কি? মেজর জেনারেল এগিয়ে এলেন, "লেট মি সি, লেট মি সি।" স্বচ্ছ কাচের মত জল। অজস্র ঈল্ মাছ সাপের মত কিলবিল করছে। কী আর এমন বড় মাছ। লম্বায় এক একটা তিরিশ বত্রিশ ইঞ্চির বড় হবে না। যে সমস্ত ঘোড়া যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছে তাদের পায়ের কাছে এক একটা ঈল এসেই ছিটকে সরে সরে যাচ্ছে। ওইটুকু মাছের কী এমন দাঁতের ধার, কী এমন কামড় যে, শক্তিশালী

অত বড় বড় ঘোড়া কাবু হয়ে পড়ছে! গবেষণার বিষয় অবশ্যই। দেখা গেল কামড় নয়, সামান্য স্পর্শেই ঘোড়া কাবু। লেজ আর মুড়ো একসঙ্গে ঠেকলেই ঘোড়া যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠছে। ভঙ্গীটা অনেকটা সাপের ছোবলের মত। স্বচ্ছ ঈল মাছ চলে এল বিজ্ঞানীদের গবেষণার টেবিলে। একদল বিশেষজ্ঞ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। দেখা গেল সেই কাচের মত স্বচ্ছ ঈলের মেরুদণ্ডের দুপাশে সারি সারি সাজানো রয়েছে অণুর মত ছোট ছোট কোষ। মাইক্রোস্কোপিক। দেখতে গোলাকার। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সারি সারি চলে গেছে। এই অণুকোষগুলিই হল তড়িৎ কোষ। মেরুদণ্ডের এক পাশটি হল পজিটিভ পোল অন্য পাশটি হল নেগেটিভ। ধনাত্মক আর ঋণাত্মক। এরাই হল ইলেকট্রিক ঈল।

'কোনো কোনো ইলেকট্রিক ঈল ইচ্ছে করলে ৫০০ ভোল্টের মত ডিরেক্ট কারেণ্ট উৎপাদন করতে পারে নিমেষে, অক্লেশে। এখন একটা তুলনামূলক তথ্য দিলেই তোমরা বুঝতে পারবে এই বৈদ্যুতিক মাছের বিদ্যুৎ শক্তি কতখানি। সাধারণ রাসায়নিক তড়িৎ কোষ ১.১ থেকে ২.১ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তৈরি করতে পারে। ড্যানিয়েল সেল ১.১ ভোল্ট, লীক্লানসে সেল ১.৫ ভোল্ট, সঞ্চয়ক কোষ বা স্টোরেজ সেল, যা মোটর গাড়িতে থাকে ২.১ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যৎ উৎপাদন করতে পারে। আর ইলেকট্রিক ঈল্ ৫০০ ভোল্ট! ফ্যানটাস্টিক, কি বল? ফ্যানটাস্টিক।' ডাঃ ল্যাং আপন মনে হাসতে লাগলেন। পাইপটাকে উল্টো করে টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে তিনি যেন অন্য জগতে চলে গেলেন। আমরা যেন তাঁর সামনে নেই। শুধু নির্জন দুপুরে কাঠঠোকরা পাখির ঠোঁটের শব্দের মত শব্দ হচ্ছে ঠক ঠক ঠক ঠক।

এক সময় তাঁর তন্ময়তা কেটে গেল। আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যেন এইমাত্র দেখা হল। কোনো প্রশ্ন করার সাহস হল না। নিজে থেকে যখন শুরু করবেন তখন করবেন। ধৈর্যই আমাদের মূলধন। ডাক্তার পাইপটা ধরাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পাইপের মুখে আগুন দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। একরাশ ধোঁয়ার তাঁর মুখ চাপা পড়ে গেল অল্প সময়ের জন্যে। ধোঁয়া সরে গিয়ে তাঁর মুখ স্পষ্ট হতেই তিনি আবার শুরু করলেন।

'বুঝলে নবেন্দু, আমিও একটি বৈদ্যুতিক মানুষ, ইলেকট্রিক ম্যান। ঈল মাছের কায়দাতেই আমি ডিরেকট কারেণ্ট তৈরি করছি। ঈল মাছের মেরুদণ্ডের দুপাশে সাজানো তড়িৎ কোষ খুলে বিজ্ঞানীরা আঠার মত চটচটে একধরনের পদার্থ পেয়েছেন। এই জেলিই মাছের প্রাণ-তরঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে বলে অনুমান। আমার শরীরেও আমি অস্ত্রোপচার করে অণু-তড়িৎ-কোষ প্রধান রক্তবাহী নালীর দুপাশে সাজিয়ে রেখেছি। আমার এই দুটো আঙুলের একটা ধনাত্মক, পজিটিভ পোল; অন্যটা ঋণাত্মক, নেগেটিভ পোল। ধাবমান রক্তের প্রচণ্ড বেগ ও উত্তাপে ওই সব কোষে বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে এই দুটো আঙুলের মাথায় এসে জমছে। দুটো আঙুল এক করে যাকে আমি স্পর্শ করব তার অবস্থা হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ওই ঘোড়ার মত। যন্ত্রণায় ছিটকে পড়ে যাবে। মরবে না, সারা শরীর তার অবশ হয়ে পড়বে।'

ডাক্তার আবার অন্য জগতে চলে গেলেন। চোখ বুজিয়ে চেয়ার পিঠ এলিয়ে দিয়েছেন। ঠোঁটের ডগায় পাইপ ঝুলছে। সরু ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আমরা সকলে উন্মুখ শ্রোতা। ডাক্তার তাঁর সেই অন্য জগৎ থেকে ভারি গলায় বললেন, 'এই আমার বুকের বাঁদিকে সেই শক্তির উৎস, আমার হৃৎপিণ্ড, আমাদের হার্ট। পানের মত ছোট্ট এতটুকু একটা পেশীময় আকৃতি। ধমনীর এক প্রান্ত দিয়ে হু হু করে লাল রক্তের স্রোত বয়ে আনছে। এক প্রকোষ্ঠ থেকে আর এক প্রকোষ্ঠে, সেখানে রয়েছে বহু অশ্বশক্তিসম্পন্ন একটা পাম্প। সেই পাম্প প্রচণ্ড চাপে সমস্ত রক্ত ঠেলে দিচ্ছে শরীরের গোদাবরীতে, কৃষ্ণা, কাবেরীতে। শরীরের সমস্ত সেচ ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী ছোটো ছোটো শাখায় সেই ধারাকে প্রবাহিত করে দিচ্ছে। তাই আমরা সফলা, সুফলা, সবুজ, তরুণ, যৌবনের জোয়ার। এই তো, কান পেতে শোনো, অনবরত শব্দ করে পাম্প চলেছে। সেই রক্তনদীর স্রোতের মাঝখানে বসিয়ে রেখেছি আমার নিজের হাতের তৈরি ছোট্ট একটা টারবাইন। ঘুরছে, ঘুরছে সেই টারবাইন। তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ চলে আসছে আমার কৃত্রিম কোষে, আমার একাধিক পাওয়ার হাউসে। হাঃ হাঃ, আমি এক সচল বিদ্যুৎ কেন্দ্র।' ডাক্তার হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসলেন।

আমরা একটু চমকে উঠলুম। সত্যি ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলুম। সাংঘাতিক মানুষকে বিশ্বাস নেই। গায়ে এতটুকু আঙুল ছুঁইয়ে দিলেই আমরা কাত। ডাক্তারের চোখে উদার হাসির ঝিলিক, মনে হচ্ছে যেন মিশনারী ফাদার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নাও বয়েজ, লেট আস বিগিন আওয়ার একসপিডিশান নাম্বার টু। অপারেশন গিনিপিগ।' নবেন্দুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার সেই গিনিপিগ। যারা এতক্ষণ সারা স্টেশনে ছড়িয়ে পড়েছে। মাই পুওর অ্যানিমেলস।'

কফিখানা ছেড়ে আবার আমরা স্টেশনে। লোক ছুটছে। মানুষের মাথায় মাল ছুটছে। বিশাল ঘড়ির কাঁটা আটকে আছে বারোটার

ঘরে। মাইকে গলার প্রতিধ্বনি। 'আওয়ার নেকসট ট্রেন ফর পাঞ্জাব।' এতক্ষণ যেন আমরা অন্য জগতে ছিলাম। রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মত একটা ঘুম দিয় ২২শে মের সকাল বারোটার কলকাতা অথবা হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জেগে উঠেছি।

পরেশ হঠাৎ নিচু হয়ে একটা ফলের ঝুড়ি উল্টে দিল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কি যেন খুঁজছে। কোমরে দুহাত রেকে ডাক্তার বললেন, 'কি হল পরেশবাবু। মোহর নাকি।' হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে পরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বোকার মত হেসে বললে, 'নেই।'

-'কি নেই?'

-'গিনিপিগ।'

-মাই গড! তুমি কি ভেবেছিলে ওরা তোমার জন্যে ওর তলায় অপেক্ষা করে বসে আছে! হাও ফানি মাই বয়।'

পরেশ হন্তদন্ত হয়ে আর একদিকে ছুটছিল। ডাক্তার খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললেন, 'নো নো, মাই বয়।' ওভাবে নয়। সবকিছুরই একটা মেথড আছে। অ্যাণ্ড হোয়াট ইজ দ্যাট?

আমরা ডাক্তারকে ঘিরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সত্যিই তো। কোথায় তারা আছে। কিভাবে আছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বিশাল এই স্টেশনে তারা ছড়িয়ে গেছে? হোয়াট ইজ দি মেথড?

মেথড! আমরা সকলে মেথডের অপেক্ষায় গিনিপিগ ধরা ভুলে ডাঃ ল্যাং-এর চার পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। প্রকাণ্ড স্টেশনের কোথায় কে ঘাপটি মেরে বসে আছে কে জানে। একমাত্র ভগবান ছাড়া কারুর ক্ষমতা নেই সহজে তাদের উদ্ধার করে।

নবেন্দু বললেঃ 'মেথডটা বলুন।' ডাক্তার ল্যাং হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন, 'আর দু মিনিট অপেক্ষা কর। ডোণ্ট মুভ। যে যেখানে আছ সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। লেট আস প্রে ফর দেম।' ডাক্তার নিচু হয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে উত্তরমুখো পায়ের কাছে বসিয়ে রাখলেন। খুবই রহস্যজনক ব্যাপার। ব্যস্ত স্টেশনে মালপত্র, লোকজন চারপাশ দিয়ে স্রোতের মত হু হু করে ছুটে চলেছে আর আমরা একটা দল স্থির হয়ে পেঙ্গুইন পাখির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে আমরা ক'জন কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুতে দু মিনিট নীরবতা পালন করছি যেন।

হঠাৎ সাদা মত একটা কি ঝড়ের বেগে খাঁচায় ঢুকে গেল। প্রথমে মনে হয়েছিল বন্দুকের নলের মুখ থেকে বুঝি ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছিটকে এল। দেখতে দেখতে আর একটা, তারপর আবার একটা। পটাপট একের পর এক খাঁচায় এসে ঢুকছে ঝড়ের বেগে। ঢুকেই লুটিয়ে পড়ছে অবশ হয়ে। নবেন্দু চুপ করে থাকতে না পেরে বলেই ফেলল, 'কি রে বাবা, ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি!' ডাক্তার নবেন্দুর পিঠে আদরের হাত রেখে বললেন, অনেকটা তাই। প্রকৃতির শক্তি আর সাধারণ নিয়ম-কানুনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারলেই তুমি ভৌতিক শক্তির অধিকারী হবে। যেমন ধর, এই মুহূর্তে আমি যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি জয় করে গ্যাস বেলুনের মত আকাশে ভাসতে থাকি, তুমি ভাবতে আমি ভূত হয়ে গেছি। আমি যদি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যাই, তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। ভেবো না এসব একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ভূতে যা পারে মানুষও তা পারে। তবে হ্যাঁ সাধনা চাই শিক্ষা চাই। কথা বলতে বলতে ডাক্তার নিচু হয়ে খাঁচাটা দেখতে লাগলেন। গুনে-গেঁথে বললেন, 'ওয়ান শর্ট। আর এক ব্যাটা গেল কোথায়?'

প্রফুল্লদা বললেন, 'একটা যে কুকুরের পেটে গেছে।'

'দ্যাট স রাইট, থ্যাঙ্ক ইউ মাই ফ্রেণ্ড।' ডাক্তার খাঁচার দরজাটা বন্ধকরে সোজা হলেন আর ঠিক সেই মুহূর্তে সারা স্টেশন কাঁপিয়ে একটা কুকুর ঘাঁউ ঘাঁউ করে ডেকে উঠল। বিশাল একটা অ্যালসেশিয়ান আমাদের দিকে তেড়ে আসছে, পেছনে চেন ধরে ঘষটাতে ঘষটাতে আসছেন কুকুরের মালিক। সামাল সামাল রব উঠেছে চারিদিকে! কুলিরা মাল ফেলে পালাচ্ছে। যাত্রীরা ভয়ে এ ওর ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। খাঁচার সামনে এসে কুকুর শান্ত হল।

ডাক্তার বললেন, 'এসেছিল। দে, আমার মাল বের করে দে। খাবার সময় মনে ছিল না, কান ধরে টেনে আনবো!' ক্ষতবিক্ষত মনিবের দিকে তাকিয়ে 'বললেন, 'কি, কতদূর থেকে টেনে নিয়ে এল? খুব তো বোলচাল মেরেছিলেন তখন, এখন সামলান ঠ্যালা।'

ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে জামা-কাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'মশাই সবে স্টেশন থেকে বেরিয়ে শিবপুরের দিকে পা বাড়িয়েছি, কুকুরটা বেশ যাচ্ছিল সামনে সামনে, হঠাৎ কি হল-চনমন চনমন করে উঠল কয়েকবার, কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল, এদিক ওদিক তাকাল, ফোঁস ফোঁস করে মাটি শুঁকলো কয়েকবার। তারপর উল্টো দিকে মারল এক হ্যাঁচকা টান। তৈরি ছিলুম না তো, উল্টে পড়ে গেলুম। ভাগ্যিস চেনটা ছেড়ে যায় নি হাত থেকে। কোন রকমে উঠলুম। সামলানো যায় এত বড় কুকুর! সেই থেকে হিড় হিড় করে টেনে আনছে। রাসকেল কুকুর, অদ্যাই তোর শেষ রজনী।' ভদ্রলোক রেগে গিয়ে কুকুরকে জুতো পেটা করতে যাচ্ছিলেন। ডাক্তার থামিয়ে দিলেন, 'করছেন কি! কুকুর কিংবা মানুষ কারুকেই মারধোর করা উচিত নয়। দ্যাট্স ভেরি ব্যাড। শিক্ষা দেওয়ার ওটা ঠিক রাস্তা নয়। তাছাড়া কুকুরের তো দোষ নেই। দোষ ওর আহারের। পুওর ক্রীচার! লোভে পড়ে সেই গিনিপিগ খেয়ে মহা বিপদে পড়েছে। গিনিপিগ হজম হয়ে যাবে, হজম হবে না হাই ফ্রিকোয়েনসি রিসিভিং সেটটা। যতদিন ওটা পেটে থাকবে ততদিন ওকে ছটফট করতে হবে।'

ভদ্রলোক প্রায় আঁতকে উঠলেন, অ্যাঁ, বলেন কী! রেডিও খেয়ে ফেলেছে! রেডিও কি খাবার জিনিস? শুনেছি ছাগলে কি না খায়! কুকুরেও কি তাই!'

ডাক্তার বললেন, 'রেডিও খাবো বলে খেয়েছে বললে ওই মূক জন্তুটিকে প্রতি অবিচার করা হবে। আসলে আপনার কুকুর গিনিপিগের ক্যাপসুলে একটি ছোট সেট গিলে ফেলেছে। চিবিয়ে ফেললে অসুবিধে ছিল না। গিলে ফেলায় সেটটির কর্মশক্তি অটুট আছে এবং দীর্ঘকাল তাই থাকবে। এবং-' ডাক্তার এই এবং দিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করলেন যার অর্থ-বোঝো বাছা কত ধানে কত চাল!

ভদ্রলোক করুণ মুখে ডাক্তারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, 'একটা কিন্তু ভাল হবে। সারাদিন ঘেউ ঘেউ না করে হাঁ করলেই বিবিধ ভারতী বেরোবে। কি মজা, কি মজা।' কুকুরের মালিকের শিশুর মত আনন্দ দেখে পরেশ আহ্লাদে আটখানা। থকতে না পেরে বলেই ফেললে, 'কুকুরটা আপনার বহুব্রীহি সমাস হয়ে গেল, কুকুরও যে রেডিওও সে, ইজ ইকোয়াল টু রেডিও কুকুর বা কুকুর রেডিও।' নবেন্দু পরেশের পাণ্ডিত্য থামিয়ে দিল।

আমার মত নবেন্দুর মাথাতেও নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। কিভাবে গিনিপিগগুলো ফিরে এল আপনা আপনি, কুকুরটাই বা দৌড়ে এল কেন? বুদ্ধি দিয়ে তো এর ব্যাখ্যা করা চলে না। পায়েড পাইপার অফ হ্যামলিনে অবশ্য পড়েছি, বাঁশী বাজিয়ে সমস্ত ইঁদুর বের করে আনার কথা। সেখানে সুর ছিল, সুরের আকর্ষণ ছিল, কিন্তু এখানে? শব্দ নেই, সুর নেই, চুপচাপ আমরা শোক প্রস্তাব নেওয়ার ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম আর চোখের সামনে ঘটে গেল অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! নবেন্দু প্রশ্নটা চেপে রাখতে পারল না। 'কি করে কি করলেন আমাদের একটু বুঝিয়ে দিন!'

ডাক্তার ডানহাতের একটা আঙুল উঁচু করে বললেন, 'বলব, বলব, সময় মত সব বলব; তার আগে এই কুকুরটা বিদায় করি। তা না হলে এই কুকুরও আমাদের নিয়ে যেতে হবে নবেন্দু।'

'নিয়ে যাবেন,' কুকুরের মালিক যেন হাতে চাঁদ পেলেন। 'বেশ তো, বেশ তো, যান না নিয়ে, এই চেন আর বগলস সুদ্ধই নিয়ে

যান, আমার কোনো আপত্তি নেই। এই প্যাকেটটাও আমি ফ্রী দিয়ে দিচ্ছি।' ভদ্রলোক পকেট থেকে ডগবিস্কুটের একটা প্যাকেট বের করলেন। কুকুরকে শান্ত করার জন্যে এইমাত্র হয়তো কিনেছিলেন। ডাক্তার ল্যাংকে ছেলে ভোলাবার মত করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দামড়া একটা অ্যালসেশিয়ান গছাতে চান আর কি।

ডাক্তার বললেন, 'কোন প্রয়োজন নেই, আপনার কুকুর আপনারই থাকবে। আমার সংগ্রহে পঁচাত্তর রকমের দুশো একটা কুকুর আছে। কয়েক বছরের মধ্যেই চারশো চারটে হবে। আমার কুকুর নিবাসে আপনার এই আনট্রেণ্ড কুকুর চলবে না।'

'মাই গড'! ভদ্রলোক বড় বড় চোখ করে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'টু হাণ্ড্রেড ওয়ান অ্যাণ্ড ফোর হাণ্ড্রেড ফোর!' তারপর হালভাঙা নাবিকের মত করুণ অসহায় গলায় বললেন, 'একে নিয়ে যাবো কি করে, থেবড়ে বসে আছে খাঁচার সামনে। একে সামলাবো কী ভাবে!'

'সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। ডোণ্ট ওয়ারি। সুড়সুড় করে মুষিকের মত এই বিটকেল কুকুর আপনার পেছন বাড়ি চলে যাবে।' ডাক্তার এই কথা বলতে বলতে কোটের ডান পকেট থেকে ছোট্ট একটা স্প্রেয়ার শিশি বের করলেন। শিশিটা দেখে ভদ্রলোক একটু ভয় পেলেন মনে হল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ডাক্তার সিঁ সিঁ করে খানিকটা আরক ভদ্রলোকের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। অদ্ভুত একটা গন্ধ সেণ্টের সুবাস নয়। কেমন যেন একটা গন্ধ একটা কুকুর-কুকুর গন্ধ।

'একি করলেন?' ভদ্রলোকের অভিযোগের গলা।

'কিছুই করিনি, কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে কুকুর করে দিলুম।

ডাক্তার অমায়িক হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন, 'নাও ইউ আর এ ডগ, স্বভাবে নয়, গন্ধে। শত চেষ্টা করলেও স্বভাবে কুকুর হতে পারবেন না। কুকুরের মত অত গুণ মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যান, এবার আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যান। বাট বি কেয়ারফুল।'

'কেন, কেয়ারফুল হতে বলছেন কেন?'

'কেয়ারফুল হতে হবে এই কারণে, রাস্তায় নিশ্চয়ই আরো অনেক কুকুর আছে!'

'তা নেই! শিবপুরের রাস্তায় নেড়ীকুকুরের ছড়াছড়ি। অনবরতই লটাপটি ঝগড়া।'

'তবেই বুঝছেন কেন সাবধান হতে বলছি। মানুষ যেমন চোখ দিয়ে মানুষ চেনে, কুকুর চেনে ঘ্রাণ দিয়ে। নবেন্দু, সেই ছড়াটা কি? নবেন্দু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'রতনে রতন চেনে ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু।' ডাক্তার বললেন, 'তোমার আই কিউ তো খুব ভাল, ভেরি গুড। তোমার এই ছড়াটাকে একটু অন্যরকম করে দিই কেমন? কুকুরে কুকুর চেনে, ভৃত্য চেনে মনিব। পরেশ, ইংরেজী কর দেখি!'

পরেশ এতক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে একঝুড়ি কলার দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প ঢোঁক গিলছিল, চমকে ফিরে তাকাল হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেছে! আসলে মনে মনে পরেশ কলা খাচ্ছিল। প্রশ্নটা পরেশের কানেই ঢোকেনি। ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এতক্ষণ ছিলে কোথায়, কোন্ জগতে শুনি?'

'ও ছিল কলার জগতে'-না বলে পারলুম না।

'কলা? মানে আর্ট?' ডাক্তার বেশ অবাক হলেন।

'মানে প্ল্যানটেন, ওই যে ঝুড়িতে, বড় বড় সবুজ।'

'আই সি, আই সি, ব্যানানা, বেবুন লাইক ইনস্টিংকট।' ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠলেন। 'যাক, ইংরেজীতে আর দরকার নেই, খুব হয়েছে, নাও লেট আস মুভ।' ডাক্তার গিনিপিগের খাঁচাটা হাতে তুলে নিলেন। সামনে জিভ বের করে বসে থাকা অতবড়

একটা কুকরকে একটু ও ভয় করলেন না।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে আমি!'

'আপনিও এবার বাড়িমুখো। একটু সাবধান, আপনার সামনে সামনে চলবে আপনার কুকুর, পেছন পেছন আরো গোটকতক অনুসরণ করতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে কামড়াকামড়ি করতে পারে। ভয়ের কি আছে? হাসপাতাল আছে, তলপেটে ইনজেকশনের ব্যবস্থা আছে। নিয়ে নেবেন চোদ্দটা কি চব্বিশটা।' দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে ডাক্তার হন হন করে এগিয়ে চললেন ইয়ার্ডের দিকে। ডাক্তার যখন বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছেন নবেন্দু চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা, আমরা তা হলে যাই।'

'তোমরা, তোমরা আমার অতিথি হতে পার।' ডাক্তার পা দুটো অল্প ফাঁক করে আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন, 'চলে এস, চলে এস, কাম অন মাই বয়েজ। ইয়ার্ডে অপেক্ষা করছে আমার সেলুন কোচ, প্রচুর জায়গা, প্রচুর খাবার, অনেক বিস্ময়, অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তর।'

প্রফুল্লদা ফিসফিস করে বললেন, 'অচেনা লোকের সঙ্গে যাবে খোকাবাবু! লোকটা বড় সাংঘাতিক। কি বলতে কি করে দেবে।' প্রফুল্লদা এত আস্তে আস্তে বললেন-অতদূর থেকে এই ব্যস্ত কলরবময় প্লাটফর্মে ডাক্তারের শুনতে পাওয়ার কথা নয়। ডাক্তার কিন্তু হাত নেড়ে বললেন, 'আর অচেনা নেই। অনেকক্ষণ আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে। লোক আমি সাংঘাতিক, তবে ছেলেধরা নই; আমি এক বিজ্ঞানী। নবেন্দু, আসতে চাও তো চলে এস তোমার দলবল নিয়ে। তোমরা না অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে বেরিয়েছো?' ডাক্তার মিলিটারী কায়দায় ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা সোজা পা ফেলে এগিয়ে চললেন।

নবেন্দু বললে, 'আমি যাবই। তোমার ভয় থাকলে বাড়ি ফিরে যেতে পার।' অত দূরে ডাক্তার অথচ কানের পাশে গুনগুনে মাছির মত গলা শুনলুমঃ 'এই তো চাই, সাবাস নবেন্দু। উপনিষদে পড়েছো না, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" দুর্বল হলে, ভীরু হলে জীবনের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না।'

খাতার পাতায় যেমন পাশাপাশি অজস্র লাইন থাকে হাওড়ার রেল ইয়ার্ডে ঠিক সেইভাবে পাশাপাশি পাতা আছে ইস্পাতের সরলরেখা, বাঁকা রেখা। পরেশের খাতার জ্যামিতির হিজিবিজির মত। মাঝে মাঝে রোদে ঝলসে উঠছে। সময় সময় আপনা-আপনিই লাইনে লাইনে খটখটাস করে জোড়া লেগে যাচ্ছে, ছেড়ে যাচ্ছে। কী যে সব কাণ্ড হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। দূর থেকে দেখতে ভালই লাগে। মাঝে মাঝে এক একটা লাইন ধরে এক একটা বগি আপন মনে নিরুদ্দেশে চলেছে।

ডাঃ ল্যাং উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে লাইনে নামলেন। জোড়া রেল লাইন পেরোতেই বুক কেঁপে যায় আর এ তো জোড়া জোড়া লাইন। আমাদের দিকে না তাকিয়েই পেছন দিকে হাত নেড়ে বললেন, 'কাম অন বয়েজ।' নবেন্দুর দেখাদেখি আমরাও পটাপট লাফ মারলুম। পরেশটা ভয়ে দোনামনা করছে।

'কী রে আয়? যাবি না?'

'যদি কাটা পড়ি!'

'পড়লে আমরা সবাই একসঙ্গে পড়বো। ভাবিসনি, ঝাঁপিয়ে পড়। ভাবলেই মরিব। টকা-টক লাইন পেরিয়ে চলে আয়। ওই দেখ ওরা কত দূর চলে গেছে।'

শুকনো মুখে পরেশ একবার তাকিয়ে দেখল। লাল একটা বগি দূরে আপন মনে গড়িয়ে চলেছে। সাঁতার না জানা ছেলের মত পরেশ ইয়ার্ডে লাফিয়ে পড়ল। এপাশে ওপাশে ছোটো ছোটো কেবিন। দোতলাটা কাচের। জাহাজের কাপ্তেনের ঘরের মত। বুক পর্যন্ত একটি করে লোক কি কলকাঠি নেড়ে চলেছে! সারাদিন লাইনে লাইনে জোড়া লাগানোর খেলা। দূরে একটা ট্রেন ঢুকছে। কেন্নোর মত গুটিগুটি এঁকে বেঁকে। কোন্ লাইনে আসবে কে জানে! ডাঃ ল্যাংই আমাদের ভরসা, আমাদের গাইড। জোড়া জোড়া লাইনের মাঝে মাঝে ঘাসে ঢাকা জমি। মাটির ফুটখানেক উপর দিয়ে সারি সারি তার চলে গেছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই ল্যাং খেয়ে আছড়ে মরতে হবে। পরেশ আর একটু হলেই পড়ে মরছিল। আমার কাঁধে ভর রেখে সামলে গেল।

একটু দূরেই একটা সাদা ধবধবে বগি দাঁড়িয়ে। চারপাশে নীল সুন্দর বর্ডার। সমস্ত জানালার শাটার বন্ধ। কাচের গায়ে ঝাপসা হয়ে আছে যেন ভোরের কুয়াশা। মনে হল, ডাঃ ল্যাং ওই দিকেই চলেছেন। উনি যে কত দ্রুত হাঁটতে পারেন! এক ফুট দেড় ফুট উঁচু তারের রেখা শিশুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছেন। কিছুই না যেন, খেলা। নীল বর্ডার দেওয়া ধবধবে সাদা বগিটা যেন রহস্যের মত ইস্পাতের ঝকঝকে জোড়া লাইনে অক্ষরের মত দাঁড়িয়ে। ভেতরে হিম কুয়াশা! প্রফুল্লদা আরো একবার ফিসফিস করে বললেন, 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকচে না হে। বগিটার রং দেখেছো! এই রকম রঙের বাক্সে বরফের চাঙড়ার উপর মৃতদেহ শুইয়ে রাখে। আমি বহুদিন স্বপ্নে এই রকম গাড়ি দেখেছি। ভেতরে বরফের গুহা, বিশাল একটা সাদা ভাল্লুক নখ আঁচড়ে আঁচড়ে একটা শরীরের খানিকটা পা বের করে ফেলেছে। পা-টা মোমের মত সাদা।'

প্রফুল্লদার কথা শুনে পরেশ লাইনের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ছুটে পালাতে যাচ্ছিল ভয়ে। প্রফুল্লদা খপ করে হাত চেপে ধরলেন। আর ঠিক সেই সময় পাশের লাইন দিয়ে একটা দূর পাল্লার ট্রেন দিক্-বিদিক কাঁপিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। হাওয়ার ঝাপটায় চুল পোশাক এলোমেলো হয়ে গেল। ডাঃ ল্যাং তিরস্কারের গলায় বললেন, 'মানুষ ভয়েই মরে, বুঝলে পরেশচন্দ্র। ভয়টা কিসের শুনি?' পরেশ নিজেকে বাঁচাবার জন্য বেমালুম বলে দিল, প্রফুল্লদা বললেন, 'ওই সাদা বগিটার মধ্যে বরফের চাঙড়ায় ডেড বডি শোয়ানো আছে।'

ডাঃ ল্যাং হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই পকেট থেকে সিগারেট বাক্সের মত ছোট্ট একটা বাক্স বের করলেন। বাক্সটার গায়ে টেলিফোন ডায়ালের মত ছোটো একটা গোল চাকা লাগানো। চাকাটা বার কতক ঘোরালেন। সঙ্গে সঙ্গে বগিটায় ঢোকার দরজা চিচিং ফাঁকের মত দু পাশে শব্দ করে সরে গেল। সেই ভীষণ গরমেও একটা হিম ঠাণ্ডা বেরিয়ে এসে আমাদের কাঁপিয়ে দিল।

সাইবেরিয়ার ভালুক

কেটে রাখা রেলের কামরার ভেতরটা নীল, ভোরের কুয়াশা ঢাকা আকাশের মত ঝাপসা। দরজা খুলে যেতেই কে একজন দু পাশে হেলে দুলে এগিয়ে এল। বিশাল দরজা জোড়া চেহারা। কে রে বাবা! কোনো পালোয়ান নাকি! ডাঃ ল্যাং বললেন, 'আলি, মিট মাই ফ্রেণ্ডস।' আলির মুখে এই মোটা একাট চুরুট। গল গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গায়ে যেন একটা সাদা ফারের কোট পা পর্যন্ত নেমে এসেছে। আলি হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। সামনেই নবেন্দু। তাকেই আগে শেকহ্যাণ্ড করতে হবে। ওই হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে ভয় হওয়ারই কথা। কালো ভালুক রাস্তায় দেখেছি ভালুক নাচ ওয়ালা যখন নাচাতো। এ একেবারে সাদা। নবেন্দু হাতে হাত মেলালো। আলি চুরুট মুখেই হুম হুম করে দু বার শব্দ করল। চিড়িয়াখানায় শিমপ্যাঞ্জিকে চুরুট খেতে দেখেছি। ভালুকও চুরুট খায়! গ্যালোস দিয়ে প্যাণ্ট পরে! দু পায়ে দাঁড়ায়! এমন ঘটনা সার্কাসেও দেখিনি। ভালুকের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে ভেবে পরেশ আমাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। 'তোরা আমাকে বাড়ী রেখে আসবি চল। ওর সঙ্গে এক কামরায় যাওয়ার মানে জানিস তুই! এক এক খাবলা করে আমাদের সব ক'টাকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। ওরে আমি বাঁচতে চাই। বিশ্বাস কর, এবার থেকে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করব।'

আমাকে কিছু বলতে হল না। ডাক্তার পরেশের কাঁধের হাত রেখে বললেন, 'আবার ভয়! জানো, সাইবেরিয়ার এই আলির স্বভাব মানুষের চেয়ে অনেক ভাল। অনেকটা দেবতার মত। মাছ, মাংস, ডিম ছোঁয় না। মধু, দুধ, ফল, ভেজিটেবিল খায়। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে চুরুট খায়, গান শোনে। মাঝে মাঝে আইসক্রিম খায়। সময় সময় একটু নাচে। গেট ইন বয়েজ! আর মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে। তারপর মেন লাইনের ট্রেনের সঙ্গে এই বগি জুড়ে যাবে। তারপর? তারপর বলতে পার কি হবে নবেন্দু?'

নবেন্দু বললে, 'যাত্রা হবে শুরু।'

আমরা একে একে সেই শীতল সুন্দর ঘরে ঢুকে পড়লুম। ইতিমধ্যে ডাক্তার আমাদের গরম জামা পরিয়ে দিয়েছেন। কোথা থেকে একটা সিঁ সিঁ শব্দ বেরোচ্ছে। আলি আরাম-কেদারায় বসে আছে। মনে হচ্ছে পরেশের দিদিমা শীতের দুপুরে গায়ে সাদা কম্বল জড়িয়ে দেশের দাওয়ায় বসে ফোকলা মুখে পরেশের মার থেঁতো করে দেওয়া পান চিবোচ্ছেন আয়েস করে।

আলি

আমরা সবাই বেশ গুটিসুটি বসেছি। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। ডোরাকাটা একটা ক্যাম্প-চেয়ারে আলি বসেছে। শিমপ্যাঞ্জি মানুষের মত অনেক কিছু করে শুনেছি, ভাল্লুক যে তার উপরে যায়, না দেখলে বিশ্বাস হতো না। সারা কামরায় গোল চৌকো হরেক রকমের কাচের পাত্র। প্রত্যেকটা পাত্রেই নানা ধরনের প্রাণী। কয়েক রকম সাপ, বিষাক্ত বিছে, যেমনি লাল তেমনি চওড়া, গিরগিটি, টিকটিকি। এক গাদা খাঁচা। খাঁচায় পাখি আছে, কাঠবেড়ালীর মত অদ্ভুত সুন্দর এক ধরনের প্রাণী, গায়ে সিল্কের জামা! সত্যি কথা বলতে কি, বেশ ভয় ভয় করছে। সাপ আর বিছেরা যদি হঠাৎ বেরিয়ে আসে কাচের জার ভেঙে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।

পরেশ ফিস ফিস করে বললে, 'ভীষণ শীত করছে রে।'

-'শীত করছে?' ডাক্তার অপরাধীর মত মুখ করে বললেন।

-'তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, তাই না! আমার কিন্তু শীত করছে না।'

আলি ভরাট গলায় হেসে উঠলো। ভাবখানা এই-রে বালক, এই তোদের মুরোদ! এই শীতেই শীত।

ডাক্তার বললেন-'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমাদের গরম করে দিচ্ছি। ওয়ান, টু, থ্রী। তোমাদের ঘাম বের করে ছেড়ে দিচ্ছি। সব চোখ বোজাও।'

আমরা ভয়ে ভয়ে চোখ বোজালুম। ঘাড়ের কাছে মনে হল ছোট্ট একটা লাল পিঁপড়ে কামড়ালো যেন। সমস্ত শরীরটা মনে হল চাবুকের ঘায়ে জ্বলে উঠলো। ভয়ে চোখ খুলে ফেললুম-'একি করলেন? একি করলেন আপনি!

ডাক্তার অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠলেন। যেন ইস্পাতের ঠোঁটের ঠোকাঠুকিতে হাসিটা বেরিয়ে এল! লোকটি কী নিষ্ঠুর। আমাদের কি মানুষ গিনিপিগের মত ব্যবহার করতে চান! আমরা কী ধরা দিয়ে ভুল করেছি! প্রফুল্লদার কথাই কি তাহলে ঠিক! পরেশ গরমে উফ্ উফ্ করতে করতে সোয়েটার খুলে ফেলেছে।

নবেন্দু সন্দেহের চোখে ডাক্তারের দিকে তাকাচ্ছে। মনে হয়, আমি যা ভাবছি নবেন্দুও তাই ভাবছে।

ডাক্তার গৌতম বুদ্ধের ভঙ্গিতে ডান হাতের চেটোটা তুলে বললেন -'মাভৈঃ। আমি কিছু করিনি শুধু- ডাক্তার শুধু বলে রহস্যজনকভাবে চুপ করে গেলেন। নবেন্দু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শুধু কি।'

ডাক্তারের চোখ দুটোয় দুষ্টুমি। -'শুধু কি! বলবেন তো! নবেন্দুর তাগাদা।

শুধু এইটা তোমাদের ঘাড়ের কাছে একটা শিরায় পুট করে একটু ফুটিয়ে দিয়েছি। অল্প একটু।

ডাক্তারের হাতে বাবলা কাঁটার চেয়ে সরু কালো একটা হুলের মত জিনিস। -জিনিসটা কি! জিনিসটা কি বলবেন তো! -অবশ্যই বলবো। তার আগে বলো তোমাদের এখনো কি আগের মত শীত করছে!

শীত! আমরা সমস্বরে বললুম, কোথায় শীত! এখন রীতিমত ঘাম বেরোচ্ছে! ডাক্তার শব্দ করে একটু হাসলেন। দেখছো তাহলে শীত আর গ্রীষ্ম জিনিসটা কত আপেক্ষিক! শরীরের বিশেষ একটা অবস্থা মাত্র। আমি হিমালয়ের বরফে কত সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছি যাঁরা সম্পূর্ণ খোলাগায়ে তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে নির্বিকার ধ্যানে বসে আছেন। সূর্য তখনো ভাল করে উঁকি দেয়নি গোমুখীর বরফগলা জলে মহানন্দে স্নান করছেন। কেমন করে সম্ভব হয় এ সব!

কেমন করে! আবার আমাদের সমস্বরে প্রশ্ন।

মন। মন। বুঝেছো নবেন্দু, বুঝছো পরেশ। মনের খেলা। আমাদের মস্তিকের যে অংশে শীত-গ্রীষ্ম, ব্যথা-বেদনার বোধ, সেটার উপর প্রভুত্ব করতে জানলে মানুষ আর মানুষ নয়, সে রাজা, সে তখন দেবতা, অতিমানব। এই প্রভুত্ব দুভাবে করা যায়, এক কৃত্রিম উপায়ে, দুই, যোগের সাহায্যে। সেই গল্পটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো?

কোন্‌টা! কোন্‌টা!

প্রচণ্ড শীতের রাত। মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন লর্ড ক্লাইভ। গরম কোট প্যান্ট হোস, মাফলার টুপি পরেও গঙ্গার হু হু হাওয়ার ক্লাইভ সাহেব কাঁপছেন। নবাব সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে পান চিবোতে চিবোতে। ঠোঁটের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম! একজন শীতে কাঁপছেন আর একজন ঘামছেন। রহস্যটা কি! রহস্য হল পান!

পান? আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম। আলি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলো।

ইয়েস মাই বয়েজ, পান। একখিলি পানের দাম এখনকার দিনের একশো টাকার সমান। মুক্তাভস্ম দিয়ে সাজা। তোমাদের কলকাতার ছাতুবাবু-লাটুবাবুর গল্প জানো?

না।

অনেকটা একই রকম। তখন কলকাতায় হাড়-কাঁপানো শীত পড়তো। সেই শীতের রাতে দু ভাই ছাতু আর লাটু খোলা গায়ে ছাদে পায়চারি করতেন আর বলতেন, উফ্‌ বেজায় গরম, বেজায় গরম! না, মুক্তভস্ম নয়। মুরগির মাংস। প্রথমে একটা মুরগিকে গোখরো সাপের ছোবল মারানো হত। সেই মুরগির রক্ত ইন্‌জেকশন করা হত আর একটাকে। সেটার রক্ত আর একটাকে। এইভাবে শেষ যে মুরগিটা বেঁচে যেত সেটাকে কেটে কাবাব করে দু ভাই খেতেন। আর গরমে তাঁদের রক্ত টগবগ করে ফুটতো।

আমাদের কি হয়েছে!

তোমাদের কেসটা অন্য। তার আগে দেখি পিঁপড়ে সম্পর্ক তোমাদের কার কি জ্ঞান। বল তো পৃথিবীতে ক'জাতের পিঁপড়ে আছে?

সুড়সুড়ি, লাল, গোঁদো, ডেঁও, কাঠ।

উত্তরটা বড় ভাসা ভাসা হল হে। তবে শোনো, সারা পৃথিবীতে ছ হাজারেরও বেশি জাতের পিঁপড়ে আছে। সবই হয়তো মোটামুটি একরকমের দেখতে, কোনো জাতের পিঁপড়ে আকৃতিতে বড়, কোনো জাতের পিঁপড়ে ছোট অথবা মাঝারি। সামাজিক জীব। এরা হল হাইমেনোপটেরা জাতির কীট। পৃথিবীর সর্বত্র এদের পাবে। মরুভূমিতে, সুমেরু কিংবা কুমেরুতে, বর্ষার বনভূমিতে, শহরে, নগরে। এরা নিজেদের কলোনিতে দল বেঁধে থাকে। আমাদের সমাজের মত এদের সমাজেও জাতিভেদ আছে, শাসনব্যবস্থা আছে। এক একটা কলোনিতে পাবে- রানী, পুরুষ আর শ্রমিক পিঁপড়ে। রানী হলেন আকৃতিতে সবচেয়ে বড়। এনার আবার ডানা আছে। পুরুষ

পিঁপড়েরা রানীর চেয়ে আকৃতিতে ছোটো। এদেরও ডানা আছে। যে কোনো কলোনিতে শ্রমিক পিঁপড়ের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি আর এদের ডানা নেই।

নবেন্দুর মনে হয়, কিছু প্রশ্ন ছিল। উসখুস করছিল। ফাঁক পেয়েই প্রশ্ন করল, শীত গ্রীষ্মের কথা থেকে পিঁপড়ের কথা আসে কি করে?

আসে আসে। কেন আসে আর একটু ধৈর্য ধরলেই বুঝতে পারবে। এখনো শোনো, আর এরকম পিঁপড়ে আছে এদের বলা হয় অ্যান্টলায়ন বা সিংহ পিঁপড়ে। এরা হলো নিউরোপটেরা প্রজাতির কীট। সিংহ পিঁপড়ে থাকে শুকনো বালি বালি জায়গায়। অতি সাংঘাতিক প্রানী হে। তেমনি বুদ্ধিমান। এরা কি করে জানো চমৎকার ফাঁদ পেতে অন্যান্য পোকামাকড় ধরে। বালিতে ফানেলের মত গর্ত করে তলায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে। গর্তের গা বেয়ে হড়কে এইসব পোকা সোজা তলায় চলে আসে। তারপর যেই গা বেয়ে বাইরে পালাবার চেষ্টা করে সিংহমশাই তখন প্রবল বিক্রমে বালির বন্দুক ছুঁড়তে থাকে নিজের মাথা দিয়ে। সেই বালির মেশিনগানে ঘায়েল হয়ে বেচারা চিৎপাত হয়ে পড়ে, তখন সিংহমশাই মহানন্দে তার রক্ত-শুঁড় দিয়ে পোকাটির প্রান-রস শুষে নিয়ে খোলসটি গর্তের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সাধারণ পিঁপড়ে যম এই সিংহ-পিঁপড়ে।

এইবার শোনো আগুনে পিঁপড়ের কথা যার ইংরেজী নাম ফায়ার অ্যান্ট। ফায়ার অ্যান্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে আলি পটপট করে হাততালি দিয়ে উঠলো। এরা আসলে দক্ষিন আমেরিকার অধিবাসী। এদের দংশনে শুধু জ্বালা নয়, মারাত্মক বিষক্রিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত অস্বাভাবিক নয়। তোমরা পিঁপড়ের ঢিবি হয়তো দেখেছো। আগুনে পিঁপড়ের ঢিপি দেখোনি। তিন থেকে চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। শক্ত পাথরের মত। যে জামিতে এই ধরনের ঢিবি দেখা যায় তার ধারে-কাছে ভয়ে কেউ যেতে চায় না। চাষ করার চেষ্টা তো দূরের কথা। গোটা কতক পিঁপড়ে যদি তোমাদের এখন কামড়ায়, মিনিট পনের লাগবে তোমাদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে। দক্ষিন আমেরিকার প্রতি বছর বহু পশু-পাখি, এমন কি মানুষের বাচ্চা এই আগুনে পিঁপড়ের কামড়ে মারা পড়ে। আমি কিছুই করিনি, কেবল তোমাদের ঘাড়ের কাছে বিশেষ একটি নার্ভে টুক করে একটু ফুটিয়ে দিয়েছি। -কি ফুটিয়ে দিয়েছেন? আমরা একসঙ্গে সকলে ভয়ে চিৎকার করে উঠলুম। পরেশটা একেই ভীতু, আরো যেন কেমন হয়ে গেল। মনে হলো এক্ষুণি যেন মারা যাবে।

ডাঃ ল্যাং পকেট থেকে গোল চ্যাপ্টা মত একটা কৌটো বের করলেন। অনেকটা জর্দার কৌটার মত। ঢাকনার ছোটো গোল গোল অজস্র ফুটো। ঢাকনাটা খুলে ফেলে কৌটোটা সামনের টেবিলের যেমনি রাখতে গেলেন, ট্রেনটা হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো আর কৌটোটা ছিটকে কামরার মেঝেতে পড়ে গেল। এক ঝলকে যেন দেখলাম ঠিক লালও নয় কালোও নয় একটা পোকার মত কি খড় খড় করে একটা আসনের তলায় গিয়ে ঢুকলো। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললেন- কেয়ারফুল মাই বয়েজ, ডেঞ্জার ডেঞ্জার। সবাই আসনের উপর উঠে দাঁড়াও, প্যান্টের ফোল্ড আর শরীরের পেছন দিক সামলাও। সুড় সুড় করলেই জোরে ঝাড়া দাও। ও ভেরি ডেঞ্জারাস। ওটাকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত এই কামরা বড়ই বিপজ্জনক। সঙ্গে সঙ্গে পরেশ 'ওরে বাবারে' বলে একটা লাফ মেরে আলির কোলে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

লখিয়ারা সন্ধের দিকটা বাংলোর হাতায় বড় পিপুল গাছটার নিচের কোয়ার্টারে থাকে। এলোমেলো খাটিয়া ছড়ান। একটা ওর বাবার একটা ওর মায়ের। লখিয়ার বাবার বাতের অসুখ। সারাদিনের খাটুনির পর এই সময়টা তার একটু আরামের।লখিয়া তখন মস্‌মস্‌ করে গা হাত পা টিপতে থাকে আর বকবক করে বকে। মাঝে মাঝে আবার বাবাকে বকে দেয়। লখিয়ার বাবার যেন কত অপরাধ! মেয়ের কাছে বকুনি খেতে খেতে বুড়োর জীবন যায়। সে কেবল ঘুমজড়ান চোখে বলতে থাকে-হাঁরে বিটিয়া, হাঁরে বিটিয়া!

মায়ের কাঁপা কাঁপা গলার ডাক শুনে লখিয়া যেই উত্তর দেয়-আতা হ্যায় মায়ী, বাবা অমনি হুপ করে রান্নাঘরে লাফিয়ে পড়েন। মা অমনি আমাকে জাপটে ধরে উ করে উঠতেন। বাবা হাসতে হাসতে বলতেন-ম্যাডাম এই তোমার সাহস! আমাকে বলতেন-তোর ব্যাটার কোনও সাহস নেই, শিকারী হবি কি নিয়ে। বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া, কুছ নেহি হ্যায় তো থোড়া থোড়া।

কোথায় গেল আমার সেসব দিন! জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রেলের নতুন লাইন পাতা হচ্ছে। ওই সময়টা বাবাকে ক্যাম্পের থাকতে হত। একদিন রাতে আদিবাসীরা কি কারণে জানা নেই ক্যাম্পে উপর চড়াও হয়ে, তীর চালাতে শুরু করল। বাবা আহত হলেন। স্পেশ্যাল ট্রেনে শহরে আনার আগেই বাবা মারা গেলেন। সন্ধে হয়ে এলেই আমার বাবার কথা মনে পড়ে। হাফ প্যান্ট, হাঁটু অবধি মোজা, হাফ শার্ট, মাথায় শোলার হ্যাট, মুখে পাইপ, এতদিন চওড়া বুক, মোটা হাতের কবজি। হাসলে মনে হত সমস্ত বাড়িটা যেন

সুখে কেঁপে উঠেছে। মেরে না ফেললে এখনও বাবা বেঁচে আছেন।

ট্রেনটা আবার একটা ব্রীজের উপর দিয়ে যাচ্ছে, গুমগুম করে শব্দ হচ্ছে। পৃথিবীটা আসলে বড় নির্জন জায়গা। বেশীর ভাগই যেন জঙ্গল, পাহাড়, নদী। এই ব্রীজটাও হয়ত কবে কোনদিন বাবাই তৈরি করে গিয়েছিলেন রেলের লোকলশকর এনে। আসতে আসতে কতগুলো যে ব্রীজ পড়ল! ডাক্তার কি একটা বই পড়ছিলেন, আলির চেয়ারে পা তুলে দিয়ে। বইটা হঠাৎ কোলের উপর ফেলে দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। চোখ দেখে মনে হল বহু দূর অতীতে চলে গেছেন। ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি-কিসের দুঃখ! পৃথিবীতে কত কি ঘটে জান। তোমার বাবার মত আমার বাবাও খুন হয়েছিলেন।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। আশ্চার্য ব্যাপার। ডাক্তার কি করে আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। অদ্ভুত ক্ষমতা তো! শুনেছি সাধু-সন্ন্যাসীদের এই রকম ক্ষমতা থাকে। জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন-আমার বাবা ছিলেন ইংরেজ, আমার মা ছিলেন বাঙালী। যুদ্ধের আগে আমার বাবা খড়গপুরের রেলের কারখানায় জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন, মা ছিলেন রেল হাসপাতালের ডাক্তার। আমার জন্ম ওইখানেই। যুদ্ধের পর আমার বাবা আর ইংলণ্ডে ফিরলেন না। বললেন ভারতে থেকে, রোদ ভালবেসে ফেলেছি, চল সিসিলিতে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটাই। অলিভগাছ, ভূমধ্যসাগরের সবুজ জল, প্রচীন ইতিহাস। মা-ও রাজী হয়ে গেলেন। উঃ সিসিলি কি জায়গা! ভারত আমার মাতৃভূমি। ইংল্যাণ্ড আমি দেখেছি। নিজের জন্মভূমির উপর সকলেরই মায়া থাকে। বাবারও হয়ত ছিল। বাবা যেহেতু ইংরেজদের উপর ভীষণ চটে গিয়েছিলেন, বলতেন বেনের জাত, সেই হেতু সিসিলিকে যেন জোর করে ভালবেসে ফেলেছিলেন। আমার আর কি বল? আমি তো আর ইংল্যাণ্ডে জন্মাইনি। সিসিলি তো আমার ভাল লাগবেই। চোখ বুজলেই আমি আমার কৈশোরের দিন দেখতে পাই। ভূমধ্যসাগরের তীরে ইতিহাস দিয়ে সাজান আমার স্বপ্নের সিসিলি।

নবেন্দু বললে-জানেন, পৃথিবীর নানা দেশ আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। আমি যখন বড় হব তখন আমি আপনার মত ভূপর্যটক হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো!

-ভেরি গুড। এর চেয়ে ভাল হবি আর কিছু নেই নবেন্দু। দেশ, মানুষ, প্রকৃতি, পৃথিবী যে কতবড় নবেন্দু এক জীবনে মানুষ দেখে শেষ করতে পারবে না। সিসিলিতে আমার বাবার কেনা বাংলোটা এখনও আছে। সিমেতো নদীর ধারে। আমার মা সেখানে আছেন। বয়স হয়েছে। ডাক্তারি করেন তবে জোর করে কেউ ধরে না নিয়ে গেলে রুগী দেখেন না। ছোটো একটা বাগান আছে। সেখানে আঙুর হয়, কমলালেবু পাকে শীতে, পীচ, বাদাম, পেস্তা, পাতিলেবু, ডুমুর, অলিভ। বাংলোর বারান্দায় বসে মা তাকিয়ে থাকেন পেলোরিতান, নেব্রোদিয়ান, মাদোনিয়ান পর্বতশৃঙ্গের দিকে। মাউণ্ট এটনার নাম শুনেছো তোমরা?

ডাক্তার প্রশ্নটা করে, মোটা একটা চুরুট ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ট্রেনটা ভীষণ দুলছে। সেই দোলায় আমারাও দুলছি। দুলছে সাপের বেতের ঝুড়ি দুটো। ছোট্ট একটা খাঁচাও দুলছে, যার মধ্যে লাল একটা পাখি ডানায় মুখ গুঁজে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কখন কখন মুখ তুলে ঠোঁট দিয়ে ডানা চুলকে নিচ্ছে। চুরুট দেখে আলির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নাকের পাটা ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করে ধোঁয়া নিচ্ছে নাকে। ডাক্তার একমুখে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন-পাবে পাবে। ডোণ্ট বি ইমপেশেণ্ট। ইউ উইল গেট ইওর শেয়ার।

মাউন্ট এটনা, কত বড় আগ্নেয়গিরি! আমাদের বাংলোর পশ্চিম বারান্দায় বসলে দেখা যেত আকাশের গায়ে উদ্ধত 'মাউণ্ট এটনা'। বিশাল আগ্নেয়গিরি। দশ হাজার সাতশো চল্লিশ ফুট উঁচু। কী তার শোভা! লোহার মত কালো। জ্বালামুখটা যেন খুবলে নেওয়া পুডিং-এর মত। চাঁদনী রাতে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতুম-হে আগ্নেয়গিরি! আর একবার তুমি জেগে ওঠ। অন্ধকার আকাশে মেলে দাও আগুনের লক্‌লকে শিখা। ছিটিয়ে দাও স্ফুলিঙ্গ, ছুঁড়ে দাও আগুনের গোলা। সিসিলি যে কি জায়গা, তোমাদের বোঝাতে পারব না। সিসিলি মাই লাভ! সিসিলি মাই লাইফ!

ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ সিসিলি। কত বড় জান-ন'হাজার নশো পঁয়ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার। মাঝখানটা সমতল। চারপাশে পাহাড়। সিমেতো নদী বয়ে চলেছে কুলকুল করে। এই সমভূমির নাম কাতানিয়া। পলি ফেলে ফেলে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। সেখানে আঙুরের বাগানে সিসিলির মেয়েরা বেতের ঝুড়িতে সাবধানে থোকা থোকা আঙুর সাজিয়ে রাখছে। গাছে গাছে হলদে হয়ে আছে পাকা পীচ ফল।

বাবার সঙ্গে প্রথম যেদিন পালেরমোতে গেলুম, সেদিনটা আজও আমার মনে আছে। সিসিলির রাজধানী। ইতালির ষষ্ঠতম শহর

এবং বন্দর। সমুদ্র যদি দেখতে চাও নবেন্দু ভূমধ্যসাগরের ধারে দিন কতক থেকে এস। মেসিনার নাম শুনেছ নবেন্দু! আর একটি বড় বন্দর। ১৯০৮ সালের বিশাল ভূমিকম্পে মেসিনা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সামান্য একটু গা-ঝাড়া ৭৭ হাজার মানুষের মৃত্যু। সেই শহর, সেই বন্দর আবার গড়ে উঠেছে। হাওয়ার বিশাল অলিভের পাতা কাঁপছে, জীবন চলছে স্বপ্নের মত, বলা যায় না হঠাৎ কখন এটনা ফুঁসে উঠবে, ভূ-পৃষ্ঠে একটু কেঁপে উঠবে, সব-সব আবার ভূমিসাৎ! সন্ধেবেলার সিসিলি তুমি ভুলতে পারবে না। সমুদ্রের দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, ওদিক থেকে আসছে সাহারার শুকনো গরম বাতাস। সে বড় মজার অভিজ্ঞতা! তোমার সব সময় মনে হবে গরম আর ঠাণ্ডা জলের স্রোত ভেঙে তুমি হেঁটে চলেছো। গরম হাওয়া হালকা হয়ে উপর দিকে উঠছে, তলার দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে শীতল বাতাস। সাহারার এই গরম বাতাসকে ওদেশে কি বলে জান-'সিরোক্কো'।

ওদেশটা তো আমার মাতৃভূমি নয়, পিতৃভূমিও নয়, তবু এত ভালবেসে ফেলেছিলুম। পালেরমোর বিশ্ববিদ্যালয় কত প্রাচীন জান? ১৭৭৯ সালে প্রতিষ্টিত। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়েছি। সেই গ্যারিবল্ডির দেশে আমার যৌবন কেটেছে। খ্রীষ্টের জন্মেরও আটশ বছর আগে গ্রীকরা এখানে এসেছিল রাজত্ব করতে। গ্রীকদের তৈরি মন্দির, প্রাসাদ, থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ। তাওরমিনায় গ্রীক থিয়েটারের সেই ভগ্নাবশেষে কতদিন চাঁদের আলোয় এক পাগল প্রফেসারকে দেখেছি-সারাদিন ঘুরছেন অতীত ইতিহাসের পাতায়। একমাথা সাদা চুল, মুখে নিভে যাওয়া একটা চুরুট। অত্যাচারী দ্বিতীয় হিয়েরোর তৈরি বেদীতে রাতের বেলার সেই বেহালাবাদককে মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে। কোনও দিনও ভুলতে পারব কি! সমুদ্রের হু হু হাওয়ার ওঠাপড়ায় বেহালার সুর অলিভ অরণ্যের মধ্যে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

এই সিসিলিতেই আমার বাবা খুন হলেন 'মাফিয়াদের' হাতে। মাফিয়াদের সম্পর্কে কিছু জান তোমরা! বিখ্যাত গুপ্তসমিতি। যারা ফ্যাসিস্টদের অত্যাচার আটকাবার জন্যে জীবনপণ করে লড়েছে! হিটলার ও মুসোলিনি চক্রান্তের কিছু কিছু তোমরা নিশ্চয় জান। বাবার ভীষণ মাছধরার নেশা ছিল। মাঝে মধ্যে রাতের বেলাও খাঁড়িতে ছিপ ফেলে বসে থাকতেন।

ইতালির মূল ভূখণ্ড থেকে সিসিলিকে আলাদা করে রেখেছে মেসিনা খাঁড়ি। সামুদ্রিক জীবের সবচেয়ে প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র। ওই মেসিনা স্টেটেই বাবা যেতেন মাছ ধরতে। সঙ্গে থাকত তাঁর প্রিয় কুকুর-অ্যাপোলো। সেদিনটা ছিল শনিবার। ইতালির মানুষ শনিবার সারারাত জেগে থাকে। সপ্তাহের শেষ! শুধু স্ফুর্তি আর উল্লাস। পরের দিনটা তো রবিবার, ভয় কি! সন্ধের মুখে বাবা বেরোলেন। রাতের দিকে সমুদ্রে জোয়ার আসবে। সেই সময় খাঁড়িতে কতরকমের মাছ ঢুকবে-সার্ডীন, টুনা ম্যাকরেল।

বাবা সাধারণত ভোরের দিকে ফিরে আসতেন। দূর থেকেই আমরা অ্যাপোলোর ঘেউ ঘেউ ডাক শুনতে পেতুম। মাঝে মাঝে বাবার গলা-হেল্প মি অ্যাপোলো, হেল্প মি, ডোন্ট বি এ নটি বয়! মা অমনি আমাদের বসার ঘরের জানালার সাদা পর্দাটা সরিয়ে-সুপ্রভাত জানাতে চাইতেন। পর্দটা সরালেই বর্ষার ফলার মত রোদ এসে পড়ত ঘরের কার্পেটে।

সেদিন সাতটা বাজল, আটটা বাজল, তবু বাবা ফিরলেন না। মা ঘর-বার করছেন। জানালার পর্দা সরিয়ে বারে বারে দেখে আমাকে এসে বলেছেন-কি করা যায়, কি করা যায়! হঠাৎ বহুদূরে যেন অ্যাপোলোর ডাক শোনা গেল। আমরা দুজনেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ঢালু বেয়ে অ্যাপোলো উঠে আসছে-মুখে যেন একটা কি। আরো কাছে এল। মুখে বাবার একপাটি জুতো।

অ্যাপোলোই আমাদের নিয়ে গেল সেই জায়গাটায়। ছিপ, হুইল, খাবারের বাক্স, ফ্লাস্ক চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। নাইলন নেটে বাবার জীবনে ধরা সবচেয়ে বড় মাছ। পা দুটো জলে, শরীরটা বালির উপর, বাবা মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। পিঠে এতখানি একটা ছোরা ঢুকে আছে। ছোরার সঙ্গে একটা কার্ড-দিস ইউ ডিজার্ভজ-মাফিয়া ইউনিট নম্বর সেভেন বাই ওয়ান বাই থ্রী।

সেই দিনটা আমি কোনও দিন ভুলতে পারবো না অপূর্ব। জীবনের সমস্ত স্বপ্ন সিসিলির সেই ভোরে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বাবা মাফিয়াদের হাতে খুন হয়েছেন এই খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমাদের ছি ছি করতে লাগল। আমাদের জানা নেই বাবার হয়তো এমন কোনও গুপ্ত জীবন ছিল। গুপ্ত যোগাযোগ ছিল। এই ভুল ধারণাটা তো সহজে পাল্টানো শক্ত। কে বিশ্বাস করবে আমাদের কথা। একে আমরা সবে গিয়ে বসবাস শুরু করেছি। আমাদের অতীতটা কেউ দেখেনি। বর্তমানটাই দেখেছে।

সব দেশের পুলিসই তো সমান। ইতালির পুলিস বোধ হয় অপদার্থতায় সব দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। কিছুই করল না। আসলে

করতে পারল না। পুলিসের উৎপাতে অপরাধী অতিষ্ঠ না হয়ে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলুম। মনে হল আমরাই অপরাধী। শেষে সিসিলি থেকে আমাদের পালাতে হল। সেন্ট সিবাস্তিয়ান চার্চের ক্রিমেটোরিয়ামে, প্রচীন এক অলিভগাছের তলায় আমার বাবাকে শুইয়ে রেখে আমরা চলে এলুম। সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে যা ছিল সব বিলিয়ে দেওয়া হল। বাড়িটা খুব কম দামে এক জেলেকে প্রায় দান করেই দেওয়া হল।

হঠাৎ ট্রেনের স্পীডটা কমে এল। ডাক্তার ল্যাং বললেন, অতীত বুঝলে নবেন্দু, সকলের অতীতই দুঃখ-সুখের টানাপোড়েনে বোনা। মন দিয়ে সবকিছু জয় করতে শিখবে। বুঝলে, মন। মনটাই সব। মন হবে সৈনিকের মত। ফরওয়ার্ড মার্চ। কমাণ্ডার বলেছেন-এগিয়ে যেতে হবে-নো লুক ব্যাক। পেছনে তাকাবে না। পরাজিত হয়ে ফিরে আসবে না। পালিয়ে আসবে না। পলাতকের পুরস্কার-কোর্ট মার্শাল।

ডাক্তার হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক আটটা বেজেছে। আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার ভাবনাটাকেই ডাক্তার বললেন-হ্যাঁ, আটটা বেজেছে। নাও ইট ইজ টাইম ফর ডিনার। তোমরা কেউ চান-টান করবে! নবেন্দু বললে, আমি করব। আমার একটু উপাসনার কাজও আছে।

-ভেরি নাইস। তোমার আছে আমারও আছে। দেন লেট আস অ্যাডজস্ট। তুমি আগে যাও, চানটা সেরে এসো। ওই নীল কাচের দরজাটার ওপাশে চলে যাও। তারপর আমি যাবো। তোমরা কেউ যাবে না?

-হ্যাঁ, আপনারা সেরে নিন। তারপর আমরা একে একে যাবো।

-কিন্তু মনে রেখো নটার মধ্যে আমাদের শেষ করতে হবে। দশটার কিছু পরে আমরা পৌঁছে যাবো।

নীল কাচের স্নানঘর

বেশ মজা লাগছিল চলন্ত ট্রেনে 'শাওয়ারের' তলে দাঁড়িয়ে স্নান করতে। আরও ভাল লাগছিল এই কারণে, পুরো স্নানঘরটা গাঢ় নীল রঙের। নীল রঙের মেঝে, দেওয়াল, কাচ। তার মাঝে সাদা 'বেসীন', ঝকঝকে নিকেলের কোলের মাথা। সারাদিনের পর শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। শাওয়ারটার এত জোর, মনে হচ্ছে মাথা ছ্যাঁদা হয়ে যাবে। পা বেয়ে জল নেমে যাচ্ছে ফ্যানা ফ্যানা হয়ে। সারা বাথরুমে ছড়িয়ে আছে মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ।

স্নান সেরে অস্বচ্ছ নীল কাচের দরজা খুলে বাইরে আসতেই মনটা যেন ভরে গেল। অনেক ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে চার্চে গিয়ে এইরকম সংগীত শুনেছিলুম। কখন মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়েছে, কখন মনে হচ্ছে বিশাল অরণ্যে ঝড় বইছে। ডাঃ ল্যাং সাদা একটা গাউন পরে হাঁটু মুড়ে 'নিল ডাউন' হয়ে বসে প্রার্থনা করেছেন। বুকের কাছে দুহাতে ধরে আছেন সোনার তৈরি একটা ক্রুশ। নবেন্দু অবশ্য পদ্মাসনে বসে আছে! আমাদের পরেশচন্দ্র যার জীবনে আহার আর নিদ্রা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও সূক্ষ্ম ব্যাপার নেই সেও এই পরিবেশে অন্যরকম হয়ে গেছে। অবাক হয়ে একপাশে বসে আছে চুপ করে। আলি ইজিচেয়ারে চোখ বুজে চুপ করে বসে আছে। আমিও পাশে একটু জায়গা করে নিয়েছি। আমার সেই-ভবসাগর তারণ স্তোত্র এখানে সুরে মিলবে না। তবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রর্থনা-খণ্ডন ভব বন্ধন জগ মিলবে মনে হচ্ছে।

কতক্ষণ ওইভাবে চোখ বুজিয়ে বসেছিলুম বলতে পারব না। সময়ের কোনও হিসেব ছিল না। গাউনের খসখস আওয়াজ চোখ মেলতেই দেখলুম, ডাক্তার উঠে দাঁড়াচ্ছেন। দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীর গলায় বললেন-ও খাইস্ট। সংগীতটা তখনও বন্ধ হয়নি। ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে টেপ-রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, ট্রেনের সেই একঘেয়ে শব্দ। লাইনে চাকায় ঐকতান।

ডাক্তার সাদা গাউনটা খুলে ফেলে, গুছিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলেন-কেমন লাগছে তোমাদের?

নবেন্দু বললে-ভীষণ ভাল লাগছে। এত সুন্দর সংগীত কখনও শুনিনি।

ডাঃ ল্যাং-এর মুখে প্রশান্ত হাসি। হাসতে হাসতেই চৌকো একটা বাক্সর সামনের পাল্লাটা খুলে ফেললেন। সমস্ত কামরাটা খাদ্যের সুগন্ধে ভরে গেল। বাক্সটার ভেতরে মৃদু একটা লাল আলো জ্বলছে। সেই ঠাণ্ডা ঘরেও একটা গরম তাপ অনুভব করতে পারছি। ওই চৌকো বাক্সটার ভেতর থেকে খাদ্যের গন্ধের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। ডাক্তার বললেন-নবেন্দু তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর। ওই ফোল্ডিং খাবার টেবিলটা তুমি পেতে ফেল। অপূর্ব তুমি নবেন্দুকে সাহায্য কর ডিশ, প্লেট, ব্যোলগুলো ঠিকঠাক করে সাজিয়ে। ভাঙবে না, অযথা শব্দ করবে না। খেয়াল রাখবে আমরা চলন্ত ট্রেনে বসে আছি।

মাঝারি আকারের টেবিল। পরিস্কার ঝকঝকে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটা জায়গায় ছোট ছোট গোল খাঁজকাটা। প্রথমটা বুঝতে পারিনি কেন এমন করা। একটু পরেই বোঝা গেল। ডাঃ প্রথমেই স্যুপের বড় জায়গাটা একটা খাঁজে বসিয়ে দিলেন। তলাটা খাপে খাপে বসে গেল। ট্রেন যতই দুলুক পাত্রটা সরতে সরতে পড়বে না। এইভাবে সবকটা পাত্রই জায়গায় জায়গায় বসে গেল। সব কিছুই মাপে মাপে তৈরি। আলির গলায় বুকরে সামনের দিকে ছোটো একটা তোয়ালে বেঁধে দিয়েছে। তার কোলে স্টেনলেস স্টীলের বাটিতে দুধ পাঁউরুটি। বেশ বড় একটা চামচে। পাশেই এক জোড়া বেশ বড় সাইজের কলা। একটা লাল টকটকে আপেল।

-এত সব খাবার আপনি কখন তৈরি করলেন কাকা?

-কাকা! আ মাই ডিয়ার সন। এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হল। আ মাই ডিয়ার সনস। তোমাদের মত ছেলেরা যে দেশে আছে সে দেশের এত দুঃখ কেন হবে! হবে না। যদিও ভারতটা ঠিক আমার দেশ নয়, তবু এই ভারতের চেহারা আমি পাল্টে দোবো, দোবোই দোবো।

এক হাতে ছুরি, আর এক হাতে কাঁটা ডাক্তার দুহাত আকাশে তুলে তাঁর প্রতিজ্ঞাটাকে অনেক উঁচুতে তুলে দিলেন। আর সঙ্গে

সঙ্গে তাঁর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

-আঙ্কল, আপনার চোখে জল কেন?

-জল, ইজ ইট? আমি কাঁদছি! সত্যি আমি কেঁদে ফেলেছি। বাট মাই সনস, এ দুর্বলের কান্না নয়। এটা আমার আবেগ, জীবনের অনেক কিছু করতে চাওয়া আর করতে না পারার আবেগ চোখের কোণে জল হয়ে জমেছে। আমি যদি বেঠোভেন, বাক, হ্যাণ্ডেল হতে পারতুম, আমি যদি গ্যালিলিও, কোপারনিকাস হতে পারতুম, আমি যদি ফ্লেমিং, রাসেল, আইনস্টাইন হতে পারতুম! পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত যত সেরা সেরা মানুষ এসেছেন, সব মিশিয়ে যদি নিজেকে তৈরি করতে পারতুম!

-কিন্তু আঙ্কল আপনি যে কত বড় বিজ্ঞানী!

-বিজ্ঞানী? আমি? আমি সামান্য একটা জোনাকি!

আমার বিজ্ঞান কার কি কাজে লেগেছে! তবে, ইয়েস লাগাতে হবে। আমি পৃথিবীর মুখের চেহারা পাল্টে দিতে চাই। এমন সব মন তৈরি করতে চাই, যে মনে সব সময় বেঠোভেনের নাইন্থ সিমফনি বাজছে। যে মন নদী নয়, নালা নয়, নর্দমা নয়। বিশাল সমুদ্র, বিশাল উচ্ছ্বাস, বিশাল ঝড়। আই উইল বি এ মেকানিক অফ মাইন। নাও নাও, ফুডস আর গেটিং কোল্ড।

ডাক্তার চিকেনের একটা ঠ্যাং ধরে টানাটানি করতে লাগলেন-কী রকম রেঁধেছি বল? হাউ আই কুক? তোমরা একবারও কেউ কিছু বললে না!

আমরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলুম-চমৎকার! চমৎকার!

আলি মহানন্দে একটা কলা উপর দিকে ছুঁড়ে দিয়েই লুফে নিল। ক্রিকেটার হলে একটা ক্যাচও মিস করত না।

শেষরাত

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। কেন ভাঙল! ট্রেনের দুলুনিটা থেমে গেছে। চলছে না, কোথাও একটা দাঁড়িয়ে পড়েছে স্থির হয়ে। চোখের সামনে সেই অদ্ভুত ঘাড়টা। স্বপ্নের মায়াবী ঘড়ি যেন। ডায়ালটা মস্ত একটা গোল কাচ। গাঢ় নীল। হালকা মেঘ ভাসছে। আলোর অক্ষরে সময় ভেসে উঠছে। তিনটে পনের, তিনটে ষোল, সতের। তাকাতে না তাকাতেই সময় সরে যাচ্ছে, নদীর জলের মত। পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, পুবে সূর্য উঠছে। সূর্য এখন কোথায়, ঘড়ি দেখলেই বোঝা যায়। পৃথিবীর কোথায় কোন্ দেশে সন্ধ্যা নামছে, কোথায় ভোর হচ্ছে, আজ কোন্ আকাশে চাঁদ, তারারা কে কোথায় আছে, আকাশের মত ওই গোল ডায়ালে সব ভেসে উঠছে।

'আঙ্কল, আমরা কোথায়?'

'আমরা বিহারে! এইবার একটা ছোট ইঞ্জিন আমাদের অন্য লাইনে টেনে নিয়ে যাবে।' ডাক্তার পাশের বাঙ্ক থেকে শুয়ে শুয়েই জবাবা দিলেন।

'কার নাক ডাকছে আঙ্কল?'

'আলির। ওর ভীষণ নাক ডাকে।'

'আমরা কখন পৌঁছাব?'

'ভোরের একটু পরেই।'

ঘটাংঘট করে ভীষণ একটা শব্দ হল। কামরাটা দুলে উঠল।

'অপূর্ব, ইঞ্জিন জুড়ল। এইবার আবার আমরা চলতে শুরু করব।'

আমাদের কামরার আর একপাশে আর একটা বড় কাচের পর্দা ছিল। কেন ছিল, কি তার কাজ বুঝিনি আগে। এখন চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলুম। ছোট ছোট আলোর টিপ একটা কোণে ঝাঁক বেঁধেছে। আগে ছিল না। হলফ করে বলতে পারি ছিল না। বিন্দুগুলো হঠাৎ পরস্পর পৃথক হয়ে কাচের গায়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে! অবাক হয়ে দেখছি। আমার ঘাড়টা বালিশ থেকে উঠে পড়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে ছোট ছোট সাদা সাদা পরীর মত কি এক কোণ থেকে আর এক কোণে উড়ে চলেছে। ঠিক দেখছি তো! হ্যাঁ পরীই তো।

'আঙ্কল, ও কি, কাচের পর্দায়, কি যেন উড়ে যাচ্ছে! একের পর এক পাখির মত ভেসে চলেছে।'

'যা দেখছ তাই। দে আর সোলস।'

'সোলস, আত্মা, তার মানে! ফ্যানটাসি! আপনার তৈরি!'

'না অপূর্ব, আমার তৈরি নয়, যন্ত্রটা আমার তৈরি ঠিকই। বাট দে আর সোলস। রাতের পরিক্রমা শেষ করে ওরা এক গোলার্ধ

থেকে আর এক গোলার্ধে চলেছে। দিন ওদের সহ্য হয় না তাই রাতের দিকে ছুটে চলেছে।'

নবেন্দুর উঠে পড়েছে। পরেশ গ্যাঁট হয়ে উঠে বসেছে। নবেন্দু বললে, 'কেমন যেন বিশ্বাস হয় না।'

নবেন্দুর কথা শুনে ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন, 'কেন বিশ্বাস হয় না।, মাই ডিয়ার নবেন্দু! তুমি টেলিভিসন বিশ্বাস কর নিশ্চয়ই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, করি।'

'আচ্ছা, তুমি রাডারের নাম শুনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, এক্স-রে, গামা-রে চোখে দেখা যায়?'

'আজ্ঞে না।'

'আলট্রা ভায়লেট রে দেখা যায়?'

'আজ্ঞে না।'

'তুমি নিশ্চয়ই জান, এমন শব্দ-তরঙ্গ আছে যা কানে শোনা যায় না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অথচ এরা আছে। কেমন তো!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এইবার আমি যদি বলি, ওই যন্ত্রটা আমার এমন কায়দায় তৈরি যে কায়দায় আমাদের অদৃশ্য জগতের আলোক-কম্পন সহজেই ধরা পড়েছে। যা আমাদের চোখের বাইরে দিয়ে চলে যায় তাই যেন হঠাৎ সত্য হয়ে উঠছে। অলৌকিক, ভৌতিক, বস্তু সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। পরেশ, তুমি বল তো ভূত শব্দটার মানে কি?'

পরেশ সবে ঘুম থেকে উঠে চোখ ছানাবড়া করে বসেছিল। প্রশ্ন শুনে, প্রথমে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে খানিক মাথা চুলকাল, তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভূত মানে ভয়।'

'ব্র্যাভো, ব্র্যাভো মাই ফ্রেণ্ড।' ডাক্তার দু আঙুল টুসকি বাজালেন। কাচের পর্দাটা ইতিমধ্যে কালো হয়ে গেছে।

'যে দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ ওই যন্ত্রের পক্ষে ধরা সম্ভব, ওরা হয় তার চেয়ে বড় দৈর্ঘ্যে সরে গেছে কিংবা ছোট হয়ে গেছে। শোন পরেশ, ভূত মানে ভয় নয়, ভূত দেখলে ভয় হতে পারে, তবে ভূত কখনও ভয় দেখাতে চায় না, আমরাই ভয়ে মরি। ভূত হল আমরা যা দেখি, শুনি, অনুভব করি তার মূল উপাদান অর্থাৎ ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম। পঞ্চ ভূত। আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, আগুন, জল কোন জীবই মরে না। মৃত্যু হল এক ধরনের রূপান্তর। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় চলে যাওয়া।'

পরেশ বিশাল একটা হাই তুলল। ডাক্তার বললেন, 'নাও, আর একটু শুয়ে নাও তোমরা।' সেই অদ্ভুত ঘড়িটার দিকে চোখ চলে গেল। মনে হল সূর্য যেন দিগন্তের আরও কাছে চলে এসেছে। ডায়ালে সমুদ্রের ঢেউ। ডাক্তার বললেন, 'ওই দেখ, সমুদ্রে জোয়ার আসছে।'

টিংলিং, টিংলিং করে অদ্ভুত একটা মিষ্টি শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিসের শব্দ!

'আঙ্কল, কিসের শব্দ?'

'যদি বলি পৃথিবীর অক্ষপথে ঘোরার শব্দ,বিশ্বাস করবে?'

হ্যাঁ করব। আপনি যা বলবেন, 'তাই বিশ্বাস করব।'

'তবে মনে রাখবে-প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নন, সেবয়া।'

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে আবার যেন ঘুম জড়িয়ে আসছে চোখে। খাঁচার পাখিরা বোধ হয় টের পেয়েছে ভোর হয়ে আসছে। কিচির-মিচির করে ডাকছে। ডাক্তার বললেন, 'পাখিদের ভাষা বোঝ নবেন্দু?'

'আজ্ঞে না।'

'আচ্ছা তোমাকে শিখিয়ে দোবো। আমি একটা অভিধান তৈরি করেছি।'

পাহাড়তলি

একসঙ্গে গোটাচারেক সাদা স্টেশন ওয়াগন পর পর ছুটছে। রাস্তা কখনও খাড়া উপর দিকে উঠেছে। কখনও গোঁত করে নিচে নামছে। চারপাশে শাল সেগুনের বন ঝিম ঝিম করছে পাহাড়ী রোদে। যাঁরা গাড়ি চালাচ্ছেন তাঁদের নীল পোশাক। যাঁরা নিতে এসেছেন তাঁদের সাদা। সাদা আর নীল এত সুন্দর দেখাচ্ছে!

আমাদের গাড়িতে ডাক্তার ল্যাং নেই। তাঁর বদলে আমরা পেয়েছি ডক্টর শিলারকে। জার্মান ভদ্রলোক। পরিষ্কার বাংলা বলেন। আমাদের সঙ্গে চলেছে সবচেয়ে মারত্মক জিনিস। বিষাক্ত বিষাক্ত অসংখ্য সাপ গোল ছোট ছোট বেতের ঝাঁপিতে। ডক্টর শিলার হলেন সাপের বিষ বিশেষজ্ঞ। শিলার বললেন, 'আমার প্রথম কাজই হবে সমস্ত সাপের বিষদাঁতের কোটর থেকে বিষ ঢেলে নেওয়া। বড় শক্ত কাজ। এই বিষে যেমন মানুশ মরে তেমনি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে বহু মারত্মক অসুখ সেরে যায়।'

ডক্টর শিলারের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি গাড়িটা হঠাৎ হুড়মুড় করে বাঁদিকে কাত হযে পড়ে স্টার্ট বন্ধ হয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে ছিটকে পড়ল একটা বেতের ঝাঁপি। ডালটা খুলে গছে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে একটা কালো সাপ।

শিলার বললেন, 'একদম ভয় পাবে না। মনে রাখবে যিনি বেরোচ্ছেন তিনি কেউটে। গোলমাল একেবারে পছন্দ করেন না।'

আমরা ভয়ে আসনের উপর পা তুলে নিয়েছি। সাপটা প্রায় পুরো শরীরটাই বের করে ফেলেছে। দেখেই কেমন গা শির শির করছে। শিলার একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, সাপটার গতিবিধি দেখছেন। গাড়িটা কাত হয়ে থেমেই আছে। চলবে বলে মনে হয় না। কি হল কে জানে! গাড়ি ওল্টান থেকে বাঁচলেও সাপের কামড় থেকে বাঁচব কিনা ঈশ্বরই জানেন।

শিলার পকেট থেকে একটা রবারের রড বের করলেন। কালো কুচকুচে রঙ। সেই রবারের ডাণ্ডাটা সাপের মুখের কাছে ধরতেই, সাপটা ছোবল মারার জন্যে ফনা তুলল। মাথাটা হেলছে দুলছে। লিকলিক করে জিভ বেরোচ্ছে ঢুকছে। আতঙ্কে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ডক্রেট শিলার হঠাৎ ডান হাত দিয়ে সাপটার গলার কাছটা ঝপ করে চেপে ধরলেন। বজ্র মুঠি। সাপটাকে মেঝে থেকে সোজা হাতখানেক উপরে তুলে ধরেছেন। শূন্যে লিকলিক করে শরীরটা ঝুলছে। প্রথমে আমরা চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলুম। শিলারের গলা পেলুম, 'ওপন ইওর আইস বয়েজ, দি ক্রাইসিস ইজ ওভার।'

সাপটাকে ফের ঝাঁপিতে ভরে ফেললেন। সেও এক অদ্ভুত কায়দা। মাথাটা ছেড়ে দিলেই তো ছোবল মারবে। মাথাটাকে প্রথমে ঢোকালেন, ন্যাজটাকে বাঁহাতে গোল করে গুটিয়ে গুটিয়ে বেশ সুন্দর করে দড়ি গুছোবার মত করে রাখলেন। মাথাটা ছাড়লেন সব শেষে। বিদ্যুৎগতিতে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিনেল। ভেতর থেকে হিস হিস শব্দ বেরোতে লাগল।

শিলারের সারা মুখে ঘাম ফুটেছে। নিজের হাতের আঙুলগুলো ভাল করে দেখতে দেখতে বললেন, 'জান তো, সাপ নিয়ে যাদের কারবার, তারা সাপের হাতেই মরে।'

'ডক্টর, আজ কোন বিপদ হতে পারত।'

'ইয়েস, একে এই ছোট জায়গা, আমার হিসেবে একটু ভুল হলেই আমাকে মেরে দিতে পারত। কিন্তু সাপ ধরায় ভীষণ মজা আছে।'

ড্রাইভার বললেন, 'এইবার আপনাদের একটু নামতে হবে।'

গাড়ির বাঁ পাশের সামনের চাকাটা একটা গর্তে পড়েছে। নাকটা ঠেকে গেছে একটা পাথরে। পাথরটা না থাকলে আমরা চলে যেতুম শ'খানেক ফুট নিচে। একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যেতুম। উদ্ধরের কি উপায় কে জানে! ড্রাইভার বললেন, 'গাড়িটাকে আর একটা গাড়ির সঙ্গে মোটা তার দিয়ে বেঁধে পেছন দিক থেকে টানতে হবে।'

আগের গাড়িগুলো আমাদের ফেলে সামনে এগিয়ে গেছে।

ডক্টর শিলার বললেন, 'ওয়্যারলেসে যোগাযোগ কর।'

ড্রাইভারের সামনের আসনে একটা চৌকো বাক্স ছিল। তার গায়ে ঝুলছে টেলিফোন। সামনের গাড়িগুলো বহু দূরে। তবু যোগাযোগ হয়ে গেল নিমেষে। 'ইয়েস উই আর কামিং। এখুনি আসছি, ভেব না কিছু।'

শিলার হাসিহাসি মুখে বললেন, 'পাহাড়ী পথে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

আমরা কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়েছি। পাথরে ঠেকে না গেলে আমাদের খুঁজে পাওয়া যেত কয়েক শ' ফুট নিচে তালগোল পাকানো অবস্থায়। নবেন্দু খাদটা উঁকি মেরে দেখছে। জঙলা গাছ, কাঁটা ঝোপ ধাপে ধাপে নেমে গেছে। অনেক নিচে একটা গাড়ি কাত হয়ে পড়ে গেছে। ভাঙা-চোরা জং ধরা। নবেন্দু আর আমি দুজনেই দেখছি। এইভাবেই গাড়িটা একদিন ছিটকে পড়েছিল।

শিলার বোধ হয় আমাদের মনের কথা বুঝে ছেন, 'একবছর আগের একটা দুর্ঘটনার সাক্ষী। এই জায়গাটাতে আমরা ডেঞ্জারাস পয়েণ্ট বলে থাকি। কোনও কারণ নেই, তবে কেন যে এই জায়গাটায় মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে যায়! ওটা আমাদের একটা গাড়ি। ওই গাড়িটাতেও অনেক সাপ ছিল। ডক্টর চন্দ মারা গিয়েছিলেন ওই দুর্ঘটনায়। বহু মারাত্মক সাপও ছাড়া পেয়েছিল। এখন তারা সংখ্যায় আরও বেড়েছে নিশ্চয়!'

দূরে একটা গাড়ি আসছে। আমাদেরই গাড়ি। আমাদের উদ্ধার করে আসছে। ডক্টর ল্যাং লাফিয়ে নামলেন। তাঁর মুখে লেগে আছে মিষ্টি একটা হাসি।

'ডক্টর শিলার দি সেম পয়েণ্ট!'

'ইয়েস ডক্টর। এই জায়গাটার একটা কিছু ব্যাপার আছে।'

'ব্যাপারটা আমাকে ইনভেসটিগেট করতে হবে। আমি একদিন সারারাত এখানে বসে থাকব। নিশ্চয় এখানে কোন স্পিরিট আছে।'

'আমি যে ওসব বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমি যে করি।'

শিলার হো হো করে হাসলেন।

মোটা তার নয়, বিশাল একটা ম্যাগনেট দিয়ে গাড়িটাকে সরিয়ে আনা হল। বাধ্য ছেলের মত সুড়সুড় করে পেছনে সরে এল।

ডক্টর ল্যাং বললে, 'নেক্সট্ টাইম এখানে আমি একটা ক্রশ পুঁতে দোবো। এখানে একটা ইভল স্পিরিট কাজ করছে।'

যে যার গাড়িতে উঠে পড়লুম। আমাদের যাত্রা আবার শুরু হল। দুলতে দুলতে, লাফাতে লাফাতে গাড়ি চলেছে। রাস্তাটা তেমন ভাল নয়। বেতের ঝাঁপিগুলোর এদিকে ওদিকে দুলছে। আবার না ছিটকে পড়ে!

দূর থেকে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা চার্চের চূড়া। নীল আকাশের গায়ে যেন খোঁচা মারছে! কানে এল ঘণ্টার শব্দ। শিলার বললেন, 'আমরা এসে গেলুম। আজ শুক্রবার, তাই চার্চের ঘণ্টা বাজছে। আজ প্রেয়ারের দিন।'

পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে বাড়ি উঠে গিয়েছে। কোথা থেকে যেন একটা আলো ঝলসে উঠছে মাঝে-মাঝে। বিশাল একটা আয়না থেকে আলো ঠিকরে পড়লে যেমন হয়। বিশাল দুটো বেলুন উড়ছে আকাশের গায়ে। একটার রঙ হলদে আর একটা লাল।

সামনেই একটা সাইনবোর্ড-হিলসাইড রিসার্চ স্টেশন। ট্রেসপাসারস উইল বি ইন ডেঞ্জার। ডেঞ্জার মানে তো বিপদ। কেউ হঠাৎ বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়লে বিপদে পড়বে কেন? কি বিপদ!

রাস্তাটা হঠাৎ অসাধারণ ভাল হয়ে গেল। মসৃণ, চকচকে, কালো পিচ মোড়া। দু পাশে সাদা সাদা পাথরের খাড়াই। আমরা এখন ঢালু পথে নিচের দিকে নেমে চলেছি। মাঝে মাঝে পথের পাশে ছোট ছোট গুমটি ঘর। পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে। হাতে বন্দুক নয়, একধরনের কালো নলের মত জিনিস। মুখের কাছে চকচকে রিং লাগান। দু' পাশ দিয়ে দু' সার তার চলে গেছে। একটা ছোট নালা বয়ে চলেছে পাশ দিয়ে তরতর করে। স্বচ্ছ জল। মাঝে মাঝে কালভার্ট কালভার্টের তলায় টিয়ার ঝাঁক। জায়গাটাকে সরগরম করে রেখেছে। দূরে আকাশের গায়ে পাহাড়ের ঢেউ ঝাপসা হয়ে আছে। দেখলেই কেমন যেন মন কেমন করে ওঠে। কত দূর! কত অজানা! গভীর বন। হরিণ, চিতা, হায়না!

পথের একটা জায়গায় এসে গাড়িটা থেমে গেল। ডক্টর শিলার বললেন, 'বয়েজ, এবার তোমাদের নামতে হবে। আমি গাড়িটাকে নিয়ে পাতালে চলে যাব। বাসুকিদের রাজত্বে। তোমাদের গাইড করে নিয়ে যাবে আমাদের গার্ড।'

আমরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়লুম। সামনেই একজন সুন্দর মানুষ দাঁড়িয়ে। অলিভ রঙের পোশাক পরে। রাস্তার পাশেই একটা লোহার হাতল। লিভারের মত দেখতে। সেটাতে চাপ দিতেই উপরের রাস্তাটা সরে গেল। নিচে বেরিয়ে পড়ল আর একটা রাস্তা। সোজা নামে গেছে ঢালু হয়ে। মোটেই অন্ধকার নয়, সেখানেও দিনের আলোর মত ঝলমল করছে আলো। গাড়িটা সেই পথে নেমে যেতেই উপরের দুভাগ রাস্তাটা আবার জুড়ে গেল।

আর তো দ্বিতীয় কোন গাড়ি নেই। আমরা কিভাবে যাব!

সঙ্গে এত মালপত্তর! বাড়িগুলোও অনেক দূরে। আমাদের গাইড সাহেব মুখ দেখেই মনের কথা পড়ে ফেলেছেন। হেসে বললেন, 'হাঁটতে হবে না। তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে, রাস্তাটাই চলতে থাকবে। কাম হিয়ার। কাম টু দি সাইড দি রোড।'

আমরা মালপত্তর নিয়ে বাঁপাশে সরে গেলুম। পায়ের কাছে স্যুটকেস। গাইড সাহেব বললেন, 'আমি সঙ্গে যাচ্ছি না, ওপাশে তোমাদের যিনি রিসিভ করবেন, তাঁকে আমি ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা শুধু ডানপাশের এই সাদা রেখাটায় পা লাগাবে না। রেডি ওয়ান, টু, থ্রী।'

সাঁ করে মৃদু একটা শব্দ হল। আমরা এগোতে লাগলুম সামনের দিকে। পারেশ বলল, 'অপূর্ব আমার মাথাটা ঘুরছে রে, তোর কাঁধ দুটো ধরছি।'

নবেন্দু বললে, 'আমি পড়েছি, বিদেশে এইরকম চলমান রাস্তা আছে। কি মজা লাগছে! তাই না?' পরেশ কাঁদকাঁদ গলায় বললে, 'হ্যা কী ভীষণ মজা!'

চোখ-ধাঁধান আলোর রহস্যটাও যেন হঠাৎ পরিস্কার হয়ে গেল। চোখে পড়ল বিশাল একটা গোল গম্বুজ। গম্বুজের বাইরের রঙটা আয়নার পেছনের মত। মাথাটা খোলা। ভেতরটা নিশ্চয়ই খুব গভীর। খোলা মুখে সূর্যের আলো পড়ে ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসছে। মনে হয়, ভেতর দিকটা আয়নার মত কোন বস্তু দিয়ে তৈরি। আমরা গম্বুজটার অনেক দূর দিয়েই চলেছি, তবু মনে হল ভেতরে যেন কেমন একটা বগবগ শব্দ উঠছে।

'নবেন্দু, ওটা কি বল তো?'

'মনে হচ্ছে সোলার রি-অ্যাকটার। এরা সূর্যের আলোকে সূর্যের তেজকে কাজে লাগাচ্ছে! কি কাজে লাগাচ্ছে তা জানি না।'

আমাদের গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। সামনেই একটা সাদা গুমটি ঘর, গায়ে হলুদের ডোরা। সাদা রঙের একটা মানুষ-সমান উঁচু লোহার বেড়া আমাদের পথ আগলে আছে। ঢং করে একটা ঘন্টার শব্দ হতেই চলমান রাস্তা স্থির হয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আর একজন গার্ড। সেই অলিভ রঙের পোশাক। হাত বাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। এঁর হাতেও সেই ফাঁপা নলের মত একটা কি! মুখটা চকচকে ধাতুর রিং দিয়ে মোড়া।

বেড়ার ওপাশে বিশাল একটা প্রাঙ্গণ। পাথরে ইঁট বসান। ঝাউ, ইউক্যালিপটাস, বোগেনভ্যালিয়া, গন্ধরাজ গোল করে ঘিরে

রেখেছে। সামনেই দূর থেকে দেখা সেই চার্চ। কয়েকটা নতুন চকচকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চার্চের জানালায় নানা রঙের কাচ বসান। কাচের গায়ে আঁকা যীশুর জীবনের নানা ঘটনা।

গার্ড বললেন, 'তোমাদের জিনিস এখানে থাক। আমি তোমাদের গেস্ট হাউসে পাঠিয়ে দেবো। তোমরা সোজা চার্চে চলে যাও। ওখানেই সকলকে পাবে।'

চার্চের অদ্ভুত সব মানুষ

নবেন্দু বললে, 'ওই যে উঁচু বেদী বা প্ল্যাটফর্মের মতো জায়গাটা, ওটাকে বলে পালপিট। আর সাদা পোশাক পরা ওই মানুষটি হলেন বিশপ।'

অর্গানের সুরে ভেতরটা গমগম করছে। সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের গানঃ

Holy, holy, holy, is the Lord God

Almighty.

Who was, who is, and who is to come.

আমরা সবার পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের প্রত্যেকের সামনে উঁচু একটা ডেস্ক। তার উপর একটা করে বাইবেল। মলাটে সোনার জলে লেখা-বাইবেল। আমাদের সামনে আর যাঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের দেখে আমরা সকলেই খুব ভয় পেয়ে গেলুম। কেউই স্বাভাবিক মানুষ নয়। ডানপাশের শেষের সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁরা, তাঁরা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, ঠিক দৈত্যের মত। একেবারে সামনের সারিতে যাঁরা, তাঁরা সব ক্ষুদে মানুষ। উচ্চতায় দু ফুট-আড়াই ফুটের বেশি হবেন না। আমাদের সামনে যাঁরা তাঁদের প্রত্যেকের পিঠেই একটা করে বিশাল একটা করে বিশাল আকারে কুঁজ। তাঁদের পাশেই যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের কেমন যেন গেঁটে গেঁটে চেহারা। ঠিক যেন কাঠের তৈরি পুতুল।

প্রেয়ারের সময় কথা বলতে নেই। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছি। মনে মনে কথা হচ্ছে, এঁরা কারা! এমন অদ্ভুত সমাবেশ এখানে হল কি করে। অর্গানের সুর কখনও উঠছে, কখনও পড়ছে। রঙিন কাচের বাইরে পাহাড়ী রোদ ক্রমশ প্রখর হচ্ছে।

সুর থেমে গেল। বিশপ প্রার্থনা করলেন,

I will pour out my spirit upon all men.

Your sons and your daughters will prophesy,

Your young men will see visions,

And your old men will dream dreams.

আমরা একে একে চার্চ থেকে বেরিয়ে এলুম। ডাক্তার ল্যাং বোধ হয় সামনের দিকে ছিলেন। তিনি বেরিয়ে এলেন সবশেষে। আমাদের অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা বুঝেছেন, তাই হাসতে হাসতে বললেন, 'অদ্ভুত সব মানুষ, তাই না নবেন্দু!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকিয়ে দেখার মত।'

'এই রহস্য তোমাদের কাছে আমি পরিস্কার করে দোবো আজ রাতে। এখন তোমরা আমার সঙ্গে চল। বেশ বেলা হয়েছে। একটার সময় লাঞ্চ। তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।'

গেস্ট হাউস

এত সুন্দর গেস্ট হাউস খুব কম দেখা যায়। তবে ক'টা গেস্ট হাউসই বা আমরা দেখেছি! চারপাশে গোলাপ ফুলের বাগান। নানা রঙের বড় বড় গোলাপ ফুটে আছে। মাঝখানে একটা ফোয়ারা। হালকা ধারায় জল উঠে চারপাশে যখন ছড়িয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে রামধনু তৈরি হচ্ছে। এত বড় বড় ভোমরা ফুলের কিছুটা দূরে শূন্যে দাঁড়িয়ে কখনও স্থির, কখনও খোঁচা মারছে ফুলের গর্ভকেশরে। কেমন একটা একটানা ঝিমধরান ভোঁ ভোঁ শব্দ।

আমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটা করে আলাদা ঘর। পরেশের সবেতেই ভয়।

'কি করে একলা একটা ঘরে শোব রে অপূর্ব! চার্চে যাদের দেখলুম, তারা যদি রাতে জানালা ধরে উঁকি মারে, ভয়ে মরে যাব রে নবেন্দু।'

'তোর মরে যাওয়াই ভাল রে পরেশ। তোর সবেতেই ভয়। মানুষেও ভয়।'

'আচ্ছা বল, ওরা কি মানুষ!'

'মানুষ না তো কি? এক জায়গায় অতগুলো কদাকার মানুষ দেখা যায় না এই যা!'

নবেন্দু চান করতে চলে গেল। আমরাও চানে যাব। প্রত্যেকের ঘরের সঙ্গেই একটা করে বাথরুম।

ওঃ! চানের জন্যেও যে এত আয়োজন থাকতে পারে জানা ছিল না। একেবারে সাদা বাথরুম। বিশাল বাথটাব। শাওয়ার। মেঝেতে এটা আবার কি! পায়ের চাপ দিয়ে দেখি। আরে, চাপ দিতেই তলা থেকে ফিনকি দিয়ে জল উঠছে ফোয়ারার মত। বেশ মজা তো! উপরে শাওয়ার থেকে জল পড়ছে, নিচে ফোয়ারা থেকে জল উঠছে। আঃ কি আরাম রে! এটা কৌটোর গায়ে লেখা, বাথসল্ট। বাথ মানে স্নান, সল্ট মানে নুন। পুরো মানেটা তাহলে হল চানের নুন। সেটা আবার কি জিনিস। যেখানকার জিনিস সেখানেই থাক বাবা। হাত দিয়ে কাজ নেই।

গেস্ট হাউসের বারান্দায় খসখসের পর্দা নেমেছে। একজন লোক পিচকিরি দিয়ে জল দিচ্ছে। ছোট্ট এতটুকু মানুষ। দেখলেই কেমন মজা লাগে। পরেশ দেখলে ভয় পাবে। খসখসের মিষ্টি গন্ধে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। বিহারী গরম ফুটছে। ঘাম নেই, গা-জ্বালা। লোকটি আমাকে দেখে বললে, 'গুড মর্নিং, মাস্টার, মাস্টার...'

'অপূর্ব।'

ইয়েস মাস্টার অপূর্ব। আমার নাম টমাস।'

'মর্নিং মাস্টার টমাস।'

মাস্টার বলেই খেয়াল হল, দেখতে ছোট হলেও বয়েসে অনেক বড়। ভুল শুধরে নিলুম, 'মর্নিং মিস্টার টমাস'

লোকটি চলে যেতে যেতে ঘার ঘুরিয়ে হাসল, 'রাইট ইউ আর, আমার বয়েস এখন ফর্টি সিক্স।'

নবেন্দু পাশে এশে দাঁড়িয়েছে। মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে।

'কি মেখেছিস রে নবেন্দু!'

'কেন, বাথ সল্ট!'

'বাথ সল্টটা কি রে।'

'বাথটাবে জল ভরবি, তারপর বাথ সল্ট মিশিয়ে বেশ করে ফেনা করে তার মধ্যে শুয়ে পড়বি।'

'তাই নাকি, তাহলে আর একবার চান করে আসি।'

সে কি রে!'

'হ্যাঁ, তুই করলি আমি করব না! কি সুন্দর জায়গা নবেন্দু। আমি আর এখানে থেকে যাব না।'

'তোকে রাখবে কেন?'

'আমি আঙ্কেলকে রিকোয়েস্ট করব।'

'আচ্ছা, পরেশটার কি হল বল তো?'

'ঠিক'বলেছিস। অনেকক্ষণ তার কোনও সাড়া শব্দ পাচ্ছি না। চল তো ওর ঘরে!'

পুবদিকের শেষ ঘরটা পরেশের। ঘরের দরজা হাট খোলা। জামাটামা সব খোলা। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বাবু বাথরুমে ঢুকেছেন। নবেন্দু ডাকলে, 'পরেশ, পরেশ।'

বাথরুম থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ এল।

'কি হল রে নবেন্দু, পরেশ কাঁদছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ তো রে, কান্নারই তো শব্দ! পরেশ, কি হল, এই পরেশ।'

বাথরুম থেকে পরেশের কান্না জড়ান চাপা গলা ভেসে এল, 'বাথরুমের দরজাটা যে খুলতে পারছি না রে নবেন্দু। সেই থেকে আটকে বসে আছি।'

'সে আবার কি রে?'

'হ্যাঁরে, কিছুতেই খুলছে না ভাই।'

'উঃ তোকে নিয়ে তো মহা বিপদ হল। তুই ছিটকিনিটা বাঁদিকে ঘুরিয়ে দরজাটা তোর দিকে জোরে টান। দরজার ল্যাচ এইভাবেই খুলতে হয়। ট্রেনের ল্যাভেটারির কায়দা তো তুই দেখেছিস, ডানদিকে ঘোরালে বন্ধ হয়, বাঁদিকে ঘোরালে খোলে।'

'আরে তখন থেকে তাই তো করছি। কমসে কম হাজার বার করেছি।'

'তাও খুলছে না?'

'না'

নবেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি ব্যাপার বল তো অপূর্ব!'

নবেন্দু দরজাটা ভাল করে দেখে হো হো হেসে উঠল। পরেশ ভেতর থেকে বললে, 'আমার এই বিপদে তুই হাসছিস নবেন্দু!'

'হ্যাঁ, হাসছি ইডিয়েট। তুই একটা ইডিয়েট!'

নবেন্দু হাতল ধরে দরজাটা নিজের দিকে টানতেই খুলে গেল দরজাটা। পরেশ গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছে। গা দিয়ে বিন বিন করে ঘাম বেরোচ্ছে। মুখে একমুখ হাসি।

'কি করে খুললি নবেন্দু! তুই যাদু জানিস।'

'হ্যাঁ, যাদু জানি। মূর্খ, এ দরজাটা বাইরের দিকে খোলে, তুই তো দরজাটা ঠেলে দেখবি! তা না, তখন থেকে নিজের দিকেই টেনে চলেছিস!'

পরেশের মুখটা হাঁ হয়ে গেল, 'জানলি নবেন্দু, বিপদে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। আমি না কেমন বোকার মত তখন থেকে ছিটকিনিটা কেবল ঘোরাচ্ছি আর দরজাটা টানছি। কি রকম ঘেমে গেছি দেখ। আর একবার চান করে নিই। কি বল অপূর্ব!'

'হ্যাঁ, তাই নাও ভাই। তবে বেরোতে পারবি তো!

পরেশ একগাল হেসে বললে, 'আর ভুল হবে না, এবার শিখে গেছি।'

মরা টিয়া

বারান্দায় সুন্দর সাজান বেতের চেয়ার টেবিল। খসখসের পর্দার ভেতর দিয়ে গরম হাওয়া পথ করে নেওয়ার সময় কিছুটা উত্তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গন্ধ মেখে গায়ে এসে লাগছে। আমরা পাশাপাশি বসে আছি অলস ভঙ্গিতে। কিছু করার নেই। কিছু পড়ার নেই।

সাদা পোশাক পরে একজন লোক এলেন হাতে একটা কার্ড। কার্ডটা লাঞ্চের মেনু।

'আপনারা কি সবাই ভেজিটেরিয়ান, না ননভেজ, না মেশান?'

আমাদের আপনি বলায় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। নবেন্দুই উত্তর দিলে, 'আমরা সবাই ননভেজ।'

'ভেরি গুড।'

'চিকেন আপত্তি আছে?'

'না না।'

'ভেরি গুড। তা হলে একটার সময় ডাইনিং হলে চলে আসবেন। সোজা উত্তরে হেঁটে যাবেন, সামনেই ডাইনিং হল।'

লোকটির হাতের তালু দুটো কুচকুচে কালো। আমরা সবাই হাতের দিকে তাকিয়ে আছি, নবেন্দুই জিজ্ঞেস করলে, আপনার হাতে কি কোনও রঙ লেগেছে?'

'ও নো নো। এইটাই আমাদের ফ্যামিলির বৈশিষ্ট্য। হেরিডিটি ও বলতে পারেন। আমাদের দু'ভায়েরই হাতের তালু এইরকম কাল। আমাদের বাবা বা মায়ের কালো ছিল না, তবে শুনেছি, আমাদের গ্রেট গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদারের হাতের তালু দুটো এইরকম ছিল। আচ্ছ, গুডবাই, থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটি গটমট করে চলে গেল।

পরেশ বললে, 'কিঅদ্ভুত জায়গায় নিয়ে গেলি নবেন্দু! অবাক অবাক সব ব্যাপার!'

'ঘরকুনো হয়ে বসে থাকলে এইসব দেখতে পেতিস?'

'তা পেতুম না, তবে আমার কিরকম ভয় ভয় করছে।'

'তোর ভয়ে গুলি মার। তুই তো আরশোলা দেখলেও ভয়ে আঁতকে উঠিস।'

দেখতে দেখতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। নবেন্দু বললে, 'চল এবার বেরিয়ে পড়ি। বসে বসে ঝিম ধরে গেল।'

বাইরে যেন আগুন ছুটছে। গোলাপগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। ভোমরারা সব ছায়ায় সরে গেছে। দূরের পাহাড়ের রেখা যেন আরও অস্পষ্ট ধোঁয়াটে । বাগানে একটা বাঁশের গায়ে থার্মোমিটার বাঁধা। নবেন্দু দেখে বললে, 'একশো তেরো ডিগ্রী। উঃ গরম বটে! খুব পেঁয়াজ খেতে হবে।'

'মাথায় একটা করে ভিজে তোয়ালে চাপিয়ে এলে মন্দ হত না।'

'ঠিক বলেছিস। চ ফিরে যাই।' প্রায় মাঝ রাস্তায় এসে পরেশ আবার ফিরতে চায়। এই না হলে পরেশ!

নবেন্দু বললে, 'হ্যাঁ, তুই ফিরে যা। ভিজে তোয়ালে মাথায় দিয়ে আসতে আসতেই আমাদের খাওয়া শুরু হয়ে যাবে!'

নবেন্দু হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে বাঁ-পাশের ঝোপঝাড়ের দিকে সরে গেল। কিছু একটা চোখে পড়েছে।

'অপূর্ব, এদিকে আয়। দেখে যা! ওই দেখ। দেখছিস!'

চার-পাঁচটা টিয়া পাখি একটা পেয়ারা গাছের তলায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। গাছে পাকা পাকা পেয়ারা ঝুলছে।

'কি ব্যাপার বল তো? আহা অত সুন্দর সুন্দর পাখি!'

'গরমে মরেছে বলে মনে হয় না। একশো তেরো ডিগ্রী এখানে এমন কিছু গরম নয়। কেউ মেরেছে বলেও মনে হয় না।'

'তা হলে কি? কি করে মরল তা হলে?'

'সন্দেহজনক ব্যাপার রে!'

আবার আমরা চলতে শুরু করলুম। মাথায় ঘুরছে মরা টিয়া। পরেশ বললে, 'গরমেই মরেছে রে! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এন্তার পেয়ারা খেয়ে কলেরা হয়ে মরেছে।'

'ঠিক বলেছিস। তুই চুপ কর পরেশ। কেবল মনে রাখিস, এখানে সব গুরুপাক খাদ্য। একটু ভেবেচিন্তে খাস।'

ডাইনিং হল

ভারি সুন্দর ঠাণ্ডা ভেতরটা। এয়ারকণ্ডিশানড। চমৎকার সাজান। ছোট ছোট টেবিল। সাদা টেবিলক্লথ। প্রত্যেক টেবিলেই গলা সরু ঝকঝকে একটা করে ফুলদানি। কোনটায় নীল ফুল, কোনটায় হলুদ ফুল। কোনটায় লাল ফুল। মুখোমুখি গদি আঁটা চেয়ার। চারপাশের দেওয়ালে ভাল ভাল ছবি আঁকা। ডক্টর ল্যাং আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

'বাঃ তোমাদের খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে। এখানে কিছুদিন থাকলেই তোমাদের চেহারা ফিরে যাবে। পরিষ্কার হাওয়া, তেমনি ভাল জল।'

আমরা হাসি হাসি মুখে ঘাড় নাড়লুম। নবেন্দু বললে, 'আঙ্কল, আসার সময় বাগানে একটা স্যাড দৃশ্য দেখলুম।'

'কি দৃশ্য!'

'একটা পেয়ারাগাছের তলায় চার-পাঁচটা বড় বড় টিয়া মরে পড়ে আছে।'

'সে কি!'

আমরা সমস্বরে বললুম, 'ইয়েস আঙ্কল। মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে।'

'আমি দেখতে চাই। আমার এখানে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, সেখানে মরাপাখি, সাংঘাতিক কথা! আই মাস্ট সি। চল চল।'

ঘরে আরও অনেকে এসেছেন। যে যাঁর টেবিলে বসে পড়েছেন। চীনে মেম সায়েবরা প্লেট হাতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরছেন। ডাক্তার বললেন, 'জেণ্টল লেডিজ অ্যাণ্ড মেন, আপনারা শুরু করুন, আমরা এখনি আসছি।'

ঠাণ্ডা ঘর থেকে বাইরে আসতেই গরমে সারা শরীর জ্বলে গেল। মনে হল, গরম জলের নদীর মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। সেই পেয়ারা গাছটার তলায় এসে আমরা অবাক হয়ে গেলুম। মরা পাখি ক'টা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। ডাক্তার বললেন, 'কই, কোথায় তোমাদের পাখি! ভুল দেখেছ তোমরা। ওরা হয়তো বসে ছিল, উড়ে গেছে।

'না আঙ্কল, আমরা মরা পাখি চিনি। মরে কাঠ হয়ে পড়েছিল ঠিক ওই জায়গাটায়।'

অনেক খোঁজা হল। পাখিদের ডেডবডি পাওয়া গেল না। আমরা সকলেই চিন্তিত মুখে খাবার ঘরে ফিরে এলুম।

প্রচুর খাওয়া হল। স্যুপ দিয়ে শুরু, পুডিং দিয়ে শেষ। অনেকে এই গরমেও কফি খেলেন। ডাক্তার ল্যাং বললেন, 'দুপুরে তোমরা রেস্ট নাও, বই-টই পড়। ঘুমোতেও পার। চারটের সময় চা। তারপর তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাব। সন্ধেবেলা আমার রিসার্চ ল্যাবরেটারি দেখাব। গুড বাই বয়েজ।'

পরেশ এত খেয়েছে নড়তেই পারছে না। ধরে ধরে নিয়ে যেতে পারলেই যেন ভাল হয়।

'এত খেলি কেন পরেশ?'

'ওঁরা দিলেন তাই খেলুম। জীবনে এরকম রান্না কখনও খাইনি রে নবেন্দু! পাগলা করে দিয়েছে।'

'তা দিয়েছে, তবে পেট ছেড়ে দিলে কি করবি!'

'এখানে পেট ছাড়বে! এক এক গেলাস জলই তো হজমি। ও তোরা ভাবিসনি কিছু। আমার হজম যন্ত্রটা এমনিই ভাল চলে।'

পরেশ ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর নুবেন্দু চুপচাপ বসে রইলুম, খসখস ফেলা বারান্দায়। বাইরে ধোঁয়া ধোঁয়া দুপুরের রোদ ঝিম ঝিম করছে। নবেন্দু বললে, ব্যাপারটা কি হল বল তো! পাখিগুলো সত্যিই কি মরেনি?'

'মরা পাখি অত সহজে চিনতে ভুল হবে! আচ্ছা নবেন্দু খাবার ঘরে ডক্টর শিলারকে তো দেখা গেল না!'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। অপূর্ব, শিলার মানুষটিকে তোর কি রকম মনে হয়েছে?'

'কেমন যেন চাপা মানুষ। চোখ মুখ দেখলে মনে হয় বেশ নিষ্ঠুর।'

'ধরেছিস ঠিক। সাপ নিয়ে থাকেন বলেই বোধহয় অমন মনে হয়। পাখির রহস্যটা পরিষ্কার করতেই হবে। তা না হলে আঙ্কল ভাববেন, আমরা মিথ্যেবাদী।'

'এখন বেরোবি একটু! অনেকক্ষণ তো বিশ্রাম হল।'

'মন্দ বলিসনি, বাগানটা একটু ঘুরে দেখলে হয়।'

রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্যে আমরা একটা করে কপাল চাপা টুপি পরে নিয়েছি। রোদ আর সোজা এসে চোখে লাগছে না। তা হলেও বাইরেটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। হলকা এসে শরীর পুড়িয়ে দিচ্ছে। নবেন্দুর কথামতো ভরপেট জল খেয়ে নিয়েছি। সহজে লু লাগবে না।

অনেক দূর পর্যন্ত বাগান চলে গেছে। ফুল বাগান নয়। বড় বড় ফলের গাছ। লম্বা লম্বা হাঁটু সমান ঘাস। সাপ থাকতে পারে। শিলার বলেছিলেন, সাপ সহজে মানুষকে কামড়ায় না। ভয় পেলে তবেই ছোবল মারে। উঁচু-নিচু জমি। মাঝে মাঝে পাথরের চাঁই পড়ে আছে। ঘাসের মধ্যে দিয়ে সরসর করে কি যেন একটা চলে গেল লম্বা মত। মনে হল শরীরটা বেশ বিশাল। ঘাসের মাথাগুলো দুলতে লাগল। জমিটা ক্রমশই ঢালু হয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে নেমে চলেছে। বহু দূরে পাহাড়ের কোলে জল চিকচিক করছে। একটা নদী। নদীর উপরে রেল ব্রীজ।

এক জায়গায় দেখা গেল ঘাস নেই। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর সেই জায়গাটায় বেশ বড় মাপের চৌকো কাচ বসানো। কি একটা পাখির কঙ্কাল পড়ে আছে। একটা গিরগিটির হাড়। অদ্ভুত দৃশ্য। নবেন্দু বললে, 'শুনেছি ড্রাগনের নিঃশ্বাসে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এখানে ড্রাগন আছে না কি রে অপূর্ব!'

'কি জানি ভাই। এই দুপুর বেলাতেই আমার কি রকম গা ছম ছম করছে। গিরগিটির কঙ্কালটা দেখ নবেন্দু। দেখলেই ভয় করে।'

'এই পুরু প্লেট গ্লাসটা কিভাবে বসান দেখেছিস। হঠাৎ এইভাবে এখানে কাচ লাগিয়ে রেখেছে কেন?'

'কি জানি ভাই। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে।'

এখন আর তেমন গরম লাগছে না। বড় বড় সেগুন, কৌটো বাদাম আর শালগাছের তলায় তলায় বুনো আগাছার ঝোপ। একটা গাছের তলায় কাঠবেড়লীরা গাদা বাদাম জড়ো করেছে। নবেন্দু বললে, 'না, এখানে কিছু পাওয়া যাবে না। কোথায় খুঁজব পাখির ডেডবডি! কিন্তু ব্যাপারটা বড় রহস্যজনক। আচ্ছা, ওই ঘাস পোড়া জায়গাটায় আর একবার চল তো অপূর্ব!'

আবার আমরা সেই জায়গাটায় এলুম। নবেন্দু নিচু হয়ে অনেকক্ষণ দেখল। পাখির সেই হাড়ের মাথাটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। সরু বাঁকা ঠোঁট।

'বুঝলি অপূর্ব, এটা টিয়ার মাথা। আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কি বল তো!'

'এইখানেই একটু আগে পাখি পাঁচটাকে পোড়ানো হয়েছে!'

'তা হলে আর সব হাড়গোড় গেল কোথায়!'

'হয় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, না হয় ওই কাচের তলায় লোপাট করে দিয়েছে।'

'লোপাট করবে কেন! পাখি কি মানুষ! পাখি মরেছে, কোন কারণে মরেছে। তা নিয়ে কার কি মাথাব্যথা থাকতে পারে!'

'তোর কথাই হয়তো ঠিক। তবু আমার মন বলছে। চল চায়ের সময় হয়ে গেল।'

শ্যারন অসুস্থ

ডাইনিং হলের চায়ের টেবিলে আঙ্কলকে দেখতে পেলুম না। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আমাদের আঙ্কল ডক্টর ল্যাং কোথায়? তিনি চা খাবেন না?'

'তিনি হাসপাতালে, শ্যারন ভীষণ অসুস্থ।'

'শ্যারন কে?'

'ওঁর রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট।'

'আমরা একবার যেতে পারি?'

'কেন পার না! আমিও তো যাব চা খেয়ে।' যিনি বললেন তিনি একজন প্রবীণ মানুষ। বাঙালী। স্বাভাবিক চেহারা। লম্বা নন, বামন নন। শরীরে কোন বিকৃতি নেই।

'আপনিও কি ডাক্তার!'

'ডাক্তার বলতে পার। তবে আমি রেডিওলজিস্ট। নানা রকম 'রে' নিয়ে আমার কারবার, এক্স-রে, গামা-রে, কোবাল্ট-রে।'

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটছি। বাইরের হাওয়ায় রোদের তাপ অনেক কমে এসেছে। বিকেল হয়েছে। আকাশ নীল। দূরের পাহাড় বেশ স্পষ্ট হয়েছে। আবার পাখি-টাখি দেখা যাচ্ছে।

'তোমাদের কিন্তু একটু ক্লাইম্ব করতে হবে। হাসপাতালটা একটু উঁচু জায়গায়।'

'সে আমরা পারব। গত বছর আমরা স্কাউট থেকে ট্রেনিংএ গিয়েছিলুম।'

'এবারে তোমরা এখানে এলে কি করে!'

'হঠাৎ স্টেশনে ডক্টরের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। উনি নিয়ে এলেন।'

'ভীষণ ভাল মানুষ। প্রকৃত খ্রীশ্চান। দেবতার মত। একা এতবড় একটা ফাউণ্ডেশান চালাচ্ছেন। বড় কঠিন বিষয়। গবেষণা যদি সফল হয় পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ প্রাণীর জন্মের ঠিক ঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তোমাদের নাম কি?'

'আমার নাম নবেন্দু।'

'আমার অপূর্ব।'

'আমার পরেশ।'

'আমি ডক্টর বোস।'

হাসপাতালের সামনে বিশাল একটা বাঁধান চত্বর। সাদা একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশ চাপা। গায়ে লেখা ডিপ-ফ্রীজ।

একেবারে সর্বাধুনিক হাসপাতাল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যে ওয়ার্ডে শ্যারন রয়েছেন ডক্টর বোস আমাদের সেখানে নিয়ে এলেন। ডক্টর ল্যাং চিন্তিত মুখে একপাশে দাঁড়িয়ে। বেডে যিনি শুয়ে আছেন, অসাধারণ সুন্দরী। জ্ঞান আছে বলে মনে হল না। মুখটা নীল হয়ে আছে।

'আঙ্কল, কি হয়েছে!'

'পয়েজনিং।'

'বিষ! বিষ খেয়েছেন?'

'না, খেয়েছিলেন পাকা পেঁপে।'

'পেঁপে খেয়ে...।'

'হ্যাঁ নবেন্দু পেঁপেতে স্নেক ভেনম পাওয়া গেছে! যে গাছের পেঁপে সেই গাছের সব ক'টা ফল আমরা টেস্ট করেছি, সবক'টাই ডেডলি। সাপের বিষ সারা গাছটায় ছড়িয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তোমরা যে পেয়েরা গাছটার তলায় মরাপাখি দেখেছিলে, সেই গাছের সমস্ত ফল সাপের বিষে বিষাক্ত হয়ে গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার!'

'আঙ্কল, দিদি বাঁচবেন!'

'খুব চেষ্টা হচ্ছে। লেট আস সী। শোন্, তোমাদের একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রাখি, এখানকার কোন গাছের ফল খাবে না, ফুল শুঁকবে না, কিচেনে বলে দিয়েছি এখানকার কোন ভেজিটেবল ইউজ করবে না।'

'আঙ্কল, অনেক সাপ ছড়িয়ে পড়েছে বুঝি?'

'পরে বলব। আমি নিজেই জানি না। তবে সাবধানে থেক। অবশ্যই মশারি ফেলে শোবে। হাতের কাছে টর্চ রাখবে। সন্ধের পর বাঁধান রাস্তা ছেড়ে একটুও এদিক ওদিক যাবে না। তোমাদের সঙ্গে এখন আমি বেরোতে পারছি না। ডক্টর বোস, আপনি ওদের সামান্য একটু বেড়িয়ে দেবেন?

'ওঃ মোস্ট গ্ল্যাডলি। পেশেন্টের অবস্থা?'

'যমে মানুষের টানাটানি চলেছে।'

ডক্টর বোস আমাদের নিয়ে হাসপাতালের বাইরে এলেন। সাপের বিষ খেলে মানুষের কি কি হতে পারে?

'ওই ভদ্রমহিলার কি হবে ডাক্তারবাবু!'

'সাপের বিষে মানুষ দুভাবে মারা যেতে পারে ভাই। এক ধরনের সাপ আছে যার বিষে মানুষের স্নায়ু অবশ হয়ে যেতে থাকে। আর এক ধরনের বিষ রক্ত জমাট বেঁধে শরীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কি যে এখন হবে বলা শক্ত। আমি অনেকবার বলেছি, ডক্টর শিলারকে বিশ্বাস করবেন না। ও সাপের চেয়েও সংঘাতিক মানুষ। সাপ নিয়ে পাতালে থাকতে থাকতে নিজেই সাপ হয়ে গেছে।'

আমরা চারজনে কথা বলতে বলতে অনেক দূর চলে এসেছি। সামনেই কিছু দূরে সেই বিশাল কাচের ডোম। এতক্ষণ যেটাকে আমরা দূর থেকেই দেখেছি। একটা বিশাল কাচের গামলা যেন উপুড় হয়ে আছে।

'এটা কি জিনিস ডাক্তারবাবু?'

'আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এর নিচে আর একটা রাজত্ব আছে, শিলারের রাজত্ব। এই কাচের গোলকের মাথাটা খোলা,

ভেতরে বিভিন্ন কোণে আয়না বসান। এর মধ্যে দিয়ে সেই পাতালপুরীতে হাওয়া, আলো আর উত্তাপ ঢুকছে। মাঝে মাঝেই দেখবে মাটিতে কাচ বসান। ওই একই কারণ। আলো ঢোকার ব্যবস্থা।

'আপনি কখনও পাতালপুরীতে গেছেন?

'না ভাই, আমার সাহস নেই। কয়েক লক্ষ সাপ কিলবিল করছে।

দৈত্য

প্রথমে ভেবেছিলুম গাছতলায় একটা দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে। দৈত্য নয় মানুষ। ডাক্তার বললেন, 'হ্যালো জেমস?' দৈত্য উত্তর দিলেন, 'হ্যালো ডক।' আমরা প্রত্যেকেই এঁর কাছে যেন শিশুর মত। ডাক্তারবাবু বড় জোর কোমরের কাছে কি তার একটু উপরে পড়বেন। আমরা সব পেটের তলায় পড়ে আছি। মুখ দেখতে হলে পেছন দিকে ঘাড় হেলাতে হবে।

ডক্টর বোস পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'জেমস এখন পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ। জেমস, এই ছেলেরা আমাদের অতিথি।'

জেমস হাসলেন। হেসে বললেন, 'আমি এখন বড় ব্যস্ত? আমার উপর ভার পড়েছে, সব গাছের ফল সংগ্রহ। শুনলুম আমাদের বাগানের সমস্ত ফল বিষাক্ত হয়ে গেছে।'

জেমসের পিঠে একটা বাসকেট। বিভিন্ন ফলে ভরে উঠেছে।

জেমসের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে চললুম। ডক্টর বোস বললেন, 'রাশিয়ায় একজন দৈত্য ছিলেন, নাম মাখনভ। হাইট ছিল ন'ফুট চার ইঞ্চি। ওজন ছিল ১৮২ কেজি। এক একটা হাতের চেটোর দৈর্ঘ্য ছিল ১৩ ইঞ্চি। পায়ের পাতার মাপ ছিল ২০ ইঞ্চি। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই রকম একজন মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, নাম এওয়ার্ট পটগিটার। আমাদের জেমস তাঁদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। জেমসের হাইট প্রায় দশ ফুট। তার মানে প্রায় একতলা উঁচু! প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল। তাই না!'

'সত্যিই তাই।'

আমরা একটা গুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। খুব ঘেঁসঘেঁস লোহার শিক দিয়ে মুখটা বন্ধ। সামনেই একটা নোটিস ঝুলছে।

'সাবধান।'

'এই গুহার মধ্যে কি আছে ডাক্তার বাবু। বাঘ!'

'বাঘের চেয়েও মারাত্মক জিনিস ভ্যাম্পায়ার। ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে জান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রক্তচোষা বাদুড়। এমন জিনিস রাখার কারণ?'

'কারণ একটা কিছু আছে নিশ্চয়। জানেন ডক্টর ল্যাং। ভ্যাম্পায়াররা কোথায় জন্মায় জান? মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকায়। এদের প্রধান খাদ্য হল রক্ত। ধারাল দাঁত দিয়ে শিকারের চামড়া ছিঁড়ে জিভ দিয়ে রক্ত চেটে চেটে খায়। এদের মুখ দেখলেই ভয় করে।'

নবেন্দু বললে, 'একবার দেখা যায় না?'

পরেশ ভয়ে থেমে পড়েছে, 'ডাক্তারবাবু, কোনরকমে বেরিয়ে আসবে না তো।'

'না বেরিয়ে আসার কোন উপায় নেই। দেখছ না লোহার শিক বসান।'

নবেন্দু আবার বললে, 'একবার দেখা যায় না?'

'আচ্ছা, ক্লোজড সার্কিট টিভিতে তোমাদের দেখাব।'

অনেকটা হাঁটা হয়েছে। পথের পাশে একটা কালভার্টে আমরা বসলুম। শুকনো হাওয়া বইছে। সারা শরীরটা যেন চনমন

করছে। দুপুরের অত খাবার কখন হজম হয়ে গেছে। ডক্টর বোস পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন, 'তাহলে লড়াই এবার সত্যিই শুরু হল।'

'কিসের লড়াই?'

'ডক্টর ল্যাং আর শিলারের লড়াই।'

'তার মানে?'

'ক্ষমতার লড়াই। এতবড় একটা ফাউণ্ডেশান, প্রচুর টাকা। একজন গবেষণা করছেন জীবন নিয়ে, আর একজন মৃত্যু নিয়ে।'

'শিলার কেন লাঞ্চে এলেন না?'

'কেন আসবেন? তিনি থাকেন পাতালে। পাতালের রাজা। সেখানে তাঁর আলাদা ব্যবস্থা, আলাদা লোকজন। বেশ কিছু বেদে আর বেদেনী আছে তাঁর পাতালপুরীতে। বছরে একবার সর্প-উৎসব হয়। সে এক দেখবার জিনিস। এই শিলার চাইছেন ডক্টর ল্যাংকে হটাতে। তোমরা বড় খারাপ সময়ে এসে পড়লে।'

সাঁ করে ভীষণ একটা শব্দ হল। আমরা চমকে উঠেছিলুম। একটা ধোঁয়ার রেখা সোজা উঠে গেল মাটি থেকে আকাশে। ডক্টর বোস বললেন, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রকেট। এখান থেকে মাঝে মাঝে রকেট ছোঁড়া হয়। পেনসিল রকেট। ওই দেখ কতদূরে উঠে যাচ্ছে। আশে-পাশের লোককে একটু ভয় দেখাবার জন্যে মাঝেসাঝে এইসব করা হয়। আকাশে আগুন ছোঁড়া হয়।'

ধীরে ধীরে আকাশের আলো কমে আসছে। আকাশের গায়ে পাহাড়ের রেখা ক্রমশ কালো হয়ে আসছে। নবেন্দু প্রশ্ন করলে, 'আশে-পাশের লোককে ভয় দেখাতে হবে কেন?'

'তা না হলেই উৎপাত করবে। একবার এখানে ডাকাত পড়েছিল।'

'ডাকাত!'

'হ্যাঁ গো ডাকাত। ওই যে দূরের পাহাড়। ওখানে কি না আছে? বাঘ আছে, ময়াল শাপ আছে, ডাকাতদের আড্ডা আছে।'

পাহাড়ের মাথার উপর একটা তারা ফুটেছে। সামনের পথটা সোজা একটা টিলার উপর উঠে গেছে। সেখানে একটা গোল গম্বুজ বাড়ি।

'ডাক্তারবাবু ওই গোল বাড়িটাইয় কি আছে?'

'ওটা একটা অবজারভেটারি। একটা টেলিস্কোপ বসান আছে। আকাশ দেখা হয়। ওই যে দেখলে লম্বা জেমস, ও একজন মস্ত বড় জ্যোতির্বিদ। সারারাত জেগে জেগে তারা দেখে। ওর ধারণা দিনের পর দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ নতুন কিছু দেখতে পাওয়া যাবে। মাঝরাতের, শেষরাতের আকাশেও নাকি অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখেছে। একদিন ওর কাছেই শুনে নিও।'

আমরা উঠে পড়লুম। অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে। কলোনীতে একে একে নানা রকমের আলো জ্বলে উঠেছে। জোর, কম জোর, নীল, লাল, সাদা। চার্চের চূড়োয় জ্বলছে নীল আলো। একটা টিপ টিপ আলোর মালা এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে।

ডক্টর বোস বললেন, 'তোমরা রাতের বেলা, রাত বারোটার পর ভুলেও ঘরের বাইরে বেরোবে না। সময় সময় পাহাড় থেকে বাঘ কি হায়না নেমে আসে। এই গুহাটা থেকে ভ্যাম্পায়ারদেরও ছেড়ে দেওয়া হয় শিকার ধরার জন্যে। চার্চের ঘড়িতে যেই বারোটা বাজবে, শুনতে পাবে, সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যাবে। আমি নিজেই একবার ভীষণ বিপদে পড়েছিলুম। সে গল্প তোমাদের আর একদিন বলব।'

সন্ধ্যা

আমাদের গেস্ট হাউসের বারান্দায় তিনজন বসে আছি, চানটান করে ঠাণ্ডা হয়ে। অল্প অল্প বাতাস আসছে ফুলের গন্ধ মেখে। নবেন্দু বললে, 'দেখ অপূর্ব, ডক্টর বোসকে আমার তেমন সুবিধের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। এখানে কি একটা যেন ষড়যন্ত্র চলেছে!'

'ঠিক বলেছিস। আচ্ছা তোর কি বিশ্বাস হয়, রাত বারোটার পর রক্তচোষা বাদুড় ছেড়ে দেওয়া হয়!'

'কি জানি ভাই। ছেড়ে দিলে আবার ধরে কি করে!'

'তাও তো ঠিক কথা। ছাড়লে তো আবার ধরতে হবে।'

'তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার হতে পারে, বাদুড়গুলো হয়তো দিনের আলো ফুটলে নিজেরাই গুহায় ফিরে যায়।'

'তা হতে পারে।'

হঠাৎ চার্চের ঘন্টা বেজে উঠল। এই সময় তো ঘন্টা বাজার কথা নয়। ঘন্টার শব্দ কেঁপে কেঁপে সারা পাহাড়গুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে করুণ আর্তনাদের মত।

নবেন্দু বললে, 'লক্ষণ ভাল নয়। কেউ মারা গেলেই এইভাবে ঘন্টা বাজে। শ্যারন বোধ হয় মারা গেলেন রে অপূর্ব!'

'তা হলে তো আমাদের একবার যেতে হয়।'

'হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। চল বেরিয়ে পড়ি।'

চার্চের মাথার নীল আলোটা জ্বলছে। বহু দূরে হাসপাতাল। পেছনে একটা গাড়ি শব্দ পেলুম আমরা। ছোট্ট একটা স্কুটারভ্যান আসছে। সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন ডক্টর বোস। আমাদের পাশে এসে গাড়িটা থামল। ডক্টর বোস প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় চললে তোমরা?'

পরেশ বললে, 'আঙ্কলের কাছে।'

'আঙ্কেল! সে আবার কে?'

'ডক্টর ল্যাং'।

'ও তোমাদের আঙ্কেল হন বুঝি! ভাল ভাল।' ডক্টর বোস অদ্ভুদ শব্দ করে হাসলেন। হেসে বললেন, 'চল তোমাদের পৌঁছে দি। নাও পেছন দিকে উঠে পড়ো।'

পেছনের আসনে বসে তাঁর ঘাড়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঘাড়ে তিন থাক চর্বি, তার উপর এক থাবা কাঁচা-পাকা চুল। কেমন যেন গুণ্ডা গুণ্ডা দেখতে।

হাসপাতালের সামনে অনেকের জমায়েত। সকলেরই পরনে কালো পোশাক। বিশপ এসেছেন। শ্যারনের বিছানার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর ল্যাং। বিষণ্ণ, করুণ মুখ। পাতলা চশমার তলায় ছলছলে দুটো চোখ। বুকের উপর ঝুলছে সোনার ক্রশ। আমাদের দেখে বললে, 'শি ইজ ডেড! বাঁচান গেল না। এই হত্যার জন্যে কে দায়ী! হেট দি সিন, নট দি সিনার। তা হলেও আমি অপরাধীকে ছাড়ব না।'

আঙ্কলের কথা শেষ হল, ওয়ার্ডে ঢুকলেন ডক্টর শিলার। বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে বুকে দুবার ক্রশ আঁকলেন। উঠে দাঁড়ালেন মাথা হেঁট করে। ডক্টর ল্যাঙের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কেস অফ সুইসাইড।'

'নো এ কেস অফ মার্ডার।'

'মার্ডার! স্বপ্ন দেখছেন ডক্টর ল্যাং।' শ্যারন বরাবরই হোমসিক ছিল। এই পরিবেশে সে মানিয়ে চলতে পারল না। 'ইউ নো ইট বেটার দ্যান মি।'

ডক্টর শিলার ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। সারা ঘর নিস্তব্ধ জুতোর শব্দ ক্রমশ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

মাঝরাতে শ্যারনকে সমাধি দেওয়া হল একটা ছোট টিলার নিচে সমাধি ক্ষেত্রে। আকাশে মরা চাঁদ। ফিকে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে পাতলা কাপড়ের পর্দার মত। সমাধির গর্তে মাটি ফেলার শব্দ হচ্ছে ঝুপ ঝুপ করে।

আঙ্কলের একটা হাত আমার কাঁধে আর একটা হাত নবেন্দুর কাঁধে।

'চলো তোমাদের পৌঁছে দি। আমার মনটা ভীষণ ভেঙে গেছে।'

পরেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আঙ্কল ভ্যাম্পায়ারদের কি এখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?'

'ভ্যাম্পায়ার! ডক্টর ল্যাং যেন একটু আশ্চর্য হলেন, 'ভ্যাম্পায়ার এখানে আসবে কোথা থেকে! কে বলেছে তোমাদের এসব উদ্ভট কথা।'

'ডক্টর বোস।'

'ও। হঠাৎ এইভাবে তোমাদের ভয় দেখাবার মানে?'

'আঙ্কল, ওই গরাদ বসান গুহাটায় তাহলে কি আছে!'

'আরে দূর, ওটা হল পাগলা গারদ। এখানে কিছু পাগলও আছে। আমাদের পরীক্ষার কাজে লাগে।' কথা বলতে বলতে আমরা গেস্ট হাউসে এসে পড়েছি। বাইরের বারান্দার আলোটা জ্বলছে। একটু ছিটকে এসেছে গোলাপ বাগানে।

ডক্টর ল্যাং ধপাস করে একটা বেতে চেয়ারে বসে পড়লেন। বড় ক্লান্ত। বসে বললেন, 'বাতিটা নিভিয়ে দাও, চারদিকে নেমে আসুক নরম অন্ধকার। আর কিছু পরেই ভোরের আলো ফুটবে।'

পরেশ আলোর সুইচটা অফ করে দিল। ডক্টর ল্যাং হাঁটুর উপর হাত রেখে বসে আছেন। আমরা বসতেই বললেন, 'তোমাদের এমন একটা সময়ে এখানে নিয়ে এলুম যে সময়ে এখানকার পরিবেশটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কেন এমন হল আঙ্কল?'

'পাওয়ার পলিটিকস। ক্ষমতার লোভ। আর একটা জিনিস জানবে তোমরা, মানুষের উপকার করলেই মানুষ তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এই যে ডক্টর শিলার, হি ইজ মাই এনিমি নাম্বার ওয়ান।'

'কেন আঙ্কল?'

ডক্টর শিলার এখন রিসার্চ ছেড়ে ষড়যন্ত্রের নায়ক হয়েছেন। এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা হতে চাইছেন। অথচ এই শিলারকে আজ থেকে সাত বছর আগে আমিই এনেছিলুম ইতালি থেকে।'

ডক্টর শিলার

'ডক্টর শিলারের বাবা ছিলেন হিটলারের নাজি বাহিনীতে। যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তিনিও ছিলেন জীববিজ্ঞানী। হিটলারের নির্দেশে তিনি এমন একটা জনিস নিয়ে গবেষণা করেছিলেন যার প্রয়োগে মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে যায় কিংবা অমানুষ হয়ে যায়। শিলার পালিয়ে এলেন প্রথমে গ্রীসে, তারপর জাত লুকিয়ে ছিলেন ইতালিতে। ইতালিতেই আমার সঙ্গে পরিচয়। থাকতেন একটা বস্তিতে। দু বেলা ভাল করে খাবার জোটে না। কোন রোজগার নেই। এক ধরনের ছোট ছোট বিষাক্ত সাপ নিয়ে সন্দেহজনক একটা ছোট্ট কাফেতে এসে সন্ধে বেলা বসে থাকতেন। যে কোন মানুষের জিভে এইসব ছোট্ট সাপের ছোবলে এক ধরনের নেশা হয়। শিলার এইভাবেই পুলিশের নজর এড়িয়ে নেশার কারবার করে সামান্য টাকা রোজগার করেতন। অথচ পণ্ডিত মানুষ। সেই শিলারকে সুস্থজীবনে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম। ভাবলুম,মানবকল্যাণে তাঁর পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগাব। কিন্তু যার বংশের ধারাতেই পাপ, সে পাপ ছাড়া থাকে কি করে। জান নবেন্দু, এই বংশের ধারা নিয়েই আমার গবেষণা। মানুষ কেন লম্বা হয়, বেঁটে হয়, ফর্সা হয়, কালো হয়, চোখের মণি কেন বেড়ালের মত হয়, চুল কেন বাদামী হয়, কুঁচকে যায়, কেন শয়তান হয়, পাগল হয়, সাধু হয়।'

হঠাৎ একটা কাশির শব্দ কানে এল। বারান্দার শেষ কোণে একটা বেতের চেয়ার, এতক্ষণ তো ওই চেয়ারে কেউ ছিলেন না।কে যেন বসে আছেন, সাদা মত। বুক পর্যন্ত ঝুলে থাকা লম্বা লম্বা সাদা দাড়ি। এক মাথা সাদা চুল। আলোটা জ্বালতে উঠলুম। ডাক্তার বারণ করলেন, 'নো লাইট মাই বয়েজ।'

ডক্টর ল্যাং উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন চেয়ারটার দিকে। হাঁটু মুড়ে বসলেন বৃদ্ধের পায়ের কাছে। বৃদ্ধ তাঁর হাত রাখলেন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডাক্তারের মাথায়। অনেকক্ষণ কথা হল দুজনের। শেষরাতে মরা চাঁদ নেমে এসেছে পশ্চিমের পাহাড়ের মাথার উপর অনেক তারাই আকাশ থেকে অদৃশ্য। একটিমাত্র সাহসী তারা এখনও তরল অন্ধকারের গায়ে লেগে আছে।

কানে এল বৃদ্ধ বলছেন, 'আই মাস্ট গো নাও। দি ডে ইজ ব্রেকিং আউট।'

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ ধীর পায়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়লেন। হাঁটছেন। ধীরে ধীরে সমাধি ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কেমন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেলেন। ডাক্তার সেইদিকে তাকিয়ে বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকলেন।

'আঙ্কল, উনি কে? কে এসেছিলেন! কি বলে গেলেন!'

নবেন্দুর প্রশ্নে ডাক্তার চেয়ার টেনে আবার বসলেন। হাত দুটো হাঁটুর উপর মোড়া।

'নবেন্দু, তোমরা বিশ্বাস করবে? উনি কোনও জীবিত মানুষ নন। মৃত। আজ থেকে সাত বছর আগে উনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আমি আজকে যা হয়েছি তা হতে পেরেছি ওনার চেষ্টায়, শিক্ষায়, দীক্ষায়। আমার গুরু। একটু আগে আমি মনে মনে ওঁকেই স্মরণ করছিলুম। ডক্টর ডেভিস, আমার জীবনের সব।'

পরেশ চেয়ার উল্টে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ছিল। শরীর কাঁপছে, ভূ, ভূ, ভূত।'

ডাক্তার একটু অসন্তুষ্ট হলেন, 'ভূত শব্দটা বড় নিকৃষ্ট শব্দ। ডোণ্ট ইউস ইট। সে স্পিরিট। তুমি জেনে রাখ পরেশ, মৃত্যুতেই আমরা শেষ হয়ে যাই না, যেতে পারি না। মানুষকে অত সহজ করে নিও না। সাধরণ বুদ্ধি দিয়ে জীবনের রহস্য জানা যায় না। আমরা কি আমরা নিজেরাই তা জানি না। পৃথিবীর যে দিকেই তাকাবে সেদিকেই দেখবে বিশাল একটা ইচ্ছার রূপ। লেট দেয়ার বি লাইট অ্যাণ্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট। সেই বিশাল ইচ্ছাশক্তির সামান্য অংশও যদি আমরা পেয়ে যাই, আমরা সব করতে পারি। আমার ইচ্ছেতেই কোন্ সুদূর থেকে উনি এসেছেন। মানুষ ইচ্ছে করেছে তাই আকাশে উড়েছে। চাঁদে গেছে, গ্রহান্তরে গেছে, নদীকে বেঁধেছে, পর্বতকে নামিয়ে এনেছে।'

নবেন্দু জিজ্ঞেস করলে, 'ডক্টর ডেভিস কি বলে গেলেন আঙ্কল!'

'ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রের কথা! আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে বৃষ্টি নামবে এই পাহাড়তলিতে! ঠিক তার তিন দিন পরে ডক্টর শিলার তাঁর সর্ববাহিনী নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবেন। তছনছ করে দেবেন এই গবেষণাকেন্দ্র। আমার বড় বিপদের দিনে তোমরা এসে পড়লে। তোমরা বরং আজই চলে যাও নবেন্দু। এখানে আর থেকে কাজ নেই।'

'তা হয় না আঙ্কল। আপনাকে বিপদে ফেলে চলে যাব! আপনার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করব। আপনি কিছু ভেবেছেন কি, কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়!'

'হ্যাঁ, ডক্টর ডেভিস বলে গেলেন।'

'কি বলে গেলেন?'

'তোমরা আমার সোলার ওভেন দেখেছ?'

'দূর থেকে।'

'ওই ওভেনে সাতদিন ধরে শুধু কাচ তৈরি হবে। এখানকার পথঘাট সব কাচ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মসৃণ কাচ। জান তো সাপ মসৃণ জায়গায় চলাফেরা করতে পারে না। এক জায়গায় পড়ে পড়ে নড়বে, কিলিবিলি করবে কিন্তু একচুল এগোতে পারবে না। এইভাবেই ব্যর্থ করে দিতে হবে শিলারের হানা।'

'তার আগেই আমরা যদি হামলা চালাই! পাতালপুরী আক্রমণ করি!'

'না, শত্রুকেই আগে এগিয়ে আসতে দাও। আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষা করব। সেইটাই হবে আমাদের ধর্ম।'

ডক্টর ল্যাং উঠে দাঁড়ালেন। সারারাত জেগে আছেন কিন্তু চেহারা দেখে কিছুই মনে হয় না, যেন তাজা ফুল। বারান্দার এমাথা থেকে ওমাথা একবার পায়চারি করে এলেন। লাল হয়ে উঠেছে পুবের আকাশ। বুকে হাত মুড়ে সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে তোমরা থাকছ?'

নবেন্দু উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বললে, 'নিশ্চয় থাকছি। শুধু থাকছি না আপনাকে সাহায্যও করছি। অবশ্য আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী।'

'ভেরি গুড! আমি তাহলে এখন যাই। তোমাদের ঘরে আমার সঙ্গে যোগাযোগের টেলিফোন আছে, সেইটা ব্যবহার করবে?'

আচ্ছা আঙ্কল?'

'সাতটায় ব্রেকফাস্ট। গেট রেডি। চান করে ফেল, ভাল লাগবে।'

ডক্টর ল্যাং এগিয়ে চলেছেন সোজা পুব দিকে। দীর্ঘ শরীর। লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলে গেলেন।

পরেশ

গভীর রাতে আমাদের সভা বসেছে ডক্টর ল্যাং-এর নিজের ঘরে! বেশ কিছু বিশ্বাসযোগ্য কর্মী চাই। ডক্টর শিলারের সঙ্গে কারা কারা হাত মিলিয়ে বসে আছেন বোঝা যাচ্ছে না। কর্মী বাছাই করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? একজন গুপ্তচর চাই। আমি আর নবেন্দু গুপ্তচর হতে রাজি আছি। বড় শক্ত কাজ। সকলের সঙ্গে ভাল মানুষের মত মিশতে হবে। নজর রাখতে হবে। তাদের কথাবার্তা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে হবে। সে সময় কোথায়। ডক্টর ল্যাং বললেন, 'ঠিক বলেছ, অত সময় কোথায়! আমাকে একটু নিষ্ঠুর হতে হবে। কিছু বন্দী তৈরি করি।'

'কিভাবে করবেন? বন্দুক ধরে!'

'না। ওষুধ খাইয়ে।'

'সে আবার কি?'

'বিজ্ঞান, নবেন্দু, বিজ্ঞান। এমন কিছু ওষুধ আছে যা খেলে মানুষের স্মৃতি নষ্ট হবে সাময়িকভাবে কিন্তু কাজ করার ক্ষমতা ঠিকই থাকবে। বাধ্য বালকের মত যা করতে বলব তাই করবে।'

'আঙ্কল তাহলে তাই করুন।'

'কাল সকালের লাঞ্চে চা এবং কফিতে ওই ওষুধ থাকবে।'

'আমরাও খাব?'

'না, তোমরা কেন খাবে! তোমাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। সোনালী টীপট থেকে তোমরা কিছু খাবে না। তোমাদের জন্যে টেবিলে থাকবে ছোট্ট সাদা একটা পট। গুড নাইট। আজ তাহলে শুয়ে পড়। তোমরা যেতে পারবে তো! ভয় করবে না!'

'না আঙ্কল।'

'বেশ, তাহলে আমাদের যাত্রা হল শুরু।'

বাইরের আকাশে চাঁদ। ছায়া ছায়া ধোঁয়া ধোঁয়া। আশে-পাশে মাটিতে যেখানে কাট বসানো সেখান থেকে নীল আলো ঠিকরোচ্ছে। এমন সুন্দর স্বপ্নময় জায়গা কী রকম অসুন্দর হতে চলেছে! দূরে পাহাড়ে কি যেন ডাকছে। নবেন্দু বললে, 'ফেউ ডাকছে। বোধ হয়, বাঘ বেরিয়েছে রে!'

নবেন্দুর কথা শুনে পরেশ আমার হাত চেপে ধরল। আমাদের সঙ্গে এসে পরেশটা মহাবিপদে পড়েছে।

কিছু দূরে পথের পাশের সাঁকোয় কে যেন বসে আছে। মানুষ না প্রেতাত্মা! এখানে এক বিশ্বাস অবিশ্বাসের জগৎ তৈরি হয়ে আছে, আমাদের সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে যেন! থেমে পড়লে চলবে না, সাহস করে এগিয়ে যেতেই হবে।

বসে আছেন ডক্টর বোস। এত রাতে কি করছেন! ডক্টর বোস বললেন, 'আরে এত রাতে কোথা থেকে? চাঁদের আলোয় বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি!'

নবেন্দু বললে, 'ঘুম আসছে না কিছুতেই।'

'স্বাবাবিক, নতুন জায়গা তো! আমরাই ঘুম আসছে না! এস একটু বসে যাও। এমন সুন্দর রাত! পাহাড়ে আবার ফেউ ডাকছে, তার মানে বড় মিঞা আজ শিকারে বেরিয়েছেন!'

ডক্টর বোসের পাশে একটু বসতেই বল। মুখে পাইপ। তামাকের গন্ধ ফুলের গন্ধ ইউক্যালিপটাস পাতার গন্ধ সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা গন্ধময় পরিবেশ।

ডক্টর বোস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'কাল পূর্ণিমা।'

কথা বলতে গিয়ে পাইপটা মুখ থেকে খুলে মাটিতে পড়ে গেল। ডক্টর বোস নিচু হলেন পাইপটা কুড়োবার জন্যে। ডক্টর বোস যেই সোজা হলেন, পাশেই বসেছিল পরেশ, পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল ঝপাত করে। পেছন দিকেই ঢালু জমি, আগাছা, জঙ্গল। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছি, কি হল পরেশের! নবেন্দু ঢালু জমি বেয়ে নামতে গেল।

ডক্টর বোস গম্ভীর গলায় বললেন, তোমরা এক পাও নড়বে না।

বিপদ হবে। পরেশকে পাবে না। তোমাদের এই কারণেই বসতে বলেছিলুম। আছা গুড নাইট।'

ডক্টর বোস উঠে দাঁড়ালেন!

নবেন্দু বললে, 'তার মানে?'

'তার মানে পরেশ এখন আমাদের হাতে!'

'আমাদের হাতে মানে?'

'আমাদের হাতে মানে, তোমাদের আঙ্কলের হাতের বাইরে। ওই হাঁদা বোকা ছেলেটা এখন আমাদের টোপ। ওই টোপকে বঁড়শিতে বেঁধে এখন বড় মাছটাকে ধরতে হবে। বুঝল কিছু!'

ডক্টর বোস পাইপ টানতে টানতে চলে গেলেন। আমরা দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

'কই হবে নবেন্দু!'

'তাই তো ভাবছি রে! মহা বিপদ হল বোকা ছেলেটাকে নিয়ে। আমাকে নিয়ে গেল না কেন?'

'আমাকেও তো নিতে পারত!'

ফেউয়ের ডাক যেন আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। নবেন্দু বললে, 'এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চল অঙ্কলের জাছে ফিরে যাই।'

একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। দূর থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। বোধ হয়, পরেশকে ওরা সর্পরাজত্ব ওই গাড়িতে করেই নিয়ে গেল। ডক্টর বোসকে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হল!

'নবেন্দু ডক্টর বোসকে হঠাৎ পেছন দিক থেকে আক্রমণ করলে কেমন হত! আমাদের তো অনেক স্কাউটের প্যাঁচ জানা ছিল।'

'আমার কাছে কয়েক গজ দড়ি থাকলে একবার দেখে নিতুম রে। এখন আর উপায় নেই।'

ডক্টর ল্যাঙের ঘরে বাতিদানে বাতি জ্বলছে। টেবিলের উপর নীল মলাটের একটা মোটা বই। মলাটে সোনালী অক্ষরে লেখা বাইবেল। তার উপর একটা ছোট ক্রশ।

'তোমরা ফিরে এলে।'

'পরেশকে ওরা হঠাৎ ধরে নিয়ে গেল।'

'সে কি? কিভাবে? কারা ধরে নিয়ে গেল?'

'ডক্টর বোসই আসল লোক। দলে আর কে কে ছিলেন বোঝা গেল না।'

নবেন্দু পুরো ঘটনাটা বলে গেল। ডক্টর ল্যাং সারা ঘরে পায়চারি করতে করতে সব শুনলেন। শেষে স্থির হয়ে বসলেন চেয়ারে।

'পরেশকে কিভাবে উদ্ধার করা যাবে আঙ্কল?'

'যেমন করেই হোক করতে হবে। বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

ঘরের কোণের টেলিফোনটা হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল। টেলিফোনটার পাশেই একটা চৌকো বাক্স, সেই বাক্সটার একটা সুইচ টিপে ডক্টর ল্যাং রিসিভারটা কানে তুলে নিলেন, 'হ্যালো, ডক্টর ল্যাং বলছি।' ওদিক থেকে যিনি কথা বলছেন তাঁর গলা আমরাও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

'শিলার বলছি। গুড আফটারনুন ডক্টর। ঘুম আসছে না কিছুতেই। ছেলেটা ভয়ে এত চিৎকার করছে। ভীতু কাঁহাকার। ওই যে শুনুন।'

পরেশের ভীষণ ভ্যের চিৎকার কানে এল। আবার শিলারের গলা।

'কিছুই না, ওকে একটা জালের খাঁচায় রেখেছি। তার চারপাশে অজস্র সাপ কিলবিল করছে। ছেলেটা এমন করছে যেন জীবনে কখনও সাপ দেখেনি। ওই ছেলেটার উপরেই আমার একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার ইচ্ছে আছে। সম্প্রতি বোড়াসাপ থেকে আমি এক ধরনের বিষ আবিষ্কার করেছি। ভারি সুন্দর জিনিস। মানুষের রক্তে অল্প অল্প করে মেশালে গায়ের চামড়া সাপের চাপড়ার মত হয়ে যায়। হাউ নাইস হাউ নাইস। আজ রাতটা যাক, কাল থেকে শুরু করব। ওহে খোকা ঘুমোও ঘুমোও, তুমি আমার মানুষ গিনিপিগ।'

পরেশের চিৎকার শিলারের হাসি একসঙ্গে ভেসে এল।

ডক্টর ল্যাং জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি চাইছেন?'

'আমি চাই কিংডাম অফ গড। ভগবানের রাজত্বের অধীশ্বর হতে চাই।'

'হোয়াট ইজ দ্যাট? সেটা আবার কি?'

'আমি পরে আছি পাতালে। উঠতে চাই মর্ত্যে। সেখান থেকে স্বর্গে।'

'উঠুন না, কে বাধা দিচ্ছে!'

'ইউ, ইউ, আপনি বাধা দিচ্ছেন।'

'আমি?'

'ইয়েস। একই বনে দুটো বাঘা থাকতে পারে না। ইউ মাস্ট গো। আপনাকে যেতে হবে।'

'কোথায় যাব?'

'জাহান্নামে। শ্যারন গেছে। পরেশও যাবে। একে একে সবাই যাবে। আমি যে কলকাঠি নেড়েতি তাতে কে কখন যাবে আমি নিজেই জানি না।'

'আমি থাকলে অসুবিধেটা কি হচ্ছে? আমি আছি আমার গবেষণা নিয়ে, আপনারা আছেন আপনাদের নিয়ে। গোলমালটা কোথায়?'

'গোলমাল ক্ষমতা নিয়ে। আপনি আমাদের মাথার উপর বসে আছেন সব ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে। সেইটাই আমাদের সহ্য হচ্ছে না।'

'আমাদের মধ্যে কে কে আছেন? বহুবচন ব্যবহার করছেন কেন?'

'তাঁর কারণ আমার দলে আপনি ছাড়া সবাই আছেন।'

'তাই নাক? তাহলে আসুন আমরা সকলে বসে ঠিক করি কিভাবে কাজকর্ম চলবে কে চালাবে?'

'বসাবসির কি আছে। ঠিকই হয়ে গেছে আমিই হব সর্বেসর্বা।'

'বেশ তাই হবে। তার জন্যে শুধু শুধু একটা নিরীহ ছেলেকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?'

'আমার রাজত্বে আপনাকে আসতে হবে। একটা চুক্তিপত্রে সই করতে হবে। তারপর মাথা নিচু করে প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'বেশ তাই হবে। তা হলে পরেশকে ছেড়ে দিন।'

'পাগল না কি। আগে দেখাসাক্ষাৎ হোক। লেখালিখি হোক। তারপর মুক্তি। কাল রাত বারোটা। কেমন! ততক্ষণ বোকা ছেলেটাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি। গুড নাইট। কালই হবে লাস্ট সাপার।'

কট করে একটা শব্দ হল। শিলার লাইন কেটে দিলেন। ডক্টর ল্যাং রিসিভারটা নামাতে নামাতে বললেন, 'ঈশ্বর এই অপরাধীকে ক্ষমা করুন।'

নবেন্দু বললে, 'স্কাউনড্রেল।'

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'উত্তেজিত হবে না। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। একেই বলে দাবা খেলা। এক পাশে জীবন অন্য পাশে মৃত্যু। খুব সাবধানে খেলতে হবে এ খেলা।'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুমা না, 'আঙ্কল, আপনার নিজের এত ক্ষমতা, এত শক্তি, আপনি কিছু করতে পারছেন না কেন?'

'পারছি না গোটাকতক কারণে। প্রথম কারণ, পরেশ। পরেশ ওদের হাতে বন্দী। দ্বিতীয় কারণ, সৃষ্টি বড় শক্ত কাজ। ধ্বংস তার চেয়ে অনেক সহজ ব্যাপার। একটা জীবন সৃষ্টি করতে পারি না, সহজে মেরে ফেলি কি করে! ডক্টর শিলারের রাজত্ব তছনছ করে দিতে আমার কয়েক মিনিট সময় লাগবে।'

নবেন্দু খুব চিন্তিতভাবে বললে, 'তাহলে কি হবে?'

'কিচ্ছু ভেব না তোমরা। আজকের রাতটা তোমরা আমার ঘরে কাটাও। আমি একবার সমাধি থেকে ঘুরে আসি।'

'আমরাও যাব।'

'কেন, ভয় করছে?'

'না ভয় নয়। আপনাকে আর একলা ছাড়ব না।'

'বেশ চল।'

বাইরের ঝাপসা ভাবটা কেটে গিয়ে চাঁদের আলোর জোর বেশ যে বেড়ে গেছে। মা এই রকম জ্যোৎস্না দেখলে বলেন, ফিনিক ফুটছে। মন ভাল থাকলে এমন চাঁদের আলোয় গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।

'তোমরা এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।'

ডক্টর ল্যাং সারি সারি ক্রশের মধ্যে দিয়ে পথ করে করে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন কিছুই বললেন না। সমাধি ক্ষেত্রটা নেহাত ছোট নয়। অনেক মৃত্যু হয়েছে এখানে বছরের পর বছর ধরে। কেন এত মৃত্যু!

'নবেন্দু, এখানে, মানুষ মরে বেশি, তাই না। কত ক্রশ দেখেছিস?'

'আমার মনে হয় এটা অনেক পুরানো কালের সমাধি। হয়তো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কাল থেকেই এই সমাধিতে মানুষকে কবর দেওয়া হচ্ছে! হয়তো সৈন্যবাহিনীর ছাউনি ছিল!'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে।'

ডক্টর ল্যাংকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে আকাশের গায়ে পাহাড়ের রেখা। বাতাস বইতে শুরু করেছে জোরে। হিস হিস শব্দ হচ্ছে। কি হবে, কি হতে চলেছে কে জানে! পাহাড়ের দিকে এক পাল কুকুর ডাকছে।

দূর থেকে একটা মূর্তি এগিয়ে আসছে।'

নবেন্দু বললে, 'ওই যে আঙ্কল আসছেন।

ঠিকই বলেছে। আঙ্কল আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মুখে প্রশান্ত হাসি। যেন স্বয়ং যীশু দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সামনে।

'পেয়ে গেছি নবেন্দু, পেয়ে গেছি দাবার শেষ চাল। আর ভাবনা নেই। চল, চল, রাতটা কণ রকমে কাটিয়ে দি। কাল মধ্য রাতে হবে শেষ খেলা।'

আমরা আবার ফিরে এলুম আঙ্কলের ঘরে। ইলেক্ট্রিক কেটলিতে গরম জল চাপল।

'এক কাপ করে কফি খাওয়া যাক, কি বল। এমন রাতে কফি না খেলে হয়!'

দেওয়ালের গা থেকে চাপা আলো ঠিকরোচ্ছে। কেমন যেন একটা স্বপ্নের জগৎ। কফি খাওয়া হল।

'নাও তোমরা এবার একটু শুয়ে পড়। আমি বসে বসে তোমাদের বেহালা বাজিয়ে শোনাই।'

সুরে ঘর ভরে গেল। মনে হল কে যেন দূর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কখনো মনে হল পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাস বইছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়লুম এক সময়ে, আমার মনে নেই, নবেন্দুরও মনে পড়ে না।

শেষ ভোজ

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা। পাতালপুরীতে নামার সেই দরজা দিয়ে কিছু আগেই আমাদের গাড়ি নেমে এসেছে। নবেন্দু সামনে বসেছিল। আমি বসেছিলুম পেছনে। আমার পাশে ছোট একটা বাক্স আর আঙ্কলের বেহালা। ডক্টর ল্যাং গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরেছেন। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা।

গোল একটা ঘরে আমরা বসেছি। লম্বা টেবিল সাদা কাপড়ে ঢাকা। চাপা আলো চারপাশ থেকে একটা আভার মত বেরিয়ে আসছে। শিলার পরেছেন ম্যাজিসিয়ানদের মত কালো একটা গাউন। বুকের উপর গলা থেকে ঝুলছে চেন দিয়ে বাঁধা দাঁতের মত সাদা। একটা কি জিনিস। ডক্টর বোস বসে বসে পাইপ টানছেন। আর যাঁরা রয়েছেন আমরা আগে দেখিনি।

শিলার টেবিলের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। শয়তানের ছবি দেখিনি। মনে হয় এই রকমই দেখতে ছিল। শিলার বললেন, 'ঠিক বারোটা। দিন বদলে গেল, তারিখ বদলাল। এইবার বদলে যাবে আমাদের দু'জনের ভাগ্য।'

শিলার হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপলেন। কিছু দূরে একটা কাচের পর্দায় ঝিরঝির করে আলো কেঁপে উঠল। ভেসে উঠল পরেশ। পরেশ একটা চেয়ারে বসে আছে। দু হাত দূরে তাদের জালের গাঁয়ে অসংখ্য সাপ কিলবিল করছে।

আমি চিৎকার করে বল্লুম, 'আমাদের পরেশ।'

শিলার বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের পরেশ। এইবার আমার তৈরি কয়েকটা জিনিস দেখাই। মানুষের রূপান্তর।' দৃশ্য পালটে গেল। পর্দায় মধ্যবয়সী একটি মানুষের সুখ। সারা মুখে লাল লাল অসংখ্য ফুসকুড়ি। দেখলেই গাটা কেমন করে ওঠে।

'এক নম্বর মানুষ। এর নাম রেখেছি মিঃ ওয়ার্ট। এক ধরনের সাপের বিষ ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ করিয়ে আমি এই মানুষটির চামড়ায় রূপান্তর শুনেছি।'

পর্দায় ভেসে উঠল দ্বিতীয় আর একটি মুখ। সারা মুখে চাপড়া চাপড়া লাল দাগ। নাকটা থেবড়ে গেছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

'দু'নম্বর মানুষ। নাম রেখেছি, মিঃ লেপার। এক ধরনের কুষ্ঠ। ওই সাপের বিষেরই কেরামতি।' ডক্টর ল্যাং বললেন, 'এইসব বীভৎস পরীক্ষা আমাদের দেখাবার মানেটা কি! আমি তো প্রস্তুত হোই এসেছি। পরেশকে এনে দিন আমরা পাহাড়তলি ছেড়ে চলেই যাই।'

শিলার হাসতে হাসতে বললেন, 'মাত্র দুটো দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন, এখনও তো অনেক আছে। যেমন ধরুন, আমার পায়ের কাছে একটা বোতাম আছে, সেটাতে চাপ দিলেই আপনারা যে দিকটায় তিনজনে বসে আছেন সেই মেঝেটা চেয়ার সমেত সাঁ করে পেছনের দেওয়ালে ঢুকে যাবে, আর সেখানে আছে, এই দেখুন।'

পর্দায় ভেসে উঠল একফালি ঘর, মেঝেতে থিক থিক করছে ছোট ছোট মিশকালো সাপ।

'এরা তাজা মানুষকে চুমু খেতে বড় ভালবাসে।'

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'তাই নাকি?'

'তাছাড়া যে চেয়ারে বসে আছেন, সেই চেয়ারের তলায় আছে একটা করে চৌকো বাক্স। তার মধ্যে আছে একটা করে কেউটে সাপ। এমন কায়দা করা আছে বাক্সটা বের করে না নিলে চেয়ার ছেড়ে ওঠা যাবে না, উঠতে গেলেই ফোঁস করে কামড়ে দেবে

পেছনে। ভীষণ বিষাক্ত। মাসখানেকের জমা বিষ রয়েছে দাঁতে।'

ডক্টর ল্যাং মনে হল ভীষণ ভয় পেয়েছেন। আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি; নবেন্দুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। আসলে ভয়ে আমার মাথাটাই যেন কেমন হয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি, মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখান থেকে বেঁচে বেরোতে পারব বলে মনে হয় না। মায়ের জন্যে মনটা কেমন যেন ছটফট করে উঠল। মন ছটফট করলেও শরীরটাকে স্থির রাখতে হবে, তা না হলেই ফোঁস করে পাছায় কামড়ে দেবে!

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'তা হলে পরীক্ষা করে দেখতে হয় আপনার বিষ কেমন। যে কোনও বিজ্ঞানীর কাজই হল বিশ্বাস করারা আগে পরীক্ষা করে দেখা। এক্সপেরিমেণ্ট, অবজারভেশান, ইনফারেনস। ভয় পেলে তো চলবে না।'

শেষ কথাটা বলেই ডক্টর ল্যাং ঝড়াস করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই ফোঁসের বদলে হাসির শব্দ শুনছিঃ। তীক্ষ্ণ, ধারাল হাসি। ডক্টর ল্যাং হাসছেন আর বলছেন,' ডক্টর শিলার, হয় আপনার সাপ ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা আপনার হিসেবের ভুলে চেয়ার বদলে গেছে, অথবা আপনার আদেশ অমান্য করছে। মনে হয়, শেষটাই ঠিক।'

ডক্টর শিলারের মুখে চোখে বিব্রত ভাব।

ডক্টর ল্যাং বলেন, 'তোমারও উঠে দাঁড়াও।'

উঠে দাঁড়াতে পারলে তো আমরা বেঁচে যাই। আমরা দু'জনেই কলের পুতুলের মত উঠে দাঁড়ালুম। কিছুই হল না।

ডক্টর ল্যাং হেসে উঠলেন, 'ডক্টর শিলার, এইবার আপনাকে আর একটা সংবাদ দি। আপনার আর একটি ব্যর্থতা। পরেশ এই মুহূর্তে বাইরে গাড়িতে বসে আছে। আপনারা খাঁচা এখন শূন্য।'

'মিথ্যে কথা। হতেই পারে না।'

'বেশ তো আপনার টিভি চালু করুন।'

ডক্টর শিলার সুইচ টিপলেন। পর্দায় ভেসে উঠল শূন্য খাঁচা খাঁচার গায়ে আর সাপ কিলবিল করছে না। ডক্টর শিলার হতভম্ব হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে পাগলের মত বললেন, 'নো নো, দ্যাট কাণ্ট বই। হতেই পারে না।'

'হয় হয়, অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন এই মুহূর্তে আপনার পেছন দিকের দেওয়ালটা খুলে পড়ছে আর.'।

ডক্টর শিলার পেছন দিকে তাকাতেই একটা চোখ ঝলসান আলো সারা ঘরে খেলে গেল। যেন বাজ পড়ল। দেওয়ালে একটা বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রথমেই সেই গর্ত দিয়ে গলে, এল ভাল্লুক আলি। সে এসেই দু হাতে শিলারকে জাপটে ধরল। তার পেছনেই এক বশাল লম্বা জেমস। দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল ডক্টর ল্যাং-র অনুচর বাহিনীতে।

শিলার চিৎকার করে বললেন, ডক্টর বোস, আমাদের সমস্ত সাপ ঘরে ছেড়ে দিন। ওয়াটসন, ওয়াটসন!' ডক্টর বোস বসে বসে যেমন পাইপ টানছিলেন সেই রকমই পাইপ টানতে লাগলেন। মৃদু মৃদু হাসছেন। ডক্টর ল্যাং বললেন, 'আপনার সব সাপ মরে গেছে ডক্টর শিলার। চব্বিশ ঘণ্টা সময় একজন মানুষের আত্মরক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময়।'

মোটা মানুষ বিজয়ার দিন যেভাবে কোলাকুলি করে সেইভাবে আলি ডক্টর শিলারকে তখনও জাপটে ধরে আছে। শিলার রাগে গরগর করতে করতে বলছেন, 'ন্যাস্টি বেয়ার, ইউ স্মেল গার্লিক। আমি পকেটে হাত ঢোকাতে পারছি না তাই, তা না হলে তোর ফুসফুস এখনই আমি ছেঁদা করে দিতে পারতুম।'

ডক্টর ল্যাং আদেশের সুরে বললেন, 'মিস্টার জেমস, গিভ হিম এ শট।'

জেমসের হাতে সেই ইঞ্জেকশান লাগাবার জেট গান। ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হল। ডক্টর শিলার যেন একটু কেঁপে উঠলেন।

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'এখন আপনার প্রয়োজন প্রচণ্ড ঘুম, সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং মানুষের মত মেলামেশা। আর সাপ নয়, সাপের বিষ নয়। এবার পাখি আর ফুল। ওয়াটসন, ওয়াটসন।'

'ইয়েস স্যার।'

ধবধবে সাদা পোশাকে ঘরে এলেন ওয়াটসন! চোখে গোল্ড ফ্রেমের চশমা।

'ডক্টর ওয়াটসন, চলুন তা হলে, এঁকে অ্যাসাইলামে রেখে আসি। দীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন, তা না হলে ডক্টর শিলার একজন উম্মাদ খুনী হয়ে যাবেন।'

ডক্টর বোস উঠে দাঁড়ালেন। তখনও তাঁর মুখে পাইপ। ডক্টর ল্যাং টেবিলের ওপাশ থেকে হঠাৎ তাঁর ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। ডক্টর বোস দু'হাত দিয়ে সেই হাতটা চেপে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগলেন।

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রতিষ্ঠান আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। চলুন, লেট আস গো আপ।'

গোল গর্তটার মধ্যে দিয়ে আমরা একে একেবেরিয়ে এলুম। কিছু দূর এগোতেই মনে হল বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছে। আরে, ওই তো মাথার উপর তারায় ভরা আকাশ। আমরা একে একে উঠে এলুম সেই সমাধি ভূমিতে। সব শেষে বেরিয়ে এলেন ডক্টর বোস আর ডক্টর ল্যাং। মাটির উপর একটা ক্রশ শুয়েছিল। ডক্টর ল্যাং দু'হাত দিয়ে সেটাকে সোজা করে দিতেই গর্তের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। একটা গাড়ি আসছে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। গাড়িটা থামল। একটু পরেই দেখি কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে। আমরা সকলেই চিৎকার করে উঠলুম, 'পরেশ পরেশ।'

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'আমাদের হিরো।' দু'হাতে পরেশকে বুকে চেপে ধরলেন।

কি হোল

ডক্টর শিলারের অবসন্ন দেহটাকে ওঁরা ধরাধরি করে সেই গুহাটায় নিয়ে গেলেন, যে গুহায় ডক্টর বোস বলেছিলেন ভ্যাম্পায়ার আছে। ব্যাপারটা তাহলে কি হল। ডক্টর বোস সম্পর্কে আমাদের ধারণা তাহলে পালটাতে হচ্ছে।

'নবেন্দু, সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল!'

চার্চের সামনে বেশ বড় একটা জমায়েত। চাঁদের আলো। চার্চের ছায়া। নীল আকাশের দিকে চূড়োটা উঠে গেছে।

'ঠিক বলেছিস অপূর্ব, সবই কেমন গুলিয়ে গেল। কিভাবে কি হল! ডক্টর বোসকে আমরা সন্দেহ করেছিলুম। ডক্টর ল্যাং কি তাহলে আমাদের সঙ্গে অভিনয় করলেন?'

'সে রকমই তো মনে হচ্ছে।'

চার্চে ঢোকার সিঁড়ির উঁচু ধাপের আলোছায়ায় ডক্টর ল্যাং দাঁড়িয়েছেন, যেন সভা হচ্ছে। ডক্টর ল্যাং সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ফ্রেণ্ডস, আমি আজ আপনাদের ছেড়ে বিদায় দিচ্ছি। বিদায় নিচ্ছি চিরকালের জন্যে। ফর এভার ফর এভার।'

সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'সে কি? সে কি?'

হ্যাঁ, আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। আপনারা আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন এতকাল। আমি কৃতজ্ঞ। এক সময়ে আমাকে সকলেই ভালবাসতেন। এখন কারুর কারুর মনে আমার সম্পর্কে ঘৃণা জন্মেছে, সন্দেহ জেগেছে আমার ক্ষমতা সম্পর্কে। আমার মনেও প্রশ্ন জেগেছে বিজ্ঞান বড়, না মানুষ বড়! প্রশ্ন জেগেছে সমস্যা আর তার সমাধান বড়, না ক্ষমতার লড়াই বড়। সাধনা বড়, না ব্যক্তিগত ক্ষমতা বড়। উত্তর আমি আজ পেয়েছি। মানুষের তৈরি প্রতিষ্ঠান কখনও নির্দোষ হতে পারে না, মানুষ কখনও ভগবান হতে পারবে না। একদিক শয়তান এসে মানুষকে স্বর্গোদ্যান থেকে তাড়িয়েছিল, ওইটাই মানুষের নিয়তি। ফেট। আমাকে শেষ মুহূর্তে ডক্টর বোস একসঙ্গে বহু প্রাণ বাঁচাবার কাজে সাহায্য করেছেন। অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে নয়। তাঁর সঙ্গে আমার চুক্তিই হয়েছিল বিনা রক্তপাতে এই গড়ে অঠা প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে এবং ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। ভদ্রলোকের চুক্তি। একটা কারণে আমি সুখী ডক্টর শিলারের কর্তৃত্বে আপনাদের থাকতে হচ্ছে না! তিনি মানসিক বিকলতায় ভুগছেন। কেন ভুগছেন তাও আমি জানি। বংশের ধারা। এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে কিছু বিকলতার ধারা এইভাবেই প্রবাহিত হয়। ডক্টর বোসের কাছে আমার শেষ অনুরোধ, কিছু শিক্ষিত, স্বেচ্ছাচারী লোক বিজ্ঞানের নামে জীবজগতের উপর ভীষণ অত্যাচার চালাবার ছাড়পত্র নিয়ে বসে আছেন, সেই অত্যাচারের কিছু নির্দোষ শিকার আমার অজান্তেই এখানে বন্দী হয়ে আছে। তাদের তিনি শুধু মুক্তিই দেবেন না, তাদের সুস্থতাও ফিরিয়ে দেবেন। আমি জানি মৃত্যু যত সহজে আনা যায়, জীবন তত সহজে আনা যায় না। সেই জীবনকে প্রয়োজন হলে জীবন দিয়েও বাঁচাতে হবে। আপনারা সুন্দরের সাধনা করুন। বিদায়।'

সামনে সহজ পথ

ডক্টর ল্যাং গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন। সামনে সোজা পথ চাঁদের আলোয় খুলছে, ক্রমশ খুলছে। সঙ্গে সেই বাক্স আর বেহালা। সামনে নবেন্দু, পেছনে আমি আর পরেশ। নবেন্দু হঠাৎ বললে, 'আপনি হেরে গেলেন আঙ্কল!'

'হেরে? কই না তো। আমাদেরই তো জিত হল।'

'আমারাই দায়ী।'

'কেন? হ্যাঁ দায়ী, তবে অন্যভাবে। আমাকে তোমরা বাঁচিয়েছ। তা না হলে ওরা ষড়যন্ত্র করে শ্যারনের মত আমাকেও একদিন

হত্যা করত।'

'হত্যা!'

'হ্যাঁ, হত্যা। ক্ষমতার লোভে, অর্থের লোভে সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন কত মানুষ জীবন দিচ্ছে জান কই?'

'আপনার গবেষণার কই হবে?'

'আমার রিসার্চ শেষ হয়ে গেছে নবেন্দু। আমি সত্যি আবিষ্কার করে ফেলেছি, মানুষ মানুষই থাকবে। পৃথিবী যেভাবে চলছে ঠিক সেইভাবেই চলবে। পরিপূর্ণ সুন্দর মানুষ আসবে, বিকৃত, বিকলাঙ্গ আসবেন, দেবতা আসবেন, শয়তানওআসবে। এ খেলা চলতেই থাকবে আবহমান কাল ধরে।'

'আঙ্কল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

'প্রথমে কলকাতায় তোমাদের নামিয়ে দোব। কোন একটা হোটেলের রাত কাটিয়ে প্লেন ধরে চলে যাব সিসিলি। সেখানে অনেক অনেকে দিন ধরে একজন মা তাঁর ছেলের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।'

গাড়ির গতি ক্রমশ বাড়ছে। পথ কখনও বেঁকেছে, কখনও সোজা। দু'পাশে বন। মাঝে মাঝে পাহাড়। মাঝে মাঝে গ্রাম।

আজও মনে পড়ে আমাদের সেই অভিযানের কথা। আজও চোখের সামনে ভাসছে, আঙ্কল ল্যাং, ডক্টর ল্যাঙের মুখ। সেই মুখ। সেই পাহাড়ী পথে, চাঁদের আলোছায়া আর তাঁর সেই শেষ কথাঃ

তোমরা হলে ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র। তাঁর মতই হওয়ার চেষ্টা কর। অনুশীলন ছাড়া কিছুই হয় না, হওয়ার নয়। প্রেম দিয়ে জীবনকে বাঁধবার চেষ্টা কর। যীশু আমাদের ভালবেসে জীবন দিয়েছিলেন। আমরা সবাই একদিন ঝরে যাব, তাহলে সুগন্ধী ফুলের মত পুজার অর্ঘ্য হয়েই ঈশ্বরের পদতলে ঝরে পড়ি না কেন!